

বাংলাপিডিএফ.নেট
মাসুদ রানা
নকল রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
SUVOM
দুই খণ্ড একত্রে
মাসুদ
শুভম

মাসুদ রানা

নকল রানা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

তেলমন্ত্রীদের বন্দী করেই
কোটি কোটি টাকার হীরে দাবি করে বসল
কবির চৌধুরী।
মেনিলথিনকে অনুসরণ করে
দুর্গটা আবিষ্কার করে ফেলল রানা।
এদিকে সোহানাও এসে গেছে।
বিপদের তোয়াক্কা না করে
ঝাঁপ দিল ওরা
আগুনের মুখে।
দু'দিক থেকে দু'জন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

নকল রানা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
শু ভ ম
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

তেতাল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-7119-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ. ২০০০

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
NAKAL RANA
Part I&II
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

Rana- 119,120

নকল রানা – ১,২

কাজী আনোয়ার হোসেন

নকল রানা-১ ৫-১০২

নকল রানা-২ ১০৩-২০৮

মাসুদ রানার ভলিউম

নকল রানা-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪

এক

নিরেট পাথরের দেয়াল। জানালা নেই। ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া একটাই দরজা। রোদ জোছনা বা তারার আলো এখানে ঢোকে না। ঢোকে না বাইরের দুনিয়ার কোন শব্দ। এর নাম সলিটারি কনফাইনমেন্ট, নির্জন কারাবাস। তাও আবার ক্যাটাগরি এ, এখানে শুধু ভয়ঙ্কর আর বিপজ্জনক কয়েদীকে রাখা হয়। ভুক্তভোগী মাত্রই জানে, জ্যান্ত কবর দেয়ার সাথে এর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সেলটা সরু, একটু লম্বাটে। দেয়াল আর দরজায় প্যাড লাগানো, শক্ত কিছুর সাথে মাথা ঠুকে কয়েদী যাতে আত্মহত্যা না করতে পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

ঘড়ি, কলম, বই, কাগজ, ধূমপানের সরঞ্জাম কিছুই দেয়া হয়নি বন্দীকে। এমন কি যে চশমা ছাড়া প্রায় কিছুই দেখতে পায় না সে, সেটাও তার কাছ থেকে নিয়ে জমা রাখা হয়েছে অফিসে। পরনে কয়েদীর পোশাক, সাদা কালো ডোরাকাটা নরম সুতী কাপড়। ফ্রান্সের আদালত বিশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে তাকে।

অভিযোগ ছিল দুটো, দুটোতেই গিল্টি বলে রায় দেয়া হয়। প্রথম অভিযোগ ছিল, কমান্ডো দল নিয়ে আইফেল টাওয়ার দখল করা। ত্রিশ মিলিয়ন ডলার না পেলে বিস্ফোরক দিয়ে টাওয়ার উড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়েছিল আসামী। এই অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় বিশ বছরের জেল দেয়া হয় তাকে। দ্বিতীয় অভিযোগে বলা হয়: সম্মানীয়া অতিথি মার্কিন প্রেসিডেন্টের মাকে আইফেল টাওয়ারে বন্দী করে জিম্মি রাখা হয়, এবং মুক্তিপণ আর আগের পাওনা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে দাবি করা হয় বিশ বিলিয়ন ডলার। জুরিরা সবাই একমত হয়ে এই কেসেও রায় দেন, বিশ বছরের কারাদণ্ড। দুটো দণ্ড একসাথে চলবে, কাজেই চল্লিশ বছর জেল খাটতে হবে না তাকে, বিশ বছর পরই খালাস পেয়ে যাবে। ভাল আচরণ দেখাতে পারলে কয়েক বছর রেয়াতও পাবে সে, তবে চোদ্দ বছরের আগে ছাড়া পাবার কোন আশা নেই।

বয়স বাড়ছে কবির চৌধুরীর। জুলফির বেশ কয়েকটা চুলে পাক ধরেছে। দুর্ঘটনায় চোখ দুটো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি আর ধ্যান-মগ্ন গভীরতা আগের মতই লক্ষ করা যায়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে, বাড়তে দেয়া মাথার চুল ঘাড় ঢাকা দিয়ে নেমে এসেছে কাঁধের উপর, ঠিক যেন সিংহের কেশর। চেহারায় আগের সেই প্রতিভার ছটা এখনও অম্লান, বরং আরও যেন একটু উজ্জ্বলতা পেয়েছে। মাথা উঁচু করে পায়চারি করছে সে। দৃঢ় পদক্ষেপ, কিন্তু শান্ত ভঙ্গি। ধারাল, ক্ষীণ একটু হাসি লেগে আছে ঠোঁটের

কোণে। একটা পা কাঠের, কিন্তু হাঁটার ধরনে ছন্দের কোন পতন নেই।

সারাক্ষণ জমাট নৈঃশব্দ্যের মধ্যে থাকতে থাকতে শ্রবণ শক্তি বহু গুণ বেড়ে গেছে তার। নিস্তব্ধতার মাঝখানে হঠাৎ পায়ের আওয়াজ যতই অস্পষ্ট হোক, ঠিক শুনতে পায় সে। বুঝতে পারে সেলের বাইরে প্যাসেজ ধরে সেন্ট্রি যাচ্ছে। হাঁটার ভঙ্গিতে ছন্দপতন ঘটলে সাথে সাথে তাও টের পায়। কারণটা আধ সেকেন্ড পরই জানা যায়, পাকা মেঝেতে পড়ে গেছে হাতের চাবি। ঝনাৎ শব্দটা থামতে না থামতে জানা যায় সেন্ট্রির বিরক্তিসূচক 'ধেত্তরি!' বা 'ধুস শালা!' কিংবা, হঠাৎ যদি পায়ের আওয়াজ থেমে যায়, বুঝতে পারে সিগারেট ধরাবার জন্যে থেমেছে সেন্ট্রি। একটু পরই দিয়াশলাই বা লাইটার জ্বালার আওয়াজ আসে। এসব ব্যাপারে তার অনুমান একবারও ভুল হয়নি।

ঘড়ি নেই, কিন্তু তাই বলে সময় সম্পর্কে অজ্ঞ নয় কবির চৌধুরী। আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে সকালে যখন তার ঘুম ভাঙে, ঘড়ি না দেখেই বলে দিতে পারে, ছ'টা বাজে। সারা শরীর যখন দরদর করে ঘামতে থাকে, হাঁপিয়ে ওঠে সে, তখন বুঝতে পারে এক ঘণ্টা ধরে ব্যায়াম করছে সে। সেলের ভেতরই পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে, গোসল করতে লাগে বিশ মিনিট। সাড়ে সাতটার সময় নাস্তা আসে। তারপর ব্রেনটাকে চালু রাখার জন্যে শুরু হয় বুদ্ধির চর্চা। বই নেই, কাগজ-কলম নেই তো কি হয়েছে, ওর স্মৃতিতে ধরা আছে দাবা আর ব্রিজের অনেক কঠিন কঠিন সমস্যা, মাথায় গিজগিজ করছে অগুনতি প্ল্যান, সেগুলো নিয়ে মেতে ওঠে সে। যখন মনে হয়, পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, নিজেকে ছুটি দেয়। এরপর আসে, ঠিক দেড়টার সময়, লাঞ্চ। দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত বিশ্রাম, তারপর আবার শুরু হয় মাথাটা ধারালো রাখার অনুশীলন। মাঝখানে একবার রাতের খাবার জন্যে আধ ঘণ্টা বিরতি, মাথাটাকে বিশ্রাম দেয় সেই রাত আটটার পর। বাকি দু'ঘণ্টা পায়চারি করে বেড়ায় সে। কিছু কিছু মাথার কাজ এই সময়ও সারতে হয় তাকে। এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার সময় হয়ে এসেছে, জানে সে। মন-প্রাণ ঢেলে আবার নামতে হবে বিজ্ঞানের সাধনায়। কিন্তু তার আগে অনেক, অ-নে-ক টাকা চাই তার। কিভাবে, কোত্থেকে আসবে সেই টাকা, তার একটা প্ল্যান মনে মনে ছকে রেখেছে সে। চমৎকার একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করবে সে।

নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একটা দিনও জেল খাটতে রাজি নয় কবির চৌধুরী।

চব্বিশ ঘণ্টায় দু'বার এই জেল থেকে ঘেরা উঠনে বের করা হয় তাকে। চারদিকে সেন্ট্রি থাকে, কিন্তু বাইরের দুনিয়ার সাথে খবর আদান প্রদানে কোন অসুবিধে হয় না তার। টাকা দিয়ে বাঘের চোখ পাওয়া যায়, আর এ তো সামান্য খবর! দুনিয়ার কোথায় কি ঘটছে, সব জানা আছে তার। কোন্ ঘটনার সাথে নিজেকে জড়াবে সে, তাও ঠিক করা হয়েছে। তার মনের ইচ্ছে কি, জানা হয়ে গেছে মেনিলথিনেরও।

মেনিলথিনের নামটা মনে আসতেই ঠোঁটের কোণ থেকে সারা মুখে

ছড়িয়ে পড়ল হাসিটা। পায়চারি থামিয়ে বিছানার ওপর বসল কবির চৌধুরী, তাকাল মাথার ওপর নগ্ন বাল্বটার দিকে। এর অত্যাচার গা সওয়া হয়ে গেছে তার। শত্রু নয়, এই নির্জন কারাবাসে একে বন্ধু মেনে নিয়েছে সে। তারপর চোখ নামিয়ে হাতের তালুর ওপর অন্যমনস্ক ভাবে একটা নকশা আঁকল। আঙুলের ডগা দিয়ে আঁকল, কাজেই কোন দাগ ফুটল না। দাগ ফুটলে একটা বিমানের আকৃতি পেত ওটা।

'মেনিলথিন, জানোই তো, ব্যর্থতা আমি ক্ষমা করি না,' বিড়বিড় করে বলল কবির চৌধুরী।

মেনিলথিন কবির চৌধুরীর নিজের হাতে গড়া মানুষ। জার্মানীর নোংরা বসতি থেকে তুলে নিয়ে এসে তাকে নতুন জীবন দান করেছে সে। আজ লোকটা বহু টাকার মালিক, ক্ষমতা আর প্রতাপের কোন অভাব নেই তার। এক কবির চৌধুরী ছাড়া এই লোক আর কাউকে ভয় করে না। বিজ্ঞান সাধক কবির চৌধুরী বিশ্বাস করে, তার মুক্তির জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সুচারুভাবে সমাধা করবে মেনিলথিন।

তারপর এক হাত দেখাবে কবির চৌধুরী। বিস্ময়ে, আতঙ্কে থ হয়ে যাবে দুনিয়া। আর…আর, মজাটা এবার টের পাবে সেই ছোকরা, মাসুদ রানা!

সুইস এয়ারের ডিসি নাইন থেকে জুরিখ এয়ারপোর্টে নামল সিগমন্ড মেনিলথিন। ছ'ফিট দু'ইঞ্চি লম্বা, চওড়া হাড়ের ওপর কোথাও একটু বাড়তি মেদ নেই। চৌকো, জার্মান চেহারা। চব্বিশ বছর বয়সেও তারুণ্যের প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর। মাথায় পরিপাটি ছাই রঙ চুল, একই রঙের ঘন ভুরু। পরনে মোহায়ের স্যুট।

আধ ঘণ্টা পর হাতে অ্যালিগেটরের চামড়া দিয়ে তৈরি একটা সুটকেস নিয়ে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল মেনিলথিন। পার্কিং এরিয়ায় দাঁড়িয়ে আছে চকচকে কালো একটা মার্সিডিজ, পাশে একজন শোফার–দস্তানা পরা হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। চেহারায় গাম্ভীর্য নিয়ে এগিয়ে এল মেনিলথিন। ইঙ্গিতে সামনের প্যাসেঞ্জার সীটটা দেখাল শোফার, কিন্তু কথা না বলে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকল মেনিলথিন। তাড়াহুড়ো করে পিছনের দরজা খুলে দিল শোফার। গাড়িতে উঠে একটা বোতাম টিপল মেনিলথিন, দুই সারি সীটের মাঝখানে একটা কাচের পর্দা উঠে গেল। খুচরো আলাপ পছন্দ করে না মেনিলথিন। তাছাড়া, কয়েকটা ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা দরকার আছে। মিস্টার চৌধুরীর কাজ নিয়ে জুরিখে এসেছে সে, কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি হওয়া চলবে না।

তিন মিনিট পর মেনিলথিনের চিন্তায় বাধা পড়ল। মাথার ওপর ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজ। জানালা দিয়ে মাথা বের করে ওপর দিকে তাকাল সে। একটা প্লেন। বোয়িং সাতশো সাত। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠল মেনিলথিনের।

মেইন রোড ছেড়ে কাঁকর ছড়ানো চওড়া একটা রাস্তায় ঢুকল মার্সিডিজ।

প্রায় মাইলখানেক এগোবার পর সামনে দেখা গেল একটা পাহাড়। পাহাড়ের একটা ভাঁজে স্যাতো ধাঁচের বিশাল কাঠামো, ওটাই 'কোচ ক্লিনিক'। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এল গাড়ি। ক্লিনিকের সামনে পাথর বসানো সমতল উঠন। সেটা পেরিয়ে গাড়ি-বারান্দায় থামল মার্সিডিজ। নিচে নেমে পিছনের দরজা খুলে দিল শোফার।

সুইংডোর ঠেলে বারান্দায় বেরিয়ে এল সাদা কোট পরা এক বৃদ্ধ। পঁয়ষট্টি-সত্তর বছর বয়স, চুল-দাড়ি সব পেকে গেছে, অথচ শরীরটা এখনও ঋজু, পাকানো রশির মত পেশী। ঠোঁট-টেপা মিটিমিটি হাসি লেগে আছে মুখে। বেশ দ্রুত আর সাবলীল ভঙ্গিতে সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে গাড়ি-বারান্দায় নেমে এল সে। কবির চৌধুরীর পাঠানো লোক মেনিলথিন, কাজেই তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে নিজেই বেরিয়ে এসেছে ডাক্তার ডিয়েটর কোচ। বাত রোগের চিকিৎসক হিসেবে এদেশে তার জুড়ি নেই, কিন্তু তারচেয়ে বেশি নাম করেছে সে প্লাস্টিক সার্জারীতে। সুইটজারল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত প্লাস্টিক সার্জেন সে, তার খ্যাতি আর নৈপুণ্যের কাহিনী বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

মার্সিডিজ থেকে নেমে ডাক্তার কোচের বাড়ানো হাতটা ধরল মেনিলথিন।

'মি. মেনিলথিন?' জার্মান ভাষায় জানতে চাইল ডাক্তার।

ধারালো, চৌকো দাঁতের ওপর জিভের ডগা বুলিয়ে নিয়ে মেনিলথিন বলল, 'হ্যাঁ। আপনি ডা. কোচ?'

মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার। এই সময় তার হাতে জোরে চাপ দিল মেনিলথিন, ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠল ডাক্তার।

'দুঃখিত,' বলল মেনিলথিন। দুঃখ নয়, সকৌতুক হাসি ফুটে উঠল চেহারায়। 'আমি কি বোকা দেখুন দেখি! আপনার এই হাত, এই হাত, এ তো এক বস্তা হীরের চেয়েও দামী—আর সেই হাতে আমি কিনা চোট দিলাম!'

হাত ডলতে ডলতে ডাক্তার কোচ জানতে চাইল, 'চৌধুরী কেমন আছেন?'

এক নিমেষে বদলে গেল মেনিলথিনের চেহারা। দৃষ্টিতে ফুটে উঠল নিষ্ঠুরতা। কর্কশ সুরে বলল সে, 'মিস্টার চৌধুরী!'

তাড়াতাড়ি একটা ঢোক গিলল ডাক্তার কোচ। ভুলটা শুধরে নেবার জন্যে বলল, 'দুঃখিত। হ্যাঁ, মিস্টার চৌধুরী—কেমন আছেন তিনি?'

'ভাল,' সংক্ষেপে জবাব দিল মেনিলথিন। 'চলুন, ভেতরে চলুন।'

মার্সিডিজ নিয়ে চলে গেল শোফার। মেনিলথিনকে নিয়ে ক্লিনিকের ভেতরে ঢুকল ডাক্তার কোচ। হলঘর হয়ে একটা করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। দু'পাশে সারি সারি দরজা দেখে প্রশ্ন করল মেনিলথিন। ডাক্তার বলল, এসব কামরায় থাকে বাতের রোগীরা। কয়েকজন ব্যস্ত ডাক্তার পাশ কাটাল ওদেরকে, ড. কোচকে দেখে শ্রদ্ধা আর সমীহের ভাব করল তারা। ঠোঁট-বাঁকা হাসি ফুটল মেনিলথিনের মুখে, নিচু গলায় বলল, 'সাম্রাজ্যটা বেশ ভালই গুছিয়ে নিয়েছেন দেখছি!'

মিটিমিটি হাসিটা এতক্ষণে ডাক্তার কোচের ঠোঁটে ফিরে এল।

'আপনাদের আশীর্বাদে বেঁচে আছি, এই আর কি।'

লম্বা আরেকটা করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। শেষ মাথায় ডিরেক্টর লেখা একটা দরজা দেখা গেল। উর্দি পরা একজন পিয়ন মাথা নিচু করে বাউ করল ডাক্তারকে। দরজা খুলে দিল সে। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল ডাক্তার, পিছনে মেনিলথিন।

হালকা ফার্নিচার দিয়ে ছিমছামভাবে সাজানো চেম্বার। একধারে মস্ত একটা জানালা, সামনে দাঁড়ালে কয়েকশো ফিট নিচে উপত্যকা দেখা যায়। তারপর আবার শুরু হয়েছে পাহাড়-সারি। দৃশ্যটা ছবির মত সুন্দর। ডেস্কের ওধারে গিয়ে রিভলভিং চেয়ারে বসল ডাক্তার। ইঙ্গিতে সামনের একটা চেয়ার দেখাল সে মেনিলথিনকে। 'বসুন।'

জানালার আরও সামনে গিয়ে দাঁড়াল মেনিলথিন। ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা। এইভাবে দু'মিনিট কেটে যাবার পর ধৈর্য হারিয়ে জানতে চাইল ডাক্তার, 'ফটো জোগাড় হয়েছে? শরীরের খুঁটিনাটি বর্ণনা সব জেনেছেন?' সরাসরি কাজের কথা পাড়ল সে।

অলস ভঙ্গিতে ওপর-নিচে মাথা দোলাল মেনিলথিন। 'প্রার্থী জোগাড় হয়েছে?'

'হয়েছে,' বলল ডাক্তার।

ডাক্তার আরও কিছু বলবে ভেবে অপেক্ষা করতে লাগল মেনিলথিন, কিন্তু নিস্তব্ধতা আবার জমাট বাঁধতে থাকল ঘরের ভেতর। জানালার দিকে পিছন ফিরে এবার সেই নিস্তব্ধতা ভাঙল সে, 'নাম?'

ডেস্কের ওপর দুই হাতের কনুই রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ডাক্তার কোচ, একটা চোখ টিপে মেনিলথিনকে কাছে সরে আসার ইঙ্গিত দিল। এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসল মেনিলথিন। 'পারকিন,' ফিসফিস করে বলল ডাক্তার। 'কোডি পারকিন।'

'ব্রিটিশ?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল মেনিলথিন।

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'মার্কিনী।'

'ছদ্মনাম?'

'না!' তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গিতে, কিন্তু গলা একেবারে খাদে নামিয়ে দ্রুত বলল ডাক্তার কোচ। 'আসল।'

চেয়ারে সিধে হয়ে গেল মেনিলথিনের শিরদাঁড়া। 'কোথায় সে? এখানে?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে পাল্টা প্রশ্ন করল ডাক্তার, 'আপনি তার ফটো দেখতে চান?'

'অবশ্যই।'

মেহগনি ডেস্কের দেরাজ খুলে একটা ম্যানিলা এনভেলাপ বের করল ডাক্তার। এনভেলাপ খুলে একটা ফটো বের করল সে, নিজে একবার দেখল, তারপর বাড়িয়ে দিল মেনিলথিনের দিকে।

প্রথমবার চোখ বুলিয়েই খুশি হলো মেনিলথিন। সাধারণ চেহারা। নাক-নকশায় চোখে পড়ার মত কোন রকম অস্বাভাবিকতা নেই। এই রকম

চেহারাকে আরেক চেহারায় রূপান্তর করা তুলনামূলকভাবে সহজ। কাজেই, এটা একটা উপরি পাওনা, বোনাস। এই লোকের চেহারায় কোমল, নরম একটা ভাব আছে, মুখের কোথাও বেঢপ ভাবে ফুলে নেই মাংস। গায়ের রঙটাও হলুদাভ বা ফ্যাকাসে সাদা নয়। চামড়ায় কোন রকম দাগও নেই। এসবই এক একটা বোনাস। তবে অসুবিধে হবে চোখ দুটো নিয়ে। এই লোকের চোখে কোনরকম মায়া নেই, দৃষ্টিতে নেই স্বপ্নাচ্ছন্ন গভীরতা।

চোখ বুজে আরেকটা চেহারা কল্পনা করল মেনিলথিন। ফটোর চেহারার সাথে সেটাকে মিলাবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু দুটো চেহারা কোনভাবেই মেলাতে পারল না সে। চোখ মেলে ডাক্তারের দিকে তাকাল। একটু অসহায় দেখাল তাকে।

সম্ভবত তার মনের ভাব বুঝতে পেরেই মুচকি একটু হাসল ডাক্তার কোচ। বলল, 'কোন চিন্তা করবেন না। মেলাবার দায়িত্ব আমার।' ইঙ্গিতে ফটোটা দেখাল সে। 'পারকিনের সাথে অনেক মিল আছে সাবজেক্টের। গায়ের রঙের কথাই ধরুন, নিজেই রোগে পুড়িয়ে সাবজেক্টের গায়ের রঙের সাথে একেবারে মিলিয়ে রেখেছে। দু'জনের হাইট আর ওয়েটও প্রায় সমান।'

'প্রায়?'

'হাইট দু'জনেরই এক, পাঁচ ফুট এগারো; কিন্তু পারকিন ওজনে সাত পাউন্ড বেশি,' বলল ডাক্তার। 'তবে, আমার জন্যে এটা কোন সমস্যাই নয়।'

'ফাইলটা দেখি।'

আবার দেরাজ খুলল ডাক্তার। একটা ফোল্ডার বের করে বাড়িয়ে দিল মেনিলথিনের দিকে। পাতা উল্টে তাতে মন দিল মেনিলথিন। দশ মিনিট পর মুখ তুলে তাকাল সে। গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনার এই পারকিনকে মোটেই গোবেচারা বলা যায় না!'

হেসে ফেলল ডাক্তার। 'হ্যাঁ, একটু ডানপিটে। আইনের সাথে তেমন বনিবনা নেই। কিন্তু অর্ডার দেবার সময় আপনি যদি বলতেন পাদ্রী বা সাধু টাইপের লোক দরকার...'

'সাধু হোক আর শয়তান, তাতে কিছু এসে যায় না,' তাড়াতাড়ি বলল মেনিলথিন। 'যোগ্যতা আর সাহস থাকলেই হলো।'

চোখ দুটো আধবোজা হয়ে এল ডাক্তারের, বলল, 'তা আছে।'

'এখন তাহলে দেখতে হয়, লোকটা নিজের পরিচয় সম্পর্কে সত্যি কথা বলছে কিনা,' বলল মেনিলথিন। সোনালি সিগারেট কেস বের করে ফিলটার লাগানো সিগারেট বের করে ধরাল সে। 'আমরা চেক করব। যদি টিকে যায় একেই নেব আমরা।'

'টিকবে,' আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল ডাক্তার।

'টিকলেই ভাল,' ঠাণ্ডা সুরে বলল মেনিলথিন। না টিকলে পরিণতি কি হবে সেটা আর উচ্চারণ করার দরকার মনে করল না সে।

'মি. চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, আমার কাজে তিনি কখনও খুঁত পাননি।' হে হে করে একটু হাসল ডাক্তার। 'এই আমিই তো মি. চৌধুরীর

চেহারা বদলেছি–কয়েকবার। কোন অভিযোগ করার সুযোগই পাননি। তাঁর এখনকার চেহারার কথাই ধরুন না, এটাও তো আমারই দেয়া। সবাইকে একবাক্যে স্বীকার করতে হবে, উনি বাকিংহাম প্রাসাদের একজন ডিউক।'

'তা বটে,' গম্ভীর সুরে স্বীকার করল মেনিলথিন।

কি একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হেসে উঠল ডাক্তার কোচ। বলল, 'মি. চৌধুরী কি বলেন, জানেন? বলেন, এতবার বদল করা হয়েছে যে আসল চেহারা দেখতে কেমন ছিল তা তাঁর নাকি আজ আর মনেই পড়ে না!'

মেনিলথিন হাসল না। বলল, 'পারকিনের সমস্ত তথ্য আমি মিনসারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মিনসার ও-কে করলে আর কোন বাধা থাকছে না।'

'ধন্যবাদ।'

টপফ্লোরে ডাক্তার কোচের সেন্টহাউজ। সেখানে রাজকীয় লাঞ্চ সারল ওরা। মেনিলথিনের খোশ মেজাজ লক্ষ করে ডাক্তার মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই চেহারা নকল করা, সেটা সফল হবার সম্ভাবনা কতটুকু।

'আপনার কি ধারণা?' পাল্টা প্রশ্ন করল মেনিলথিন। 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা তো আপনিই সারছেন।'

নিজের মতামত ব্যাখ্যা করতে শুরু করল ডাক্তার। জানাল, পারকিনকে সাবজেক্টের চেহারা পাইয়ে দেয়া কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু সাবজেক্টের আচরণ পারকিন হুবহু অনুকরণ করতে পারবে কিনা, সেটা নির্ভর করে পারকিনকে কিরকম ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে তার ওপর। তাছাড়া, সাবজেক্ট সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা নেই তার। তাকে শুধু সাবজেক্টের কয়েকটা ফটো দেয়া হয়েছে। সাবজেক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানা থাকলে হয়তো কিছু সাজেশন দিতে পারত সে।

পটপট শব্দ করে আঙুল মটকাল মেনিলথিন। ধীরে ধীরে বলল, 'সাবজেক্টের নাম মাসুদ রানা।' বলে কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিল সে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল ডাক্তারের দিকে, যেন বুঝতে চাইছে নামটা আগেই কোথাও শুনেছে কিনা। 'কিছু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের একান্ত ব্যক্তিগত অনুরোধে এয়ারফোর্স ওয়ানের সিকিউরিটি চীফের দায়িত্ব নিয়েছে। এয়ারফোর্স ওয়ান আসলে...'

'আমি জানি,' বলল ডাক্তার কোচ। 'ওটা একটা বোয়িং সাতশো সাত, তাই না? মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্লেন।' সিলিঙের দিকে তাকাল কোচ। সবজান্তার মত মাথা নাড়ল। বলল, 'তারমানে, মাসুদ রানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্র। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওই প্লেনটাকে উড়ন্ত হোয়াইট হাউজ বলা হয়। তার সিকিউরিটি চীফ একজন বিদেশী? নামটা শুনে তো মনে হচ্ছে মুসলিম...?'

'হ্যাঁ। বাংলাদেশী।'

'সাংঘাতিক টাফ, এই মাসুদ রানা?'

'সাংঘাতিক।'

গম্ভীর দেখাল ডাক্তারকে। 'তাহলে বরং পারকিনকে নিজের চোখে

একবার দেখুন আপনি।'

'মাসুদ রানার ভূমিকায় সে উতরে যাবে, নাকি আপনার সন্দেহ আছে?'

'সন্দেহ থাকলে তাকে দেখার প্রস্তাব দিতাম না,' বলে চেয়ার ছাড়ল কোচ। 'আমি ভাবছি মাসুদ রানার কথা। হঠাৎ করে টের পাবে, সে আসলে দু'জন লোক। তখন কেমন হবে তার মনের অবস্থা?'

পারকিনকে দেখার আগে তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইল মেনিলথিন। ব্রাজিলের সাও পাওলো শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে রয়েছে কবির চৌধুরীর কমপিউটর মিনসার। কোডি পারকিনের সমস্ত তথ্য টেলেক্স করে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মেনিলথিন, হাতে কফির কাপ। খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্ট করল মিনসার। দ্বিতীয় কাপ কপি শেষ করেছে মেনিলথিন, একজন ওয়েটার এসে টেলেক্স মেসেজটা দিয়ে গেল তাকে। সুসংবাদ নিয়ে পারকিনের কাছে নিজেই হাজির হলো মেনিলথিন।

ক্লিনিকের প্রাইভেট হিসেবে চিহ্নিত একটা অংশে একা পেশেন্স খেলছিল পারকিন। নিজের পরিচয় দিয়ে মেনিলথিন বলল, 'এখন থেকে তুমি আমাকে ঘন ঘন দেখবে।'

চেয়ার ছেড়ে মেনিলথিনের হাতটা ধরল পারকিন। তীব্র একটা ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'কোডি পারকিন···আমার এ চেহারা আপনি সম্ভবত এই শেষবারের মত দেখছেন, মি. মেনিলথিন।'

চার ঘণ্টা পর সেই একই মার্সিডিজে চড়ে কোচ ক্লিনিক থেকে বিদায় নিল মেনিলথিন। পারকিনের সাথে দীর্ঘ আলাপ করে কমপিউটর রিপোর্টের সাথে একমত হয়েছে সে–কোডি পারকিন আসলে কোডি পারকিনই। নিজের এবং কবির চৌধুরীর স্ট্যান্ডার্ড মনে রেখে আরও একটা ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছে সে–মাসুদ রানার চেহারা নিয়ে তার আচরণ অনুকরণ করার কাজে শারীরিক এবং মানসিক, দু'দিক থেকেই পারকিন সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

মেনিলথিন চলে যাবার পাঁচ মিনিট পর দরজায় নক না করেই পারকিনের কামরায় ঢুকল ড. কোচ। একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখছিল পারকিন। বোঝাই যায়, চেহারার কাছ থেকে চিরবিদায় নিচ্ছিল সে। ডাক্তারকে ঢুকতে দেখে কর্কশ সুরে বলল, 'টোপ গিলেছে!'

'চমৎকার!' উৎফুল্ল দেখাল ডাক্তারকে। 'তার মানে কবির চৌধুরীও গিলবে। মস্কো যা খুশি হবে না!'

'তা তো হবেই,' বলল পারকিন। 'আমরা যা ভেবেছি, এই ব্যাপারটা তার চেয়েও বড় হতে পারে।' একমুহূর্ত চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল, 'আপনি মনে করেন, চৌধুরী টোপ গিলবে?'

'গিলবে না মানে?' তারপরই কৃত্রিম গাম্ভীর্যে চেহারা থমথমে করে তুলল ডাক্তার। 'এই ধরনের ভুল করলে তোমাকে পস্তাতে হবে, পারকিন।'

'ভুল? আমি আবার কি ভুল করলাম?'

'চৌধুরী নয়, মিস্টার কবির চৌধুরী,' বলল ডাক্তার। 'এটাই তোমার প্রথম সবক।'

*

নির্জন কারাবাসে দিনগুলো ভালই কাটছে কবির চৌধুরীর। শেষ মেসেজে মেনিলথিন জানিয়েছে, রানাকে নকল করার জন্যে লোক পাওয়া গেছে। নকল করার কাজও শুরু করে দিয়েছে ড. কোচ। আর মাত্র এক হপ্তার ব্যাপার, তারপরই মুক্ত দুনিয়ার বাতাস পাবে সে। চোখে চশমা এঁটে আবার সব দেখতে পাবে-সাধারণ লোকের চেয়ে দশ গুণ বেশি হবে তার দৃষ্টিশক্তি। কানে নিতে পারবে দুনিয়ার যত মধুর শব্দ। কিন্তু এসবের জন্যে খুব একটা লালায়িত নয় কবির চৌধুরী। স্বাধীন দুনিয়ায় ফিরে যাওয়া উপলক্ষ্যে একটা ক্রাইম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে সে, এটা সফল হলে বিজ্ঞান সাধনার জন্যে অনেকদিন তার আর কোন টাকার অভাব থাকবে না। সেই সাথে শায়েস্তা করা হবে মাসুদ রানাকে। একহাত দেখানো হবে ইউনাইটেড নেশনস অ্যান্টি ক্রাইম অর্গানাইজেশনকেও।

মেনিলথিন, পারকিন, ড. কোচ-কবির চৌধুরী জানে, এরা কেউ তাকে নিরাশ করবে না। তার কাজে ভুলের কোন ক্ষমা নেই, কথাটা জানে ওরা সবাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটা এখনও দাউ দাউ জ্বলছে তার মনে। তাকে চিট করার পরিণতি কি হতে পারে, এর আগে সামান্য একটু টের পেয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শুধু রানার জন্যে প্রেসিডেন্টের মা বেঁচে গেছে সেবার। কিন্তু এবার কবির চৌধুরী আটঘাট বেঁধে, সবদিক বিবেচনার মধ্যে রেখে কাজে নামছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এবার নাকানিচোবানি খাইয়ে তবে ছাড়বে সে। দুনিয়ার সামনে তাকে নত না করতে পারলে শান্তি নেই তার।

এয়ারফোর্স ওয়ানকে কি যেন বলা হয়? খানিক চেষ্টা করার পর মনে পড়ল কবির চৌধুরীর। আসমানী দুর্গ! ভাষা, প্রেসিডেন্ট, তোমার ওই আসমানী দুর্গ হাইজ্যাক করব আমি। খবরটা শুনেই আবার মূর্ছা যেয়ো না। কারণ, আসল মজা শুরু হবে ঠিক তার পরেই!

দুই

পরবর্তী চারদিন কোডি পারকিনের ওপর দিয়ে যে-ঝড় বয়ে গেল, জ্ঞান থাকলে প্রথম দিনই হার্টফেল করে মারা যেত সে। তবে তার সৌভাগ্যই বলতে হবে, ডাক্তার কোচের মত নিপুণ আর ধৈর্যশীল লোকের হাতে পড়েছে সে।

অপারেটিং থিয়েটারে মাত্র দু'জন স্টাফ সাহায্য করল ডাক্তার কোচকে। টাকা আর ড্রাগ দিয়ে এদেরকে অনেক বছর ধরেই কেনা গোলাম বানিয়ে রেখেছে ডাক্তার। এই গোপন অপারেশনের কথা এদের মুখ থেকে ফাঁস হবার কোন ভয় নেই।

অপারেটিং থিয়েটার সাজানো হয়েছে একজন সোসাইটি ফটোগ্রাফারের সেলুনের মত করে। ছ'টা বিভিন্ন কোণ থেকে তোলা মাসুদ রানার বিশাল ব্লো-আপ ফটোগ্রাফ দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি। একটা ফটোতে রানার ঘাড় ও পিছনটা দেখা যাচ্ছে–চ্যাপ্টা, সুগঠিত কান সহ।

অপারেটিং টেবিলকে ঘিরে আছে বেশ কয়েকটা তে-পায়া টুল আর টেবিল, সেগুলোয় ফিট করা হয়েছে নানান সাইজের ফ্লাড লাইট, প্রতিটি লাইট ওপর-নিচে বা এপাশ-ওপাশ যেদিকে যখন খুশি ঘোরানো বা সরানো যায়। অপারেটিং টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছে ডাক্তার কোচ, এই টেবিলের ওপরও ঝুলে রয়েছে এক ঝাঁক আর্ক-ল্যাম্প। প্রতি মুহূর্তে ঘেউ ঘেউ করে শিষ্যদের নির্দেশ দিচ্ছে ডাক্তার কোচ–হয় সাবজেক্টের বিশেষ একটা অংশকে আলোকিত করতে বলছে, নয়তো বিশেষ কোন ইন্সট্রুমেন্ট চাইছে।

সম্পূর্ণ নতুন একটা মানুষে পরিণত হয়েছে ডাক্তার। উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদের মত দেখাচ্ছে তাকে। ঘনঘন মুখ তুলে রানার ছবির দিকে তাকাচ্ছে সে, কখনও কখনও দশ সেকেন্ডে দশবার। কিন্তু চেহারা যাই হোক, অত্যন্ত ধৈর্য আর নৈপুণ্যের সাথে হাত চলছে তার, আসল কাজে কোনরকম ব্যস্ততার লক্ষণ নেই। রানার চেহারার প্রতিটি অণু পরমাণু চোখ দিয়ে মগজে গেঁথে নিয়ে তারপর পারকিনকে অজ্ঞান করেছে সে, তারপরও ইন্সট্রুমেন্ট চালিয়ে মাংস চেঁছে তোলা বা যোগ করার আগে বারবার নিঃসন্দেহ হয়ে নিচ্ছে। অমানুষিক পরিশ্রম আর ধৈর্যের কাজ। কেটে-ছেঁটে, যোগ করে পারকিনের চোয়াল, গাল আর নাকের জায়গায় তৈরি করা হলো রানার চোয়াল, গাল আর নাক।

ডাক্তারের চেহারায় উগ্র বদমেজাজের প্রকাশ থাকলেও, হাতের কাজের প্রতি রয়েছে গভীর মমত্ববোধ আর মনোনিবেশ। কাজটা কাদা দিয়ে মূর্তি বানানো নয়। পারকিনকে চিরে, ফেড়ে, কেটে, ছিঁড়ে একাকার করছে ডাক্তার–প্রতিবার হয়তো এক বর্গ সেন্টিমিটার বা তারও কম অংশে কাজ করছে। তারপর সেই সব জায়গায় যোগ হচ্ছে মাসুদ রানার আকৃতি–এখানে একবিন্দু সেখানে একবিন্দু, এইভাবে। লেগো সাজাবার মত অতি ক্ষুদ্র মাংসের ইঁট এক এক করে সাজিয়ে পারকিনকে মাসুদ রানায় রূপান্তর করছে যেন সে।

তারপর এক সময় শেষ হলো কাজ। সেলাই কেটে দেয়া হলো। ক্ষতগুলো তাজা আর লালচে। পাঁচ দিনের দিন সকালে, মেঝের ওপর পা লম্বা করে বসে হাতের কাজটা কি রকম হলো দেখছে ডাক্তার। সিলিঙের সাথে ফিট করা হয়েছে একটা এনলার্জিং মিরর, সেটার দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে সে। এই ক'দিনে তার বয়স যেন আরও দশ বছর বেড়ে গেছে। এর আগে কোন কাজে এতটা ক্লান্তি বোধ করেনি সে। টেপ লাগানো আর ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবল; টিস্যু ইনফেকশন না হলে, আসল ধকলটা কাটিয়ে ওঠা গেছে। তারপরই মেনিলথিনের টেলিফোনের কথা মনে পড়ল তার। জার্মান লোকটার ব্যস্ত তাগাদা থেকে বোঝা যাচ্ছে, কবির চৌধুরী আর দেরি করতে পারছে না, এখুনি কাজে হাত দিতে চায় সে।

তার মানে, আমিও আর দেরি করতে পারি না, ভাবল ডাক্তার কোচ।

রাসকিনকে এবার খবর দিতে হয়।

সেদিন সন্ধের একটু আগে আরেকজন অতিথিকে বয়ে নিয়ে এল কালো মার্সিডিজ। খানিক আগে ঘুম থেকে উঠেছে ডাক্তার, রাসকিনকে নিয়ে গাড়ি এসেছে শুনে ক্লিনিকের বাইরে বেরিয়ে এল সে।

কনুইয়ের ধাক্কায় শোফারকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে তার দিকে এগিয়ে এল বিশালদেহী রাসকিন। একটা হাত বাড়িয়ে দিল ডাক্তার। কিন্তু হাতের তালু নয়, লোকটা ডাক্তারের কনুই ধরে একটু ঠেলা দিল, সাথে সাথে ঘুরে গেল ডাক্তার। তাকে নিয়ে সিঁড়ির ধাপ ক'টার দিকে এগোল সুইটজারল্যান্ডের কে.জি.বি. কন্ট্রোলার আলেক্স রাসকিন। আদেশের সুরে বলল, 'কোথায় সে—তার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে।'

পুরানো কয়েদীরা বিশ্বস্ত হয়ে উঠলে তাদেরকে দিয়ে কর্তৃপক্ষ জেলখানার অনেক কাজ করিয়ে নেয়, জেলখানার ভেতর অবাধ স্বাধীনতা থাকে তাদের। এই রকম একজন কয়েদীকে ঘুষ দিয়ে দলে টানা হয়েছে, কবির চৌধুরীকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবার জন্যে সে-ই জ্বালবে আগুন।

মেইন্টেন্যান্স ব্লকের করিডরে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন ওয়াল ক্লকের দিকে তাকাচ্ছে লোকটা। পকেটে রয়েছে একটা ডিটোনেটর ডিভাইস, মুঠোর ভেতর শক্ত করে ধরে আছে সেটা। ভোর ঠিক চারটে বাজতেই ডিটোনেটরের বোতামে চাপ দিল সে।

করিডরের শেষ মাথায়, নির্জন এক কোণে, দেয়ালের গায়ে ঝুলছে একটা জাঙ্কশন বক্স। সেটা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল নীলচে একটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ। একটু ওপর থেকে শুরু হয়েছে কালো পাউডারের একটা রেখা, স্ফুলিঙ্গটা সেই রেখার গা ছুঁলো। সে রেখার প্রান্তটা সাথে সাথে হয়ে উঠল আগুনের শিখা।

এই ঘটনার ঠিক এগারো সেকেন্ড পর আরেক করিডরের শেষ মাথায়, একটা বেডিং স্টোরের ভেতর বিস্ফোরিত হলো এক টিন গ্যাসোলিন। এই করিডরেরই একটা সেলে রয়েছে কবির চৌধুরী। দেখতে না দেখতে বেডিং স্টোর আর আশপাশের কয়েকটা ঘরে আগুন ধরে গেল। হুলস্থুল পড়ে গেল জেলখানার ভেতর। কর্মীরা যে যেখানে ছিল, ছুটে এল সবাই। ঠিক এই সময় কবির চৌধুরীর সেলে জ্বলে উঠল নিঃসঙ্গ নগ্ন বালবটা।

জেলখানার ভেতর অটোমেটিক অ্যালার্ম সিস্টেম আছে, হঠাৎ যদি আগুন লাগে, স্থানীয় ফায়ার স্টেশন সাথে সাথে সেটা জানতে পারবে। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। কিন্তু তবু, ফোন কলের জন্যে অপেক্ষা করে থাকল ফায়ার অফিসাররা। ফোন আসতেই ছ'টা দানবাকৃতি গাড়ি ছুটল জেলখানার দিকে। একজোড়া টার্নটেবল ল্যাডার ওয়াগন, একটা কন্ট্রোল ভেহিকেল আর তিনটে ওয়াটার/ফোম-টেন্ডার।

দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল আগুন। প্রিজন গভর্নরের অফিসে অফিসাররা জড়ো হয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে বসল। সংশ্লিষ্ট এলাকা খালি করা হবে কি হবে না, তাই নিয়ে চলল জোর বিতর্ক। ডেপুটি গভর্নর আরও কিছুক্ষণ দেখতে চায়।

চীফ ওয়ার্ডার বলল, ওখানে ওরা যারা আছে সবাই বিপজ্জনক কয়েদী, হুট করে বের করে আনা উচিত হবে না। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে ফেলল গভর্নর, কারও কথা কানে না তুলে অর্ডার দিল সেল খালি করো।

অস্ত্রাগার থেকে রাইফেল আর রায়ট গান বের করে ছুটল সেন্ট্রিরা। নার্ভাস এক পুলিস কমিশনার ডেকে পাঠাল রায়ট পুলিসের একটা ডিটাচমেন্টকে।

গোটা জেলখানা চোখ ধাঁধানো আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। আর্ক ল্যাম্প আর সার্চ লাইট সবগুলো জ্বেলে দেয়া হয়েছে। জেলখানার ভেতর কোথাও এক বিন্দু অন্ধকার নেই।

বিছানার ওপর বসে, দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে কবির চৌধুরী। চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব। দড়াম করে খুলে গেল সেলের দরজা।

'বেরোও!' হুঙ্কার ছাড়ল সশস্ত্র সেন্ট্রি। 'আগুন লেগেছে! সবাইকে সরিয়ে নিচ্ছি আমরা। বেরোও! জলদি!'

চেহারায় হঠাৎ আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে জানতে চাইল কবির চৌধুরী, 'কোথায়?'

'বড় উঠনে! লাইনে দাঁড়াও! কুইক!'

বিছানা থেকে তাড়াহুড়ো করে নামল কবির চৌধুরী। দরজা দিয়ে বেরোবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে সেলের ভেতর তাকাল একবার। অনেকগুলো দিন কেটেছে এখানে, ছেড়ে যেতে একটু তো মায়া লাগবেই। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে। আর কোনদিন এখানে ফেরার ইচ্ছে নেই তার।

৭

নির্জন রাস্তা ধরে ছুটে আসছে ফায়ার ইঞ্জিন কনভয়। সাইরেন আর ঘণ্টার ঢং ঢং আওয়াজে ভোর রাতের জমাট নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। একটা চৌমাথায় থামল কনভয়, পুলিস বাহিনীর কিছু লোককে তুলে নেয়া হলো গাড়িতে। এখানে পুলিসের কয়েকটা গাড়ি যোগ হওয়ায় কনভয়ের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ফ্রেসনেস জেলখানা এখান থেকে আরও তিন মাইল দূরে। আবার ছুটল কনভয়।

ওদিকে জেলখানার ভেতর ধোঁয়া, আগুন, শোরগোল, ছুটোছুটি, সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ--সব মিলিয়ে নরক গুলজার হয়ে উঠেছে। আলাদা আলাদা পাঁচটা দিক থেকে গরু-ছাগলের মত খেদিয়ে মাঝখানে বড় উঠনে কয়েদীদের নিয়ে আসছে সেন্ট্রিরা। আরেক দল সেন্ট্রি উঠনে জড়ো হওয়া কয়েদীদের লাঠি আর কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে আগুনের দিকে। কয়েদীরা পানি আর বালি ভর্তি বালতি নিয়ে ছুটছে সেদিকে। এর একটু পরই পুলিসের প্রথম দলটা এসে পৌঁছুল। দমকল বাহিনীর লোকজন আসার আগে পর্যন্ত, ছুটোছুটি করে নিজেদের সাথে ধাক্কা খাওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারল না এরা।

ইতোমধ্যে উঁচু সীমানা-প্রাচীরের লাগোয়া ভবনগুলোর কয়েকটাকে ছুঁয়ে ফেলেছে আগুন। দেয়ালের কাছে এসে থামল দুটো প্রকাণ্ড আকারের টার্নটেবল

অ্যাপ্লায়্যান্স, যান্ত্রিক মইগুলো উঠে গেল প্রাচীরের মাথা ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে। সেখান থেকে দমকল কর্মীরা হোস পাইপের সাহায্যে পানি ছুঁড়ছে আগুনের ওপর।

যে-যার কাজে ব্যস্ত, কাজেই তিন নম্বর টার্নটেবল অ্যাপ্লায়্যান্সটা দমকল বাহিনীর কারও চোখে পড়ল না। কিন্তু পুলিস কোন কাজের কাজ করছে না, তারা সেটাকে ঠিকই দেখতে পেল। তবে বাধা না দিয়ে, বা কোত্থেকে এল জানতে না চেয়ে, পথ দেখিয়ে লম্বা সীমানা-প্রাচীরের দিকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করল তারা সেটাকে। জেলখানার দু'নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে, উঠনের আরেক মাথা থেকে এগিয়ে এল সেটা। তড়িঘড়ি যান্ত্রিক মইটাকে উঁচু করে পাঁচিলের মাথার ওপর তুলে দেয়া হলো। সেই মই বেয়ে তরতর করে ডগায় উঠে গেল সিগমন্ড মেনিলথিন। হাতে একটা হোস পাইপ।

কন্ট্রোল ভেহিকেলে বসে গোটা অপারেশনটা পরিচালনা করছে চীফ ফায়ার অফিসার। আগুনের গতিবিধি সুবিধের নয় বুঝতে পেরে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে তার। নতুন টার্নটেবল অ্যাপ্লায়্যান্সটাকে প্রথমে লক্ষই করল না সে। তারপর যখন লক্ষ করল, এটাকে নতুন বলে চিনতে পারল না। দেখল, মইয়ের মাথায় হোস পাইপ নিয়ে যে লোকটা রয়েছে তার কাজ সুবিধের হচ্ছে না। আনাড়ির মত আগুনের চারপাশে পানি ছুঁড়ছে। চিৎকার করে ক্রুদের নির্দেশ দিল সে।

মইয়ের মাথায় সিগমন্ড মেনিলথিনের কাছে পৌঁছে দেয়া হলো নির্দেশ। নির্দেশ পেয়েছে, এটা বোঝাবার জন্যে হাত নাড়ল সে। একমুহূর্ত পর, হোস পাইপটা দুই উরুর মাঝখানে চেপে ধরে আবার হাত নাড়ল, এবার দুটো হাত একসাথে। এতক্ষণে আকৃষ্ট হলো কবির চৌধুরীর দৃষ্টি।

উঠনে কয়েদীদের মধ্যে শৃংখলা খানিকটা ফিরিয়ে আনা গেছে বটে, কিন্তু ধোঁয়া আর পুলিসদের ছুটোছুটি আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। সার সার লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েদীরা, একজনের হাত থেকে আরেকজন বালতি নিয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ গলায় হাত দিয়ে অঁক অঁক শব্দ করতে শুরু করল কবির চৌধুরী, যেন বমি পেয়েছে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে অসুস্থতার ভান করল সে। তারপর খক্ খক্ করে কেশে শুয়ে পড়ল মাটির ওপর, গড়িয়ে সরে এল লাইনের কাছ থেকে বেশ একটু তফাতে, যেখানে ধোঁয়া কম, তাজা বাতাস পাওয়া যেতে পারে।

হামাগুড়ি দিয়ে প্রাচীরের দিকে সরে আসছে কবির চৌধুরী, একজন প্রিজন অফিসারের পায়ের সাথে ধাক্কা খেলো সে। গলায় আঙুল দিয়ে লোকটার জুতোর ওপর সত্যি সত্যি খানিকটা বমি করে দিল। ছিটকে সরে গেল অফিসার। কয়েদী যে প্রাচীরের কাছে চলে গেছে, সেটাকে সে কোন গুরুত্বই দিল না। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাচীরের ধারেকাছে কোন কয়েদীকে দেখা গেলে সেন্ট্রিরা মার মার কাট কাট শুরু করে দেয়।

মইয়ের মাথায়, মেনিলথিনের পাশে হোস পাইপ নিয়ে আরও দু'জন লোককে দেখা গেল। তিনজনই আগুনের দিকে পানি ছুঁড়ছে, কিন্তু একটু একটু

করে যান্ত্রিক মইটা ঘুরে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে সরে আসছে উঠনের আরেক দিকে। এক সময় কবির চৌধুরীর ধরাশায়ী শরীরের ঠিক ওপরে চলে এল মইয়ের উঁচু ডগা। ওপর থেকে রশির একটা মই নামিয়ে দিল মেনিলথিন, কবির চৌধুরীর মুখের সামনে পড়ল সেটা। খপ করে ধরে ফেলল কবির চৌধুরী, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, প্রাচীরের গায়ে পা দিয়ে তর তর করে উঠে যেতে শুরু করল মাথার দিকে।

এই সুযোগে কয়েদীরা পালাবার চেষ্টা করতে পারে, কাজেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে সেন্ট্রিদের। মহা গোলমালের মধ্যেও সবাই দিশেহারা হয়ে পড়ে না, দু'একজন ঠিকই তাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখে। একজন সেন্ট্রি আগুনের দিকে চোখ না রেখে চোখ রেখেছিল প্রাচীরের দিকে, কবির চৌধুরী তার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না। চোখের কোণ দিয়ে লোকটা দেখল, প্রাচীরের গায়ে কি যেন নড়ছে। ঝট করে সেদিকে ফিরল সে, এবং সাথে সাথে চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না বা বুঝতে পারছে না লক্ষ করে সেন্ট্রি নিজেই প্রাচীরের দিকে ছুটল। কবির চৌধুরী ইতোমধ্যে প্রাচীরের মাথায় উঠে পড়েছে প্রায়। রশির মইটা নিচের দিকে ঝুলছে, সেটা লক্ষ্য করে লাফ দিল সেন্ট্রি।

আগুনের দিক থেকে সরিয়ে হোস পাইপটা নিচের দিকে তাক করল মেনিলথিন। বুকের ওপর পানির প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল সেন্ট্রি। কবির চৌধুরীকে এড়িয়ে পানির তীব্রগতি মোটা ধারা আবার খুঁজে নিল লোকটাকে, তাকে যেন পেরেক দিয়ে আটকে রাখা হলো মাটির সাথে।

রশি বেয়ে মইয়ের ওপর চলে এল কবির চৌধুরী। সাথে সাথে পিছিয়ে যেতে শুরু করল যান্ত্রিক মই। সেই সঙ্গে নিচু হতে থাকল তার ডগা। ফায়ার-ইঞ্জিনের সামনে, মাটির ওপর নামল কবির চৌধুরী। এত সব ঘটে গেল, কিন্তু চীফ ফায়ার অফিসার ব্যস্ত থাকায় কিছুই দেখল না। কন্ট্রোল ভেহিকেল থেকে নেমে তিন নম্বর টার্নটেবল অ্যাপ্লায়্যান্সের দিকে এগোল সে। এই কয়েক সেকেন্ড আগে এটার উপস্থিতি তার মনে একটা খুঁতখুঁতে ভাব এনে দিয়েছে। কিন্তু বেশি দূর এগোতে হলো না তাকে, মইয়ের মাথা থেকে হোস পাইপের পানি ছুঁড়ে তাকেও মাটির ওপর শুইয়ে রাখল মেনিলথিনের একজন সহকারী। অভিজ্ঞ লোক, এই পরিস্থিতিতে কি করতে হয় জানা আছে। উপুড় হয়ে ক্রল করতে শুরু করল চীফ ফায়ার অফিসার। কন্ট্রোল ওয়াগনের কাছে ফিরে আসতে লোকজন তাকে টেনে তুলে নিল ভেতরে।

একটা চশমা বাড়িয়ে ধরল একজন। চশমাটা এঁটে নিয়েই লাফ দিয়ে ক্যাবে উঠে পড়ল কবির চৌধুরী। সাথে সাথে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফুল স্পীডে অ্যাপ্লায়্যান্স ছেড়ে দিল ড্রাইভার। হঠাৎ সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে সামনের পথ থেকে লাফ দিয়ে সরে গেল কয়েকজন। যান্ত্রিক মইটা এখন খাড়া হয়ে আছে, ওপর থেকে সেন্ট্রি, পুলিস আর দমকল বাহিনীর লোকজনের ওপর হোস পাইপের পানি ছুঁড়ছে মেনিলথিন আর তার সহকারীরা। যাদুমন্ত্রের মত কাজ

হলো। বিনা বাধায় জেলখানা থেকে সগর্জনে বেরিয়ে এল তিন নম্বর টার্নটেবল অ্যাপ্লায়্যান্স।

ঝড়ের গতিতে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এল যান্ত্রিক দানবটা। নির্জন একটা গ্রাম্য রাস্তার মুখে থামল সেটা। ঝটপট নেমে পড়ল ক্রুরা, দ্রুত ইউনিফর্ম খুলে ফেলে সাদা পোশাক পরল, তারপর উঠে বসল অপেক্ষারত ভ্যানে। দুটো সিট্রন গাড়িও অপেক্ষা করছিল, সেগুলোয় চড়ল কবির চৌধুরী, মেনিলথিন আর তিন সহকারী। কাপড়চোপড় বদলাচ্ছে ওরা, দুটো গাড়ি একসাথে ছুটতে শুরু করল।

ফোঁস করে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল কবির চৌধুরী। 'তোমার কাজে আমি খুশি হয়েছি, মেনিলথিন,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে।

'এ তো কিছুই না, স্যার,' সবিনয়ে বলল মেনিলথিন। 'আপনার জন্যে দরকার হলে নিজের জান দিতেও আপত্তি নেই আমার।'

এক্সপেরিমেন্টের জন্যে জ্যান্ত মানুষ বলি দেবার দরকার হলে মেনিলথিনের কথা যেন মনে পড়ে, নিজেকে বলে রাখল কবির চৌধুরী। লোকটার এই অতিমাত্রায় গদগদ ভাব, অতি উৎসাহ—ভাল লাগেনি তার।

দস্তানা, মুখোশ আর ক্লিনিকের গাউন পরতে হবে শুনে চোখ গরম করে ডাক্তার কোচের দিকে তাকাল রাসকিন। 'তার মানে? পারকিন এখনও অপারেটিং টেবিলে?'

'আরে না,' তাকে আশ্বস্ত করে বলল ডাক্তার। 'আগে সব পরে নিন, তারপর নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

গজ গজ করতে করতে ওগুলো পরল রাসকিন। তারপর ডাক্তারের পিছু পিছু এসে ঢুকল পারকিনের কেবিনে। 'আওয়াজ করবেন না!' ফিসফিস করে বলল ডাক্তার। পা টিপে টিপে বিছানার দিকে এগোল সে।

তাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ল রাসকিন 'এর মানে কি জানতে চাই আমি!' বিস্ফোরিত হলো সে। মোটা একটা আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল ব্যান্ডেজ জড়ানো পারকিনের মাথায়। 'সব ঢাকা কেন? জানেন না, আমি ওর চেহারা দেখার জন্যে এসেছি?'

'স্‌স্‌স্‌,' ঠোঁটে আঙুল রেখে আওয়াজটা করল ডাক্তার। 'আস্তে কথা বলুন, প্লীজ। আমি চাই না হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাক ওর। ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, হঠাৎ নড়াচড়া করলে ক্ষতি হবে।'

গলার আওয়াজ আরও এক ধাপ চড়িয়ে রাসকিন জানতে চাইল, পারকিনের চেহারা কখন দেখতে পাবে সে। ডাক্তার তাকে ব্যাখ্যা করে বলল, পারকিনের সিস্টেমের ভেতর দুটো জিনিস কাজ করছে এই মুহূর্তে—ঘুমের ওষুধ আর অ্যান্টিবায়োটিক। টিস্যু ইনফেকশনের ঝুঁকি কমাবার জন্যে আরও অন্তত বারো ঘণ্টা পারকিনকে নড়াচড়া করতে দেয়া উচিত হবে না। তার শরীরে নতুন অনেক জিনিস লাগানো হয়েছে, শরীর সেগুলোকে গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করবে কিনা তাও জানা যাবে এই বারো ঘণ্টার মধ্যে। কাজেই এই

সময়ের আগে পারকিনের ঘুম ভাঙানোটা নেহাতই বোকামি হবে। সবশেষে অনুরোধ করল ডাক্তার, বলল, 'প্লীজ, জেদ ধরবেন না। চলুন ওপরে যাই, আমার সাথে ডিনার খাবেন। রাতটা আরাম করে ঘুমোন, তারপর সকাল বেলা দেখবেন ওকে।'

'কিন্তু সকাল আটটার মধ্যে, মনে থাকে যেন!' হুমকির সুরে বলল রাসকিন।

'ঠিক আছে, তাই হবে,' বলল ডাক্তার। মিটিমিটি হাসিটা এতক্ষণে দেখা গেল তার মুখে। 'কে. জি. বি-র কথা আমি ফেলি কি করে!'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর গলায়, শাসানির সুরে বলল রাসকিন। 'রাশিয়ানদের কাছে আপনি ঋণী, নিজের ভাল চাইলে কথাটা কখনও ভুলবেন না।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেল, পোল্যান্ডে ধরা পড়ল সিলবারস্টেইন। আর সব ইহুদির সাথে সবচেয়ে কাছের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। সিলবারস্টেইনের বয়স ছিল অল্প, কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী ছিল সে, সদ্য ডাক্তারী পাস করে বেরিয়েছে। তার ভাগ্যই বলতে হবে, ক্যাম্পটা ছিল ছোট আকারের, আর দুর্বল এবং ঘৃণ্য রুচির এক লোক ছিল সেটার কমান্ড্যান্ট। ক্যাম্পের মেডিক্যাল ইউনিটে নাম লেখাল সিলবারস্টেইন, সেই সাথে কমান্ড্যান্টের বিকৃত রুচিকে উসকে দিয়ে, তাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে, তার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল।

বন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাত কমান্ড্যান্ট, আর তাকে সবরকমভাবে সাহায্য করত সিলবারস্টেইন। এতে করে দু'দিক থেকে লাভবান হলো সে। কমান্ড্যান্ট হাতে থাকায় ক্যাম্পের ভেতর দু'নম্বর লোক হয়ে উঠল সিলবারস্টেইন, ইহুদি এবং বন্দী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতার গুণে সাধারণ জার্মান সেনাদের মাথার ওপরও ছড়ি ঘোরাতে পারে। পুরুষাঙ্গ বা স্তন কেটে নেয়া, জ্যান্ত মানুষের পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে মজা দেখা ইত্যাদি নিষ্ঠুর এবং অশ্লীল এক্সপেরিমেন্টের ভেতর দিয়ে নিজের হাত পাকাতে শুরু করল সে। সার্জিক্যাল টেকনিক বেশ ভালই জানা ছিল তার, কমান্ড্যান্টের কাছ থেকে বন্দীদেরকে গিনিপিগ হিসেবে উপহার পেয়ে নিজের জ্ঞান আরও বাড়িয়ে নিতে লাগল সে। সে-সময়ের সবচেয়ে উত্তেজনাকর আর আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতাটি ছিল বাচ্চা এক মেয়ের ওপর এক্সপেরিমেন্ট। পূর্ণবয়স্ক এক বিশালদেহী পুরুষের যৌনাঙ্গ সাত বছরের মেয়েটির শরীরে পুঁতে দেয়া হয়েছিল। ছ'হপ্তা বেঁচে ছিল বাচ্চাটি, তারপর ভেতরে আটকে থাকা বিষ আক্ষরিক অর্থেই বিস্ফোরিত হয়–মারা যায় সে।

জার্মানী যাবার পথে পোল্যান্ডে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল রেড আর্মি। এই আকস্মিক হামলার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কমান্ড্যান্ট, সবাইকে নিয়ে রেড আর্মির হাতে ধরা পড়ল সে। জার্মানদের এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারল রেড আর্মি।

কমবয়সী ডাক্তার বলে বেঁচে গেল সিলবারস্টেইন। অগ্রবর্তী বাহিনীর একজন ইন্টেলিজেন্স ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দেয়া হলো তাকে। জার্মান

কমান্ড্যান্টের মত রাশিয়ান ক্যাপ্টেনকেও নিজ গুণে খুশি করতে পারল সিলবারস্টেইন। ক্যাপ্টেনের উৎসাহে আবার সে তার সার্জিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট শুরু করল, এবার জার্মান বন্দীদের ওপর।

যুদ্ধ শেষ হতে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হলো সিলবারস্টেইনকে। ক্যাপ্টেনের সহযোগিতায় মস্কোর একটা হাসপাতালে ভাল কাজ পেল সে। এবং কিছু দিন যেতেই কে.জি.বি-র নজরে পড়ে গেল। সার্জিক্যাল এক্সপেরিমেন্টে সিলবারস্টেইন একটা প্রতিভা, সেটাকে কাজে লাগাবার প্ল্যান করল কে.জি.বি।

সিলবারস্টেইনকে ট্রেনিং দেয়ার আয়োজন করা হলো। সবাইকে খুশি করে ট্রেনিঙে উতরে গেল সে। এর কয়েক বছর পর সুইটজারল্যান্ডে পাঠানো হলো তাকে। জুরিখে এসে স্থানীয় প্লাস্টিক সার্জেনদের সাহায্য নিল সিলবারস্টেইন। নিজের চেহারা বদলে ফেলল সে। নিজের নতুন নামকরণ করল, ডিয়েটর কোচ।

কে.জি.বি-র টাকায় 'কোচ ক্লিনিক' খুলল সে। তাকে বলা হলো, অ্যালেক্স রাসকিন তোমার বস্, তার নির্দেশমত চলতে হবে তোমাকে।

সেই থেকে চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে সিলবারস্টেইন ওরফে ডিয়েটর কোচ। একটা কথা ভেবে খুব মজা পায় সে—চেহারা বদলের জন্যে আজ যারা তার কাছে আসে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ধনী ইহুদি। জার্মান কমান্ড্যান্টের বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার সময় ইহুদি শিশুদের ওপর যখন এক্সপেরিমেন্ট করত সে, তখন কিন্তু তাদেরকে অজ্ঞান করে নিত না। আজকাল অবশ্য ধনী ইহুদি বুড়ো খোকাদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করার সময় তাদেরকে অজ্ঞান করে নিতে ভুল হয় না তার।

অনেক ঘাটের পানি কোডি পারকিনও খেয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য তাকে কে.জি.বি-র ফাঁদে নিয়ে এসে ফেলে। ছোটখাট অন্যায়-অপরাধ সেই জ্ঞান হবার পর থেকেই করে আসছে সে, কিন্তু প্রফেশনাল ক্রিমিন্যাল হয়ে ওঠার আগেই ভিয়েৎনাম যুদ্ধে যেতে হয় তাকে। দু'বছর যুদ্ধ করে মানুষ মারার কাজটা ভালই রপ্ত করে সে, তারপর ধরা পড়ে যায় গেরিলাবাহিনীর হাতে। পারকিন ছিল গোঁয়ার, নিজের প্রতি ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু ভিয়েতনামী টরচার তাকে একেবারে ছাতু বানিয়ে ছাড়ে। ওই সময় কে.জি.বি-র একটা রিক্রুটিং টীম ছিল ওখানে, তারা ট্রেনিং দিয়ে নিজেদের দলে টানার জন্যে আরও ক'জনের সাথে বেছে নিল পারকিনকে। মস্কোয় নিয়ে আসা হলো তাকে। ভিয়েতনামীদের টরচারের পর এক-আধটু জেদ আর আত্মবিশ্বাস যা-ও বা তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স তার ব্রেন ওয়াশ করে সেটুকুও কেড়ে নিল। তারা পারকিনের মনে প্রথমে খুব ভাল করে ঢোকাল রাশিয়ান ভীতি। অবস্থা এমন হলো, রাশিয়ান চেহারা দেখা মাত্র বা রাশিয়ান ভাষা শোনা মাত্র থরথর করে কাঁপতে শুরু করে পারকিন। এরপর সুইটজারল্যান্ডে, কে.জি.বি কন্ট্রোলার অ্যালেক্স রাসকিনের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে, সুযোগ মত পারকিনকে কাজে লাগাবে সে।

কিন্তু রাসকিন সাবধানী লোক, পারকিনকে সাথে সাথে কাজে লাগাল না। তার মনে রাশিয়া ভীতি আরও ভাল করে ঢোকাবার জন্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটা কর্মসূচী নিল সে। পাহাড়ের ওপর নিজেদের একটা সেফ-হাউসে বন্দী করে রাখা হলো পারকিনকে। পুরো একটা বছর ধরে চলল তার ওপর অকথ্য, অবর্ণনীয় শারীরিক আর মানসিক অত্যাচার। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল, রাসকিনকে দেখামাত্র প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলে পারকিন। ফলাফল দেখে সন্তুষ্ট হলো রাসকিন। এরপর পারকিনকে বোঝাল সে, বেঈমানী না করলে তার ওপর আর কোন অত্যাচার চালানো হবে না। এই ধরনের আশ্বাস শুনতে পাবে বলে আশা করেনি পারকিন, কাজেই রাসকিনকে ভয় করার সাথে সাথে তার ওপর আস্থা রাখতেও শিখল সে। এরপর রাসকিন তাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাল। সেখানে কে.জি.বি-র হয়ে দু'বছর কাজ করল পারকিন। ছোটখাট তথ্য জোগাড়ের কাজ, বেশ ভালই উতরে গেল পারকিন।

এই সময় ডাক্তার কোচ নমনীয় চেহারার একজন লোক চাইল, চেহারা বদল করার জন্যে দরকার। চেহারার বর্ণনা শুনে প্রথমেই পারকিনের কথা মনে পড়ল রাসকিনের। প্রস্তাব শুনে সানন্দে রাজি হলো পারকিন, কে.জি.বি-র হয়ে কাজ করতে হলে আরও আগেই তার চেহারা বদল হওয়া দরকার ছিল।

পরদিন সকাল আটটায় রাসকিনকে নিয়ে আবার কোডি পারকিনের কেবিনে ঢুকল ডাক্তার কোচ। ব্যান্ডেজ আর টেপ খুলে নেয়া হয়েছে, কিন্তু এখনও পুরোপুরি ঘুম ভাঙেনি পারকিনের। বিছানায় শুয়ে গোঙাচ্ছে সে, যন্ত্রণায় কাতর শরীরটা মাঝে মধ্যেই মোচড় খাচ্ছে, কেঁপে উঠছে থরথর করে। কেবিনে কোন নার্স বা ডাক্তার নেই। তবু সাবধানের মার নেই মনে করে রাসকিন জানতে চাইল, 'এই নতুন চেহারা আপনি ছাড়া আর কে দেখেছে?'

'আর কেউ দেখেনি,' জোর দিয়ে বলল ডাক্তার কোচ। 'ব্যান্ডেজ আমি নিজে খুলেছি। তার আগে ডাক্তার গুস্তার পরীক্ষা করে গেছে ওকে, বলেছে, ইনফেকশনের কোন লক্ষণ নেই। বিপদ কেটে গেছে।'

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রাসকিনের সাথে কথা বলতে চায় কেউ।

রিসিভার নিয়ে শুধু নিজের নামটা উচ্চারণ করল রাসকিন, অপর প্রান্তের বক্তব্য শুনল, দু'বার হুঁ-হাঁ করে নামিয়ে রাখল রিসিভার। 'প্যারিস থেকে খবর এসেছে,' ডাক্তারকে বলল সে, 'ফ্রেসনেস জেলখানায় আজ সকালে আগুন লেগেছে, এখনও নেভানো যায়নি। একজন কয়েদী পালিয়েছে। কে হতে পারে বুঝে নিন।'

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ডাক্তারের চেহারা। 'খেল শুরু হতে তাহলে আর বেশি দেরি নেই?'

ইঙ্গিতে পারকিনকে দেখাল রাসকিন। 'ওর ঘা শুকাতে ক'দিন লাগবে আর?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ডাক্তার বলল, 'ব্যান্ডেজ খোলার সময় আসলে হয়নি, শুধু আপনি দেখবেন বলে...'

বিছানার কাছে সরে এল রাসকিন। চেয়ারে বসে ট্রলি থেকে একটা এনভেলাপ তুলে নিল সে, ভেতর থেকে বের করল মাসুদ রানার একটা ফটো। ফটোতে রানার শুধু ঘাড়ের পিছন আর কান দেখানো হয়েছে। ট্রলি থেকে এবার একটা টেন বাই টুয়েলভ এনলার্জমেন্ট তুলে নিল সে। সেটা ধরল পারকিনের নতুন, লালচে কানের সামনে। আধ মিনিট পর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফিরল ডাক্তারের দিকে। 'ভালই।'

'ভালই?' চোখ কপালে তুলল ডাক্তার, কোচ। 'মাসুদ রানার গর্ভধারিণী মাকে পর্যন্ত বোকা বানাবে ও, আর আপনি বলছেন শুধু ভাল!'

আবার টেলিফোন। রিসিভার তুলল ডাক্তার, শুনল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'কোন রকম দুশ্চিন্তা করবেন না, তৈরি হয়ে যাবে ও । হ্যাঁ।...বেশ।'

'মেনিলথিন,' রাসকিনের চোখে প্রশ্ন লক্ষ করে বলল ডাক্তার। 'কবির চৌধুরী আগামী হপ্তায় আসছে এখানে। পারকিনকে পাঁচ হপ্তার মধ্যে তৈরি অবস্থায় চায় সে।'

'পারকিনকে তার আগেই দরকার আমার,' বলল রাসকিন। 'তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলো ওকে।'

মাসুদ রানার কণ্ঠস্বর টেপ করে নিয়ে আসা হয়েছে, নিয়ে আসা হয়েছে তার ভাবভঙ্গি, নড়াচড়া, আচার-আচরণের মৌন এবং সশব্দ ফিল্ম। কবির চৌধুরীর তৈরি করা একটা ডোশিয়ার আছে ডাক্তারের কাছে, মাসুদ রানা সম্পর্কে যা জানার সব তা থেকে জানা যাবে। তার নেপথ্য কাহিনী, শিক্ষা, প্রেম-ভালবাসা, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়ে বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে। রানা এজেন্সি, ইউনাইটেড নেশনস অ্যান্টি ক্রাইম অর্গানাইজেশন এবং এয়ারফোর্স ওয়ানের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী থেকে শুরু করে সমস্ত টেকনিক্যাল অফিসারসহ, সংশ্লিষ্ট সবার সাথে রানার কি সম্পর্ক, তারও বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে ওই ডোশিয়ারে।

একটা ব্যাপার পারকিনের অনুকূলে—এয়ারফোর্স ওয়ানের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের অনেকের সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় আছে রানার, তবে খুব ঘনিষ্ঠতা নেই। কাকে কি বলে সম্বোধন করে রানা, কার সাথে কতটুকু গভীর সম্পর্ক সেটুকু শুধু মনে রাখতে হবে পারকিনকে। ডোশিয়ার পড়ে জানা গেছে, খুব কম কথার মানুষ রানা—পারকিনের জন্যে সুবিধেই সেটা। বেশিরভাগ সময় নির্লিপ্ত এবং বোবা হয়ে থাকলেও কেউ তাতে বিস্মিত হবে না। কম কথা বললে ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকে। তবে, রানার ভূমিকায় নেমে যাদের সাথে পারকিনের দেখা হবে তাদের শুধু চেহারা মনে রাখলেই চলবে না, সেই সাথে তাদের নেপথ্য কাহিনীও মুখস্থ করতে হবে তাকে।

ডাক্তার কোচের ধারণা, রানার বান্ধবীদের নিয়ে সবচেয়ে বড় বিপদে পড়বে পারকিন। রানা যে-সব মেয়ের সাথে প্রেম করেছে বা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছে তাদের অনেকের জীবনী, চেহারা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি জোগাড় করা হয়েছে বটে, কিন্তু সে-সব মেয়েদের কারও সাথে পারকিন যদি বিছানায় যায়, ব্যাপারটা কেঁচে যেতে পারে। কারণ, ডাক্তারের জানামতে অর্থাৎ কবির

চৌধুরীর ডোশিয়ারের তথ্য অনুসারে, এসব ব্যাপারে অসাধারণ সমঝদার ও পারদর্শী লোক রানা। অথচ সেই জায়গায় পারকিন স্রেফ স্বার্থপর একজন রেপিস্ট ছাড়া কিছু নয়; গায়ের জোরে নিজের তৃপ্তি আদায় করে নিতে অভ্যস্ত।

পারকিনের সুন্নত কর্মটি সম্পন্ন করে সমস্যার আংশিক সমাধান করেছে ডাক্তার। তার মানে, ব্যথা না পেয়ে রানার বান্ধবীদের সাথে কুকাজ করার উপায় নেই তার, অন্তত প্রথম কিছুদিন। তবে ডাক্তার আর রাসকিন দু'জনেই একমত হয়ে স্থির করল, রানার ব্যান্ধবীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয়া হবে পারকিনকে। যৌন-মিলন তার জন্যে একেবারে নিষিদ্ধ। রানার কোন বান্ধবী যদি উপযাচিকা হয়ে এগিয়ে আসে, চর্ম রোগ বা আর কোন অজুহাত দেখিয়ে এড়াবার চেষ্টা করতে হবে তাকে।

আবার সেই প্রশ্নটা করল ডাক্তার, 'আপনি মনে করেন, পারকিন উতরে যাবে? সে-যোগ্যতা ওর কি আছে? এটা ওর জন্যে একটা কঠিন পরীক্ষা...'

দুশ্চিন্তায় ভুগতে নিষেধ করল রাসকিন বলল, 'আমার বিশ্বাস, শতকরা একশো ভাগ উতরে যাবে পারকিন। আমার চেয়ে কে আর ওকে ভাল চেনে।'

এরপর কবির চৌধুরীর প্রসঙ্গে ফিরে এল ওরা। প্রশ্ন উঠল, এয়ারফোর্স ওয়ানে পারকিনকে কেন চাইছে কবির চৌধুরী।

'তা জানি না,' বলল রাসকিন। 'কিন্তু কবির চৌধুরীর খরচের বাহার দেখে বোঝা যাচ্ছে, ছোটখাট কোন মতলব আঁটেনি সে। পারকিনকে নিজের লোক ভাববে সে, কিন্তু আসলে পারকিন আমাদের লোক—কবির চৌধুরী বা ইউনাকো কেউ সেটা জানছে না। এখানেই ফায়দা লুটব আমরা।'

'এর মধ্যে ইউনাকো আসছে কোত্থেকে?' জানতে চাইল ডাক্তার।

'কবির চৌধুরী জেল ভেঙে পালিয়েছে, কাজেই ইউনাকো তো অবশ্যই জড়িয়ে পড়বে,' বলল রাসকিন।

'তবে, আমার একটা ধারণার কথা বলি,' খানিক ইতস্তত করে মুখ খুলল ডাক্তার। 'পারকিনকে বেশিক্ষণ রানা হিসেবে কাজে লাগানো উচিত হবে বলে মনে করি না। কখন কি ভুল করে বসে, কে জানে!'

মাথা নড়ল রাসকিন। 'রানার ভূমিকায় যত বেশি দিন রাখা যায় ওকে ততই ভাল, দিনে দিনে নিখুঁত হয়ে উঠবে ও, ভুলের মাত্রা কমতে থাকবে। যত দিন যাবে, রানা হিসেবে ততই উতরে যাবে ওর আচরণ।'

ডাক্তারের চেহারা দেখে মনে হলো, রাসকিনের সাথে একমত হতে পারছে না সে।

আপনমনে মুচকি হাসল রাসকিন, তারপর বলল, 'খামোকা বেশি বেশি দুশ্চিন্তা করছ। একটা কথা বলি, তাহলে বুঝতে পারবে। পারকিনকে আমরা শুধু এই একটা কাজে ব্যবহার করছি না।'

'মানে?'

'রানার ভূমিকায় পারকিনকে স্থায়ী হতে দিতে অসুবিধে কোথায়?'

চোখ কপালে উঠে গেল ডাক্তারের। 'সে কি। কিন্তু...তাহলে আসল মাসুদ রানার কি হবে? তার কপালে কি ঘটবে?'

'কেন, আন্দাজ করতে পারো না?' নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি দেখা গেল রাসকিনের প্রকাণ্ড মুখে।

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডাক্তার কোচের চেহারা। 'ও, বুঝেছি! আসল রানাকে সরিয়ে দেবে কবির চৌধুরী!'

'হ্যাঁ,' বলল রাসকিন। 'আর সে যদি না সরায়, আমরা তো আছিই!'

ডাক্তার বুঝতে পারল, আসল রানা না থাকলে নকল রানার পক্ষে আসল রানার ভূমিকায় কাজ করা সত্যিই অনেক সহজ হয়ে যাবে।

তিন

ওয়াশিংটনে ইউনাকোর অফিস।

তিন তিনটে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী রয়েছে ইন্দোনেশিয়ান যুবক রাশীদ সোনাইদির। রোগা-পাতলা একহারা চেহারা, চোখে স্টীল রিমের চশমা। অত্যন্ত চটপটে এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী সে, জাতিসংঘের এই অপরাধ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পেয়ে ছেলেমানুষের মত গর্ব অনুভব করে, যদিও সেটা প্রকাশ করার কথা স্বপ্নেও ভাবে না। ইউনাকোয় তার একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে,–অবশ্য ইউনাকোর নিজের ভবিষ্যৎ যদি উজ্জ্বল হয় তবেই।

হাতে একটা কমপিউটর প্রিন্ট আউট নিয়ে চলতি মেয়াদের ডেপুটি ডিরেক্টরের কামরায় নক করল সে। ভেতর থেকে মিষ্টি নারী কণ্ঠ ভেসে এল, 'কাম ইন।'

মস্ত ডেস্কের পিছনে সিংহাসন আকৃতির একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে রয়েছে সোহানা চৌধুরী। হাতে একটা বল পয়েন্ট কলম, ডেস্কের ওপর খোলা একটা ফাইলে চোখ। নীল জর্জেট শাড়ির সাথে নীল ব্লাউজ পরে আছে, ভিকাট ব্লাউজের কল্যাণে বুকের উপত্যকা আর দুই পাহাড়ের খানিক উত্থান অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হয়, বাকিটুকু কল্পনা করতেও খুব একটা অসুবিধে হয় না।

জাতিসংঘের অ্যান্টি-ক্রাইম কনফারেন্সে বক্তৃতা দেবার সময় মেজর জেনারেল রাহাত খান পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, পৃথিবীর কুখ্যাত আর দুর্ধর্ষ অপরাধী–অপরাধ করাটা যাদের শুধু পেশা নয়, নেশা হয়ে গেছে; তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা এবং দমন করার জন্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একটা ইউনিট থাকা দরকার। তাঁর সেই সুপারিশ ধরেই ইউনাইটেড নেশনস অ্যান্টি-ক্রাইম অর্গানাইজেশন অর্থাৎ ইউনাকোর সৃষ্টি হয়। কয়েকটা দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে ইউনাকোর ভার নিতে রাজি হন রাহাত খান। সংগঠন কিভাবে চলবে তা ঠিকঠাক মত গুছিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রথম দিকে দু'মাস অন্তর দিন সাতেকের জন্যে ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে আসতেন, দেখাশোনা করে আবার ফিরে যেতেন দেশে। কিন্তু কিছুদিন যাবার

পর সময়ের অভাব হেতু এই উপরি দায়িত্বটা তাঁর কাছে বোঝা হয়ে উঠল। উভয় সঙ্কটে পড়লেন তিনি। একদিকে নিজের সময় নেই, আরেকদিকে ইউনাকোকে অবহেলা করাও সম্ভব নয়। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটা প্রজেক্টে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছে ইউনাকো, এর অকালমৃত্যু ঘটতে দিতে চান না তিনি।

চিন্তা-ভাবনা করে একটা সমাধান বের করলেন রাহাত খান। সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রতিষ্ঠানের অনারারী ডিরেক্টর তিনিই থাকবেন, কিন্তু প্রতি ছ'মাসের জন্যে একজন করে ডেপুটি ডিরেক্টর নির্বাচন করা হবে, পালা করে তারাই চালাবে ইউনাকো। ডেপুটি ডিরেক্টর নির্বাচিত হবে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভোটে, যাতে কোন রকম পক্ষপাতিত্বের সুযোগ না থাকে। তবে যে-কেউ ডেপুটি ডিরেক্টরের পদে প্রার্থী হতে পারবে না। প্রার্থী বা প্রার্থিনী হতে হলে তাকে হতে হবে সে-দেশের সেরা ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের একজন। আরও নানা রকম শর্ত আছে, সেগুলোও পূরণ করতে হবে।

রাহাত খানের এই সিদ্ধান্ত সবারই মনঃপূত হয়। সেই থেকে নিয়মটা চমৎকার চালু হয়ে গেছে। প্রথম ডেপুটি ডিরেক্টর নির্বাচিত হয় নেপালের একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার, তারপর একে একে মিশর, ব্রাজিল এবং যুগোশ্লাভিয়ার ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা ইউনাকোর ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে আসে। চলতি মেয়াদের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশের সোহানা চৌধুরী, তার মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র বাকি আছে দু'মাস। জোর গুজব শোনা যাচ্ছে, পরবর্তী মেয়াদের জন্যেও নাকি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সোহানা।

ইউনাকোর ডেপুটি ডিরেক্টরের পদটি একটা ক্ষমতা বটে, কিন্তু সেই সাথে এর গুরু-দায়িত্বও কম নয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে ইন্টেলিজেন্স প্রধান, সেনাবাহিনী প্রধান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ আরও অনেকের সাথে পরিচয় এবং যোগাযোগ রাখতে হয় তাকে। সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকেই যায়, কাজেই সব দিক বুঝে, সবকিছু বিবেচনার মধ্যে রেখে কাজ করতে হয় তাকে।

সোহানাই প্রথম ইউনাকোর মহিলা ডেপুটি ডিরেক্টর। দায়িত্ব বুঝে নেবার পর অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে একজন মহিলাকেই বেছে নিয়েছে ও। সাবরিনা আর্চার চেকোশ্লোভাকিয়ার মেয়ে।

কমপিউটর রূম হয়ে ডেপুটি ডিরেক্টরের কামরায় ঢুকল রাশীদ সোনাইদি। কমপিউটর রূমটা বেশ বড়সড়। তিন দেশের তিনজন টেকনিশিয়ান তিনটে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে, প্রত্যেকের মাথায় একটা করে হেড সেট, মুখের কাছ থেকে ইঞ্চি দেড়েক দূরে শূন্যে ঝুলছে মাউথ পীস। একশো ত্রিশটা দেশের সাথে রেডিও যোগাযোগ আছে এই কামরার। মাঝে মধ্যে একযোগে দশ-বারোটা দেশ থেকে মেসেজ আসে, টেকনিশিয়ানরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন। ওদের সামনে গোটা দেয়াল জুড়ে রয়েছে একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ। যে-দেশ থেকে কল আসে ম্যাপের ওপর সেই দেশের ওপর বসানো লাল বোতামটা জ্বলে ওঠে। এই ম্যাপেরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ রয়েছে সোহানার ডেস্কে।

চেম্বারে ঢুকে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল রাশীদ সোনাইদি। দশ সেকেন্ড নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকার পর খুক করে কাশল সে। ফাইল থেকে মুখ না তুলেই হাত বাড়িয়ে দিল সোহানা। তার হাতে কমপিউটর প্রিন্ট আউটটা ধরিয়ে দিল রাশীদ।

পাঁচ লাইনের একটা তালিকা ওটা। খোলা ফাইলের ওপর ফেলে সেটার ওপর চোখ বুলাল সোহানা।

১। সৌভিয়েত রাশিয়া: জাহাজ যোগে সোনা চালান—ক্লভোস্ট থেকে মস্কো।

২। ইইসি: ব্রাসেলস। পাক্ষিক ন্যাটো কনফারেন্স।

৩। মধ্যপ্রাচ্য: বাহরাইন। ওপেক মন্ত্রীদের ওয়াশিংটন ভ্রমণ।

: কায়রো। ইসরায়েল-মিশর প্রতিরক্ষা আলোচনা।

৪। দক্ষিণ গোলার্ধ : কেপ টাউন। হীরের একটা চালান আমস্টারডাম যাবার পথে এখানে আসবে।

এন্ট্রিগুলোর তারিখ দেখে নিয়ে তালিকাটা আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত আরেকবার পড়ল সোহানা, এবার অত্যন্ত ধীর গতিতে। তারপর মুখ তুলে জানতে চাইল, 'এই-ই সব?'

সমীহের সাথে মাথা দুলিয়ে রাশীদ বলল, 'আগামী তিনমাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা ঘটবে তার মধ্যে থেকে এগুলোকেই বাছাই করেছে আমাদের কমপিউটর। তার মানে, কমপিউটরের ধারণা, এই পাঁচটা ঘটনার যে-কোন একটার দিকে নজর পড়বে আমাদের মিস-গাইডেড বন্ধুর।'

'মিস-গাইডেড বন্ধু মানে?' দোরগোড়া থেকে জানতে চাইল একটা নারী কণ্ঠ। চেম্বারে ঢুকল সোহানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাবরিনা আর্চার। পঁচিশ বছরের সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী মেয়ে—ব্যক্তিগত জীবনে সোহানার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। 'ব্যাপার কি সোহানা, একটু সময় নিয়ে চুল ছাঁটাব সে-সুযোগও আমি পাব না? ডেকে আনার জন্যে লোক পাঠিয়েছ, কারণটা নিশ্চয়ই সিরিয়াস...'

'সিরিয়াস তো বটেই,' বলল সোহানা। ফাইল বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিল ও। 'মিস-গাইডেড বন্ধু মানে, বৈজ্ঞানিক কবির চৌধুরী। জেল থেকে পালিয়েছে সে।'

'মাই গড।' এগিয়ে এসে ধপ্ করে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ল সাবরিনা। 'বলো কি!'

হাতের বল পয়েন্ট কলমটা ডেস্কের ওপর বার কয়েক মৃদু শব্দে ঠুকল সোহানা, চেহারায় চিন্তার ভাব। বলল, 'কোন কারণ ছাড়া কাজ করার লোক কবির চৌধুরী নয়। আমি ভাবছি, আরও কিছুদিন আগে বা পরে কেন পালাল না সে?'

তীক্ষ্ণ চোখে সোহানার দিকে তাকাল সাবরিনা। 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'বললাম তো, কোন কারণ বা প্ল্যান ছাড়া নড়াচড়া করার লোক কবির চৌধুরী নয়। আরও আগে জেল থেকে বেরোয়নি, কারণ প্ল্যানটা হয়তো

এতদিন গোছানো হয়নি। এখন হয়তো সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে, তাই আরও কিছুদিন জেল খাটা তার পক্ষে সম্ভব হলো না।'

'বুঝেছি!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সাবরিনার। 'তুমি বলতে চাইছ, কবির চৌধুরী আবার কিছু একটা ঘটাতে যাচ্ছে।'

'আমার তো তাই ধারণা,' বলল সোহানা। 'এই ঘটনাগুলোর ওপর নজর রাখতে বলছে কমপিউটর,' বলে প্রিন্ট আউটটা সাবরিনার দিকে ঠেলে দিল ও। 'দুটো ঘটনা বাদ দিয়ে বাকিগুলোর ওপর নজর রাখা দরকার।'

প্রিন্ট আউটে দু'বার চোখ বুলিয়েই ন্যাটো কনফারেন্স আর কায়রো মীটিং, এই দুটোকে বিবেচনার বাইরে রাখল সাবরিনা। সোহানার মত সে-ও জানে, রাজনীতি সম্পর্কে মোটেও আগ্রহী নয় কবির চৌধুরী।

প্রিন্ট আউটটা সোহানাকে ফিরিয়ে দিয়ে সাবরিনা বলল, 'আমরা বোধহয় বাহরাইনের ওপরও নজর না রাখলে পারি।'

প্রিন্ট আউট তালিকার সংখ্যাগুলোর ওপর টিক চিহ্ন দিচ্ছিল সোহানা, কলম থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল সে। জানতে চাইল, 'কেন?'

'আগামী মাসের শেষ দিকে ওপেক মন্ত্রীরা বাহরাইন থেকে ওয়াশিংটনে আসছে, তাই না? মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিজস্ব প্লেন এয়ারফোর্স ওয়ান পাঠানো হবে তাঁদেরকে নিয়ে আসার জন্যে। আমরা জানি, ওই সময়ের জন্যে এয়ারফোর্স ওয়ানের সিকিউরিটি চীফ হিসেবে দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছে তোমাদের বাংলাদেশের মাসুদ রানা, তাই না? তাহলে আর ওদিকে নজর রাখার দরকার কি?'

প্রিন্ট আউটটা রাশীদের দিকে ঠেলে দিল সোহানা। বলল, 'কোথায় কোথায় অপারেটর পাঠাতে হবে টিক চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি।'

সেটা নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রাশীদ।

'এয়ারফোর্স ওয়ানে রানা আছে, ঠিক সেই কারণেই সেটার ওপর চোখ রাখা দরকার আমাদের,' বলল সোহানা। 'রানার ওপর কবির চৌধুরীর নেক নজর আছে, সে তো জানোই তুমি। তাছাড়া, এয়ারফোর্স ওয়ানে ওপেক মন্ত্রীরা থাকবেন, দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশগুলোর প্রতিনিধিরা এক জায়গায় জড়ো হচ্ছেন—এই সুযোগ কবির চৌধুরী ছেড়ে দেবে কেন? আমার তো মনে হয় ওইদিকেই বেশি খেয়াল দেয়া দরকার।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে সাবরিনা বলল, 'হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে তোমার কথাই বোধহয় ঠিক।' এক সেকেন্ড পর জিজ্ঞেস করল সে, 'এয়ারফোর্স ওয়ানের ওপর নজর রাখার জন্যে বলেছ তাহলে?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'রানার সাথেও যোগাযোগ করব আমি,' বলল ও। 'কবির চৌধুরীর নাম উল্লেখ করে কিছু বলা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, তবে আরও সাবধান থাকতে বলব ওকে। এয়ারফোর্স ওয়ানে অপারেটর পাঠাতে বলেছি, কিন্তু কাকে পাঠাতে হবে তা বলিনি। কাকে পাঠানো যায় বলো তো?'

'টমলিনকে পাঠালে কেমন হয়?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সোহানা। 'টমলিনকে রানা চেনে।'

'রানার নলেজ এবং পারমিশন ছাড়াই তাকে পাঠাতে চাও তুমি?' জানতে চাইল সাবরিনা।

'হ্যাঁ,' জোর দিয়ে বলল সোহানা। 'অবশ্যই রানাকে কিছু জানানো হবে না। এই পদ্ধতিতে আগেও আমরা কাজ করেছি।'

'কিন্তু রানার মত প্রথম শ্রেণীর সেরা একজন এজেন্ট যেখানে জড়িত...'

নিঃশব্দে হাসল সোহানা। 'সবার বেলাতেই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে। লোকটা যেখানে কবির চৌধুরী, আমরা সেখানে কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।' একমুহূর্ত পর বলল, 'রোজি কারভারকে পাঠালে কেমন হয়?'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওপেক মন্ত্রীদের দাওয়াত দিয়েছেন বেশ কয়েক মাস আগে। উদ্দেশ্য তেল নিয়ে আলোচনা। আমন্ত্রণ কবুল করেছেন ওপেক মন্ত্রীরা, কিন্তু তখনও সফরের তারিখ ঠিক হয়নি। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলো ছাড়াও, ওপেক মন্ত্রীদের শত্রুর কোন অভাব নেই, কাজেই কোথাও যাবার কথা উঠলে খুব সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে দেখতে হয় সেখানে যাওয়া নিরাপদ হবে কিনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা নির্ভরযোগ্য ইত্যাদি। সম্ভবত ওপেক মন্ত্রীদের মনের এই ভাবটা বুঝতে পেরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রস্তাব দেন, সম্মানীয় মেহমানদের ওয়াশিংটনে নিয়ে আসার জন্যে তিনি তাঁর উড়ন্ত হোয়াইট হাউস বা আসমানী দুর্গ বোয়িং স্যাতশো সাত এয়ারফোর্স ওয়ানকে বাহরাইনে পাঠাবেন। ওপেক মন্ত্রীদের মন জয় করার এটা একটা কূটনৈতিক চালও বটে। তেলা মাথায় তেল দেয়ার প্রবণতা আজকের মত আর কোন যুগে এতটা প্রসার লাভ করেনি বলেই মনে হয়।

কিন্তু এয়ারফোর্স ওয়ান নিতে আসবে শুনেও ওপেক মন্ত্রীরা নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। ইতোমধ্যে ওপেক মন্ত্রীদের ওপর একাধিকবার হামলা চালানো হয়েছে, প্রতিবার ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছেন তাঁরা। তাঁদের ওয়াশিংটন সফরের ঘটনাটা ব্যাপক প্রচার পাবে, শত্রুরাও চুপ করে বসে থাকবে বলে মনে হয় না। এই সব ভেবে ওপেকের তরফ থেকে একজন প্রতিনিধিকে পাঠানো হলো, বাংলাদেশের এক তীক্ষ্ণধী বৃদ্ধের কাছে, যাঁর ভুরুর ফরটি ফাইভ পারসেন্ট এখনও কাঁচা রয়ে গেছে।

প্রতিনিধি ভদ্রলোক একজন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল, মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের পূর্ব-পরিচিত। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চীফের সাথে দেখা করে লে. জেনারেল তাঁকে নির্দিষ্ট একটা সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে বললেন, 'বিনিময়ে আমরা এয়ারফোর্স ওয়ানের সিকিউরিটি চীফ হিসেবে আপনার মাসুদ রানাকে চাই। আপনি সাহায্য করতে রাজি হলে তবেই মন্ত্রীদের সফরের তারিখ কনফার্ম করা হবে। তা না হলে সফর বাতিল হয়ে যাবারই সম্ভাবনা বেশি।' প্রস্তাবটা দেবার আগে নানা ঘটনা আর লক্ষণের বর্ণনা দিয়ে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে বোঝানো হলো, ওপেক মন্ত্রীদের এই সফরের সময় বিপদ ঘটার সম্ভাবনা সত্যি কতটা আছে।

ওপেককে সাহায্য করতে আপত্তি নেই রাহাত খানের, কিন্তু তাই বলে

যুক্তরাষ্ট্রকেও তো তিনি অপমান করতে পারেন না। জানতে চাইলেন, এয়ারফোর্স ওয়ানের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে গোটা একটা ইউনিট আছে, সিকিউরিটি চীফ আছে, তারা কি দোষ করল?

ওপেক প্রতিনিধি জানালেন, 'তারা কোন দোষ করেনি, কিন্তু আমাদের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট বলছে আর কেউ নয়, শুধু মাসুদ রানা সাথে থাকলেই মন্ত্রীরা এই সফরে নিরাপদ বোধ করবেন।'

রাহাত খান বুঝলেন, এটা কেবল বন্ধুর কাছে বন্ধুর আবদার নয়, এর সাথে আরও অনেক কিছু জড়িত—প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কিন্তু সমস্যা দেখতে পেলেন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে। ওপেক যদি ওয়াশিংটনকে বলে, এয়ারফোর্স ওয়ানের সিকিউরিটি চীফ হিসেবে আমরা মাসুদ রানাকে চাই, যুক্তরাষ্ট্রের আত্মসম্মানে ঘা লাগবে, লাগার কথাও। ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি বের করলেন তিনি, ওপেক প্রতিনিধিকে বললেন, 'তোমরা ওয়াশিংটনকে বলো, সিকিউরিটি চীফ হিসেবে একজন অমার্কিন লোককে চাই আমরা। তাকে মুসলমান হতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ বা মাসুদ রানার নাম মুখেও আনবে না।'

উৎসাহের সাথে লে. জেনারেল জানতে চাইলেন, 'তারপর?'

কিভাবে এগোতে হবে, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন রাহাত খান। 'ওপেকের এই প্রস্তাব পাবার পর স্বভাবতই এক এক করে অনেক দেশের এবং লোকের নাম পাঠাবে ওয়াশিংটন, তোমরাও এক এক করে সবগুলোকে বাতিল করতে থাকবে। তারপর ওয়াশিংটন জানতে চাইবে, আপনারাই বলুন কোন্ দেশের কোন্ লোককে সিকিউরিটি চীফ হিসেবে চান আপনারা। তোমরা তখন কয়েকটা দেশের নাম বলবে, তার মধ্যে বাংলাদেশও থাকবে। আর বাংলাদেশের কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্টের নাম ওয়াশিংটন যদি প্রস্তাব করে, সেটা মাসুদ রানা হতে বাধ্য। এইভাবে, তোমরা যেটা চাও সেটা ওয়াশিংটনের মুখ থেকে প্রস্তাবের আকারে আসুক, তাহলে আমরা মাসুদ রানাকে পাঠিয়ে দেব।'

খুশি মনে বিদায় নিলেন ওপেক প্রতিনিধি। এর ঠিক পনেরো দিন পর ওয়াশিংটন থেকে বাংলাদেশকে সবিনয়ে বলা হলো, মাসখানেকের জন্যে এয়ারফোর্স ওয়ানের সিকিউরিটি চীফ হিসেবে মাসুদ রানাকে পেলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যারপর নাই প্রীত হবেন। বিনিময়ে তিনি বাংলাদেশকে···ইত্যাদি।

উত্তরে ছোট্ট একটা মেসেজ পাঠালেন রাহাত খান, রানা যাবে।

এরপরই ওপেক মন্ত্রীদের সফরের তারিখ স্থির করা হয়।

কোচ ক্লিনিকের গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল কালো মার্সিডিজ। সামনের সীট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল মেনিলথিন, পাশের দরজা খুলে সামান্য একটু মাথা নত করে বাউ করল সে। পিছনের প্যাসেঞ্জার সীট থেকে নামল দীর্ঘদেহী কবির চৌধুরী। পরনে আইভি লীগ স্যুট, চোখে অদ্ভুত ধরনের একটা চশমা। হাতে একটা ওয়াকিং স্টিক। ছড়িটা সহায়ক নয়, সৌখিনতা। মুখে এখন খোঁচা খোঁচা দাড়ি নেই তার, সেখানে শোভা পাচ্ছে নিখুঁত ফ্রেঞ্চ কাট। কাঁধ পর্যন্ত

লম্বা বাবরি একটু অবিন্যস্ত, পাহাড়ী বাতাসে আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অনেক অসাধারণ প্রতিভাবানের মধ্যে যেমনটি দেখা যায়, তার চোখে অদ্ভুত একটা চকচকে ভাব আছে, মনে হয় দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে আগে থেকেই গাড়ি-বারান্দায় অপেক্ষা করছিল ডাক্তার কোচ। চেহারায় সমীহের ভাব, ঠোঁট টেপা মিটি মিটি হাসিটা মুখ থেকে উধাও হয়ে গেছে। 'আসুন স্যার, আসুন স্যার,' করে পথ দেখিয়ে ক্লিনিকের পিছনের সাজানো গোলাপ বাগানে কবির চৌধুরীকে নিয়ে এল সে। ফাঁকা একটা কোণে হুইলচেয়ারে বসে, সোনালী চুলের এক নার্সের সাথে কথা বলছে পারকিন।

ডাক্তার পারকিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগেই, গলা চড়িয়ে কবির চৌধুরী বলল, 'কেমন আছ, মেজর রানা?'

চরকির মত আধপাক ঘুরে গেল হুইলচেয়ার, হুবহু মাসুদ রানার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে বলল পারকিন, 'আপনাকে তো চিনলাম না! আমাদের বোধহয় পরিচয় হয়নি।'

'চমৎকার, পারকিন, চমৎকার!' কবির চৌধুরীর গম্ভীর চেহারায় সন্তোষের ভাব ফুটল। 'রানার ডোশিয়ারে আমার কথা লেখা হয়নি, সেজন্যেই আমাকে চিনতে পারোনি তুমি। তার অবশ্য কোন দরকারও নেই। তোমার এই কৃতিত্বে আমি খুশি, পারকিন। আমার এক্সপেকটেশনকে ছাড়িয়ে গেছ তুমি।'

ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকেও অভিনন্দন জানাল কবির চৌধুরী। বত্রিশ পাটি বাঁধানো দাঁত বের করে আনন্দ প্রকাশ করল ডাক্তার কোচ। ঘোর দুশমনকেও স্বীকার করতে হবে, চেহারার এই রূপান্তর প্লাস্টিক সার্জারীর জগতে একটা বিস্ময়।

এরপর ছোট একটা ভূমিকা করে ডাক্তার বলল, 'মাসুদ রানা হিসেবে পারকিনকে ঠিক কি করতে হবে, জানতে চায় ও।'

মুহূর্তে মুখের হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল, রক্তচক্ষু মেলে ডাক্তারের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর পারকিনের দিকে ফিরল কবির চৌধুরী। কর্কশ সুরে বলল, 'এত তাড়া কিসের? এত কৌতূহল কেন? কখন কি করতে হবে, কাকে কি বলতে হবে, আমার জানা আছে—মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই।'

'না, বলছিলাম কি…মানে…' হাত কচলাতে শুরু করল ডাক্তার।

'অসম্ভব!' ছড়িটা আকাশের দিকে খাড়া করে ধরে হুংকার ছাড়ল কবির চৌধুরী। 'তোমার কিছু বলার থাকতে পারে না! বলব আমি, তোমরা সবাই শুনবে!'

মুখ চুন হয়ে গেল ডাক্তারের। তাড়াতাড়ি বলল, 'জ্বে-আজ্ঞে—হ্যাঁ, তা তো বটেই…'

'শোনো!' গম্ভীর গলায়, আদেশের সুরে বলল কবির চৌধুরী। 'মন দিয়ে শোনো, এক কথা দু'বার বলি না আমি।' বলে একটু বিরতি নিল সে। দেখে নিল, সবাই তার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে আছে কিনা। 'অনেক কাঠ-খড়

পুড়িয়েছি আমি। মেধা, শ্রম আর টাকা বিস্তর খরচ করেছি। কেন? হাতের কাজটা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে চাই বলে। এই কাজ যদি উদ্ধার না হয়, তোমরা যদি আমাকে নিরাশ করো, কেউ যদি নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হও–তার শাস্তি কি জানো?' আবার একটু বিরতি নিল সে। তারপর বলল, 'ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করার জন্যে কেউ তোমরা বেশি দিন বেঁচে থাকবে না। যেখানেই থাকো, আমার হাত থেকে কারও রেহাই নেই। জ্যান্ত কবর দেব। কিংবা হয়তো ডালকুত্তাকে দিয়ে খাওয়াব।'

আরেকটু হলে হুইলচেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল পারকিন, ঝট করে তাকে ধরে ফেলল মেনিলথিন। পারকিন ভয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়েছিল বলে এটা ঘটল, নাকি রাগের মাথায় উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল বলে, ঠিক বোঝা গেল না।

মিনমিন করে বলল ডাক্তার, 'আমরা সবাই আপনার আদেশ মেনে চলব, স্যার। আপনার কাজে ব্যর্থ হলে বা আপনার সাথে বেঈমানী করলে তার পরিণতি কি হতে পারে, আমরা সবাই তা জানি। নতুন করে মনে করিয়ে দিলে পারকিন তো নার্ভাস হয়ে পড়বেই। চেহারা বদলের মানসিক ধাক্কাটা এখনও সামলে উঠতে পারেনি ও, তার মধ্যে আবার যদি...'

ছড়িটা মাটির বুকে দু'বার ঠুকে ক্রোধ প্রকাশ করল কবির চৌধুরী। 'তুমি ডাক্তার, উজবুকের মত বেশি কথা বলো। ঠিক আছে, পারকিনের মনে আমার ভয় ঢোকাবার কাজটা আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম। আর হ্যাঁ, ওকে জানিয়ে দাও, সময় হলে অপারেশন সম্পর্কে সবই জানতে পারবে সে। কিন্তু বিশদ প্ল্যান জানার সৌভাগ্য তোমার হবে না। শেষ পর্যন্ত তুমিও জানবে, দুনিয়ার আর সব লোকের সাথে, তার আগে নয়।'

'ঠিক আছে, বেশ তো...'

'শেষ একটা কথা,' গলার স্বর অস্বাভাবিক ভারী হয়ে উঠল কবির চৌধুরীর। 'তোমাকে আমি টাকা দিয়েছি শুধু চেহারা বদলের জন্যে, তা মনে কোরো না। তোমার মুখের ওই দুর্গন্ধময় ফাঁকে তালা দিয়ে রাখবে, সেই শর্তে টাকা নিয়েছ। কথাটা মনে থাকবে?'

দ্রুত মাথা কাত করে জানাল ডাক্তার, মনে থাকবে। তারপর বলল, পারকিন সব জানার পর তার কাছ থেকে তথ্য আদায়ের কোন চেষ্টা করবে না সে।

ক্ষীণ একটু নিষ্ঠুর হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, ডাক্তারের ওপর রক্তচক্ষু স্থির রেখে বলল কবির চৌধুরী, 'খুব ভাল কথা। আমরা তাহলে পরস্পরকে চিনতে পেরেছি।'

'জ্বে-জ্বে,' একটু হাসতে চেষ্টা করে বলল বুড়ো কোচ।

সবাই জানে, বেঈমানী করলে তাকে ক্ষমা করে না কবির চৌধুরী। তার সাথে বেঈমানী করেছে অথচ আজও পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে, এমন পুরুষ নেই।

নাম রোজি কারভার। বর্তমানে ইউনাকোর একজন পার্ট-টাইম অপারেটর।

ইউনাকোর ফিল্ড অপারেটরদের একজন বাদে কাউকে চেনে না রোজি, সেই একজন মাসুদ রানা নয়।

পূর্বসুরিদের নিয়মের ধারা বজায় রেখে চলতি মেয়াদের ডেপুটি ডিরেক্টর সোহানা চৌধুরীও তার ফিল্ড অপারেটরদের পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, একান্ত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে দেয় না। অপারেটর আর এজেন্টরা কেউ কাউকে না চিনলে অনেক সুবিধে। এদের কেউ যদি শত্রুর হাতে ধরা পড়ে, সে শুধু নিজের পরিচয়ই ফাঁস করতে পারবে, আর কারও সম্পর্কে কিছু জানা না থাকায় শত্রুরা টরচার করেও কিছু আদায় করতে পারবে না। হেডকোয়ার্টার স্টাফদের সবাই চেনে, কাজেই তাদের পরিচয় জানার ব্যাপারে কারও কোন আগ্রহ নেই। সোহানার গোপন অস্ত্র বলতে এই অপারেটর আর এজেন্টরা, এদেরকে সে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র থেকে সংগ্রহ করে। এদের সবার নামের পূর্ণাঙ্গ একটা তালিকা অমূল্য ইন্টেলিজেন্স হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। এই তালিকার ওপর চোখ বুলাবার সুযোগ পেলে, এমন কি এজেন্টরাও স্তম্ভিত এবং অভিভূত না হয়ে পারবে না।

পরিস্থিতি বাধ্য করলে দু'জন এজেন্টের একটা টীম গঠন করে সোহানা, কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে সব কথা দু'জনকেই সমানভাবে জানানো হয় না, যার যা জানা দরকার তাকে শুধু সেটাই জানতে দেয়া হয়। এই ধরনের টীম অনেকদিন টিকেও থাকতে পারে, যদি বেঁচে থাকে দু'জনেই। কোন কোন এজেন্টকে কখনোই টীমে নেয়া হয় না, এদের কেউ হয়তো রাজনৈতিক ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর, কেউ হয়তো একা কাজ করতে পছন্দ করে। জাত, ধর্ম, শ্রেণী, রঙ–এজেন্ট নির্বাচনের সময় এগুলোর কোনটাই বিবেচনার মধ্যে রাখে না সোহানা। উপযুক্ত হলেই হলো, সে নিগ্রো, কদাকার, অগ্নিপূজক হতে পারে–সোহানা তাকে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দিয়ে থাকে। টীম গঠনের সময় একটা দিকে বিশেষ লক্ষ রাখে ও–টীমের দু'জন সদস্য যেন সবদিক থেকে পরস্পরের বিপরীত হয়। সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির, আলাদা মেজাজের দু'জন মানুষকে এক করে ও বোধহয় মজা পায়।

যেমন, রানা আর রোজি।

হীরে চোর হিসেবে আন্তর্জাতিক 'খ্যাতি' অর্জন করেছে রোজি কারভার। রানার সাথে তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে? অথচ তাকেই রানার পার্টনার নির্বাচন করেছে সোহানা।

রাশীদ সোনাইদিকে আবার ডেকে পাঠাল সোহানা। বলল, 'এয়ারফোর্স ওয়ানে রোজি থাকবে রানার ছায়া হিসেবে। রোজি রানার কথা জানবে, কিন্তু রানা রোজির কথা জানবে না। আমি নির্দেশ না পাল্টানো পর্যন্ত এই-ই বহাল থাকবে। পরিষ্কার?'

'ইয়েস, ম্যাডাম।'

ব্রিফিঙের জন্যে রোজিকে ডেকে নিয়ে আসতে গেল রাশীদ। সাবরিনা বলল, 'আমি ভাবছি রানা ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে। এক সময় তো জানবেই সে।'

'এই পদ্ধতি ওর জন্যেও সুবিধের হবে,' বলল সোহানা। 'কবির চৌধুরী যদি নাক গলায়ই, তার প্রথম টার্গেট হবে রানা—এই অবস্থায় পার্টনারের নিরাপত্তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় ভুগবে ও, এ আমি চাই না। আর, সব চুকে যাবার পর রানা যদি ব্যাপারটা জানে, এবং রেগে ওঠে—না হয় ঝড়টা আমিই সামলাব। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা তো জানব যে ওর নিরাপত্তার জন্যে আমাদের একজন এজেন্ট ওখানে আছে।'

সোভিয়েত দৈনিক ইজভেস্তিয়ার আবাসিক রিপোর্টার হিসেবে যথেষ্ট সম্মান পায় অ্যালেক্স রাসকিন। এই পদে দীর্ঘকাল বহাল রয়েছে সে, সেই সূত্রে সুইটজারল্যান্ডের সব মহলের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তার। মধ্য-জেনেভায় বিলাসবহুল একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে সে। কাউকে ভিড়িয়ে দিয়ে তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করার সুইসদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে রাসকিন—কোন চাকরবাকর রাখে না সে। কাজেই সেদিন সাত সকালে কলিংবেল বেজে উঠতে দরজা খোলার জন্যে নিজেকেই যেতে হলো তার।

দরজা খুলে দিয়েই হতভম্ব হয়ে পড়ল রাসকিন। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে.জি.বি-র অত্যন্ত প্রভাবশালী এক কর্মকর্তা। ছদ্মনাম, কামচিন।

রাসকিনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কামরায় ঢুকল কামচিন। দরজা বন্ধ করল রাসকিন, ঘুরে দাঁড়িয়ে কর্মকর্তার মুখোমুখি হলো। 'কেউ তো বলেনি, স্যার, আপনি আসছেন!'

'আমি কোথায় যাচ্ছি না-যাচ্ছি কাউকে তা জানানো হয় না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল কামচিন। 'এদিকের সব খবর কি?'

'আগে আপনি আরাম করে বসুন, স্যার!' তাড়াহুড়ো করে হুইস্কি আর সিগার বের করে পরিবেশন করল রাসকিন। ভোদকা আর সিগারেট মেজর পর্যায়ের মেহমানদের জন্যে চলতে পারে, কামচিন একজন জেনারেল।

কামচিন আবার তাগাদা দেবার আগেই রাসকিন তার রিপোর্ট পেশ করল। সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট, দু'মিনিটের বেশি লাগল না।

দাঁতের ফাঁকে চুরুট, মাথাটা একদিকে একটু কাত করা, পাঁচতলার জানালা দিয়ে দূর দিগন্তে তাকিয়ে আছে কামচিন, রাসকিনের কথা শুনতে পেল বলে মনে হলো না। কিন্তু তার মনোযোগ যে ঘরের ভেতরই আছে, সেটা বোঝা গেল রাসকিন থামতে না থামতে কথা বলতে শুরু করায়।

'এই ভদ্রলোক, কবির চৌধুরী,' মৃদু কণ্ঠে, প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলল কামচিন, 'তার ওপর আমাদের সুনজর পড়েছে। তার প্রজেক্টের ব্যাপারে আমরা আগ্রহী।' রাসকিনের দিকে ফিরল সে। ইঙ্গিতে নিজের কান দেখিয়ে বোঝাতে চাইল, এখানে আড়িপাতা যন্ত্র থাকতে পারে। 'প্রজেক্টের নাম মুখে আনার দরকার নেই। এই প্রজেক্ট...'

নিঃশব্দে হাত নেড়ে কামচিনকে বাধা দিল রাসকিন। মূক-অভিনয়ের সাহায্যে তাকে বোঝাতে চাইল, এখানে আড়িপাতা যন্ত্র নেই। কিন্তু পাল্টা হাত নেড়ে রাসকিনের এই বক্তব্য অগ্রাহ্য করল কামচিন। মুখে বলল, 'আমার

কথাই থাকবে।'

অগত্যা সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রাসকিন।

'এই প্রজেক্ট,' আবার শুরু করল কামচিন, 'আমাদের জন্যে অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করছে।'

হঠাৎ উত্তেজনা বোধ করল রাসকিন। বুঝল, কামচিন অস্বীকার করলেও, কবির চৌধুরীর সিকিউরিটি ভেদ করতে পেরেছে মস্কো। কবির চৌধুরীর প্রজেক্টটা কি কে.জি.বি-র কর্মকর্তারা সেটা জেনে ফেলেছে।

'কবির চৌধুরীর প্রজেক্ট থেকে গুরুতর একটা আন্তর্জাতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে,' বলে চলেছে কামচিন। 'তাতে করে, আমাদের বন্ধু নয় এমন একজন লোক শুধু যে অপমান বোধ করবে তাই নয়, মহা অশান্তি আর অসুবিধের মধ্যে পড়ে যাবে সে।'

এই ক্ষীণ সূত্র থেকেই যা বোঝার বুঝে নিল রাসকিন। সন্দেহ নেই, কামচিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কথা বোঝাতে চাইছে। ইতোমধ্যে রাসকিন জেনেছে, এয়ারফোর্স ওয়ান ওপেক মন্ত্রীদের ওয়াশিংটনে নিয়ে আসার জন্যে বাহরাইনে যাচ্ছে। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে অসুবিধে হলো না তার। বুঝল, কবির চৌধুরীর টার্গেট আসলে ওই ওপেক মন্ত্রীরাই। গুরুতর আন্তর্জাতিক বিপর্যয় বলতে এটাকেই বোঝাতে চাইছে কামচিন। হ্যাঁ, অবশ্যই, যুক্তরাষ্ট্র আর ইউনাকোর জন্যে এটা একটা গুরুতর বিপর্যয় তো বটেই! ওপেক মন্ত্রীরা মার্কিন প্রেসিডেন্টের মেহমান হিসেবে তাঁরই প্লেনে করে রওনা হবে, প্লেন বা মেহমানদের কিছু একটা হলে ভদ্রলোক তো অপমান বোধ করবেই। ক্ষতি আর অশান্তি কি পরিমাণে হতে পারে কল্পনা করতে গিয়ে রীতিমত পুলকিত হয়ে উঠল রাসকিন।

'লাভবান হবার অনেক রাস্তা আছে,' বলল কামচিন। 'তার একটি হলো, নগদপ্রাপ্তির আশা না করে পরের ক্ষতি করা। প্রথম দিকে মনে হতে পারে, এ পণ্ড শ্রম, এতে কোন লাভ নেই। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। শত্রুকে বিপাকে ফেলে, তার ক্ষতি করা—এর সবটাই লাভ। আমার খুব প্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি এটা। তুমি আমার সাথে একমত হতে পারো কিনা ভেবে দেখো। তা না হলে, এই কাজের দায়িত্ব আমি আর কাউকে দেব।'

অকৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে রাসকিন বলল, 'আপনার আদেশ আমি কখনও অমান্য করেছি, স্যার?'

'গুড। কিন্তু মনে রেখো, আমরা যে প্ল্যানটা নিয়েছি তাতে ব্যর্থ হবার অনুমতি নেই। আমার বাচনভঙ্গি তোমার অসুবিধে করছে না তো—ঠিক ঠিক বুঝতে পারছ সব?'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ব্যাখ্যা করে আরও বলল কামচিন, কবির চৌধুরীর প্রজেক্টে রাসকিন যদি কে.জি.বি-র অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে, মস্কো তার প্রতি ভারি কৃতজ্ঞ বোধ করবে। কথাটা শুনে অনেক কষ্টে একটা ঢোক গিলল রাসকিন। মনে মনে প্রার্থনা করল, মস্কো যেন আমার ওপর খুব বেশি খুশি না হয়। কারও ওপর খুব বেশি খুশি হলে তাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে

প্রমোশন দেয়া হয়। তার বেলাতেও যদি এই ঘটে, তাহলেই সর্বনাশ!

রাসকিনের মনের কথা বুঝতে পেরে নিঃশব্দ হাসি ফুটল কামচিনের ঠোঁটে। নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরিয়ে বলল সে, 'আমি বলতে চাইছি, এই কাজে তুমি সফল হলে, তোমাকে প্রমোশন দেয়া হবে ঠিকই, কিন্তু মস্কোয় ডেকে পাঠানো হবে না।'

এই বিলাসবহুল, স্বাধীন জীবন হারাতে চায় না রাসকিন। কামচিনের কথা শুনে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল তার, কিন্তু চেহারাটা স্বাভাবিক রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল, যাতে তার স্বস্তিবোধটুকু কামচিন টের না পায়।

'কিন্তু,' ঠাণ্ডা সুরে বলল কামচিন, 'কবির চৌধুরীর এই প্রজেক্ট যদি ব্যর্থ হয়, সেটাকে তোমার ব্যর্থতা বলে ধরে নেয়া হবে। সেক্ষেত্রে মস্কোয় ফিরে না গিয়ে তোমার কোন উপায় থাকবে না। কাজেই, আমি ব্যর্থ না হবারই পরামর্শ দেব।'

চার

তিন রকম সুগন্ধ ঢেলে তৈরি করা হয়েছে গোসলের পানি। তার মধ্যে, আন্দাজ করা যায়, একটা হলো গোলাপের আতর। বাথটাবটা এত বড় যে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটা যায়। সিলিং আর চার দেয়াল জুড়ে আয়না, নিজের যেদিকটা খুশি দেখতে পাওয়া যায়। এই না হলে বাদশাহী আয়েস! স্বীকার করতে হবে, বাহরাইনের শাসক শেখ জাহিদ আল খালিদের রুচি আছে।

শেখের ব্যক্তিগত বাথরুমে স্নান করছেন মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারি ম্যালকম ফিলপট। মধ্য-বয়স্ক, কিন্তু এখনও চেহারা থেকে তারুণ্যের ভাবটুকু নিঃশেষে মুছে যায়নি। মার্কিন সেক্রেটারিদের মধ্যে আর কারও চেহারায় তাঁর মত পৌরুষ-দীপ্ত ভাব নেই। ঠাণ্ডা মাথার লোক বলে পরিচিত হলেও, পেশাগত জীবনে দু'একবার তাঁকে ভাবাবেগতাড়িত হতে দেখা গেছে বলে রটনা আছে। প্যাঁচে ফেলে সুবিধা আদায়, মেয়েদের অপমান, শিশুদের ওপর অত্যাচার আর বিশ্বাসঘাতকতা, এই চারটে জিনিস তাঁর দু'চোখের বিষ। একাধিক সঙ্কটে একাধারে ধৈর্য আর সাহসের পরিচয় দিয়ে প্রচুর সুনাম কিনেছেন ভদ্রলোক।

এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্টের কথা ভাবছেন ফিলপট। লাঞ্চ খাবার জন্যে হোয়াইট হাউসে ডাকা হয় তাঁকে, আসল উদ্দেশ্য ছিল মন্ত্রীত্ব গছানো। লাঞ্চে বসে প্রেসিডেন্ট যে কথাগুলো বলেন, মনে পড়ে গেল তাঁর, সেদিন প্রেসিডেন্টকে অত্যন্ত বিচলিত আর উদ্বিগ্ন দেখে এসেছেন তিনি।

'দেখো ফিলপট,' প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, 'এই কাজের দায়িত্ব তোমাকে দিচ্ছি কারণ আমাদের তেলের অবস্থা তোমার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। যত রকম ভাবে সম্ভব ওপেক মন্ত্রীদের খুশি করতে হবে এখন আমাদের।

কাজেই, তোমার সাহায্য আমার দরকার। ওদের সুনজর না পেলে···বুঝে নাও। আমি তোমার সাফল্যের জন্যে প্রার্থনা করব।'

'সব আমার ওপর ছেড়ে দিন, মি. প্রেসিডেন্ট,' বলেছিলেন ফিলপট। 'ওদের মন জয় করার সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি।' লাঞ্চ শেষ করে পকেটে এনার্জি পোর্টফলিও ভরে হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি।

এর ক'দিন পরই পুব-পশ্চিম তেল সহযোগিতার সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্যে ওপেক মন্ত্রীরা মিলিত হলেন বাহরাইনে। বৈঠকে যোগ দেবার জন্যে মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারিকে নিমন্ত্রণ জানালেন বাহরাইনের শেখ, শেখের প্রাসাদে ব্যক্তিগত মেহমান হিসেবে থাকবেন তিনি।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাহরাইনে এসেছেন ফিলপট আজ তিন দিন। তেল নিয়ে আলোচনা ভালই এগোচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট শুধু তাঁর এনার্জি সেক্রেটারিকেই বাহরাইনে পাঠাননি, সেই সাথে ওপেক মন্ত্রীদের ব্যবহারের জন্যে নিজের ব্যক্তিগত বিমানটিকেও পাঠাচ্ছেন। এই প্লেনে করেই জেনেভা হয়ে ওয়াশিংটন যাবেন ওপেক মন্ত্রীরা, দ্বিতীয় পর্যায়ে বৈঠক ওখানেই বসবে।

বিশাল বাথটাব থেকে উঠে এলেন ফিলপট। শাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়ালেন তিনি। গা থেকে তেলতেলে পানি ধুয়ে ফেলে চলে এলেন ড্রেসিং রুমের দরজার কাছে, এখানে একজন মেইড তোয়ালে নিয়ে অপেক্ষা করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যদি এয়ারফোর্স ওয়ানে থাকেন, তবেই ওটাকে এয়ারফোর্স ওয়ান বলা যাবে। কিন্তু ওতে যদি সেক্রেটারি অভ স্টেট ভ্রমণ করেন, তাহলে ওই প্লেনেরই নাম হবে এয়ারফোর্স টু। ইউনাইটেড স্টেটস এয়ারফোর্সের ভাষায় ওটা ভিসিওয়ান থ্রী সেভেন স্ট্র্যাটোলাইন্যার, যদিও সাধারণ লোকে ওটাকে বোয়িং সাতশো সাত দূর-পাল্লার বাণিজ্যিক এয়ারলাইনার হিসেবে জানে। প্লেনটা প্রেসিডেন্টের, যখন খুশি ব্যবহার করার অধিকার সংরক্ষণ করেন তিনি। এয়ারফোর্স ওয়ান নামটাও তাঁর দেয়া।

ফরওয়ার্ড আর সেন্টার প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টের মাঝখানে প্রেসিডেন্টের জন্য একটা অফিস আর লিভিং-স্যুইট দরকার, তাই বোয়িঙের ভেতরটা রদবদল করা হয়েছে। অতিথিদের কাউকে 'অ্যাপার্টমেন্টে' আসার জন্যে বলা হয় না, তিনটে প্যাসেঞ্জার এলাকায় ওঠা-বসার জন্যে আরামদায়ক যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। এগুলো পড়েছে সামনের আর পিছনের গ্যালি এবং কয়েকটা রেস্টরুমের মাঝখানে। বোয়িঙের বহিরাবরণে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে বহুল পরিচিত এই শব্দ ক'টা–ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা। সাথে প্রেসিডেন্টের প্রতীক চিহ্নও আঁকা রয়েছে। এই বোয়িঙের ক্রুরা সবাই ওয়াশিংটন ডিসি, এন্ডরু এয়ারফোর্স বেস, ইউ এস এফ-এর উননব্বইতম মিলিটারি উইং থেকে এসেছে।

বাহরাইনের মুহারাক এয়ারপোর্টে এসে নামল বোয়িং। মেজর প্যাট্রিক হল পাইলট হলেও এই মুহূর্তে কন্ট্রোলের ডান দিকে কো-পাইলটের সীটে বসে আছে। তার বাঁ দিকে, পাইলটের সীটে বসেছে এয়ারফোর্স ওয়ানের কমান্ডার,

কর্নেল বিগ হার্ভে। ওদের পিছনে রয়েছে নেভিগেটর, অ্যান্থনি পল। তার পাশে দেখা যাচ্ছে ফ্লাইটের দু'জন ইঞ্জিনিয়ারের একজনকে—মাস্টার সার্জেন্ট কেন্ড ব্রাউন। ইতোমধ্যে টারমাকের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে বোয়িং। বোয়িঙের হ্যাচ অপারেট করছে সার্জেন্ট ব্রাউন।

আরেকজন লোক, অফিসারদের একজন, কিন্তু তাকে কোন অ্যারোনটিক্যাল দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয় না, খোলা হ্যাচের সামনে হাতে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এয়ারপোর্ট কর্মীরা হ্যাচের ঠিক নিচে সিঁড়ি লাগাচ্ছে, কাজটা শেষ হবার অপেক্ষায় রয়েছে সে। উঁকি দিয়ে রোদ ঝলমলে রানওয়ে আর এয়ারপোর্টের যতটা দেখা যায়, চোখ বুলিয়ে নিল একবার। প্লেন থেকে সবার আগে বেরোয় সে, ওঠে সবার শেষে।

এয়ারফোর্স ওয়ানের ফ্লাইট সুপারভাইজ করা যেমন কর্নেল বিগ হার্ভের দায়িত্ব, ঠিক তেমনি প্যাসেঞ্জার, ক্রু আর বোয়িঙের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একক দায়িত্ব এই লোকের। বোয়িঙের হেড অভ সিকিউরিটি সে—মেজর মাসুদ রানা। মেজর হলেও, পদাধিকারের কারণে সব ক'জন অফিসারকে তার নির্দেশ মেনে চলতে হয়।

ক্রুদের সবাই হ্যাচের সামনে, রানার পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, যতক্ষণ না চারদিক ভাল করে দেখে নেবার কাজটা শেষ করল রানা। তারপর রিভলভার পকেটে ভরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ও, পিছু পিছু আসছে বিগ হার্ভে, প্যাট্রিক হল, আর সব এয়ারম্যান। বোয়িং থেকে সবশেষে নামল ব্যাসিল গডলিম্যান—ইউ এস সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট, রানা ছাড়া ফ্লাইটের একমাত্র সশস্ত্র লোক।

দ্রুত পা চালিয়ে রানার পাশে চলে এল কর্নেল বিগ হার্ভে। 'ফিরে যাবার আগে মানামায় বেড়াতে যাওয়া সম্ভব, রানা?' আসলে অনুমতি চাইছে সে।

'তোমাদের কাজ হয়তো শেষ হয়েছে,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'কিন্তু আমার মাত্র শুরু হলো। যেতে পারো, কিন্তু ঠিক কোথায় যাচ্ছ জানিয়ে যেয়ো।'

'তোমার তাহলে সময় কাটবে কিভাবে?' ঠাট্টার সুরে জানতে চাইল কর্নেল। 'বাহরাইন তো আর ইউরোপ-আমেরিকা নয় যে বার, নাইটক্লাব, ক্যাবারে...'

'কাজের মধ্যে থাকলে ওসব দিকে মন দেবার সময় কোথায়,' বলল রানা। 'ব্যাগে করে কিছু বই-পত্র নিয়ে এসেছি, সিকিউরিটি শিডিউল চেক করতে হবে—কেটে যাবে সময়। হোটেল থেকে বেরুবার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

'এখানে, আমেরিকান এক্সপ্রেসে চাকরি করে কয়েকটা মেয়ে, বেশ ভাল দেখতে, আমার সাথে ওদের জানাশোনা আছে—তুমি যদি মনে করো একঘেয়ে লাগবে, ওদের কাউকে সঙ্গ দেবার জন্যে অনুরোধ করতে পারি।'

হেসে ফেলে বলল রানা, 'ধন্যবাদ। দরকার হবে না।'

এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের দিকে এগোচ্ছে ওরা। টার্মিন্যাল ভবনের একটা

জানালা থেকে একজন আরব চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে দেখছে ওদের–দু'জনের মধ্যে রানার ওপরই মনোযোগ তার বেশি।

যখন নিষ্পাপ চেহারার সাত বছরের বালিকা, তখন থেকে রোজি চোর। যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়ার ফোর্ট ডজে বাড়ি, বাবা-মার দাম্পত্য জীবন অশান্তিময় ছিল বলে ছোটবেলায় যত্ন বা আদর কিছুই পায়নি রোজি কারভার। লঞ্চে চড়ে এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে ফেরার সময় এক মহিলার ব্রোচ চুরি করে সে, সেই প্রথম হাতেখড়ি। ব্রোচ বেচে দু'ডলার পেয়েছিল, তার মানে ঠকানো হয়েছিল তাকে–তিন টুকরো হীরে বসানো ব্রোচ, কিন্তু হীরেগুলোকে চিনতে পারেনি রোজি। সেই শেষ, তারপর আর হীরে চিনতে কখনও ভুল হয়নি তার।

দশ বছর পর বাড়ি এবং ফোর্ট ডজ থেকে পালায় রোজি। আর ফিরে যায়নি, বা ফিরে যাবার দরকারও বোধ করেনি। ব্যাংকে তার নামে এক লাখ সত্তর হাজার ডলার জমা হয়েছে ইতোমধ্যে। তার আঠারোতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বেশ বড় একটা দাঁও মারে রোজি। এক হোটেলে হানা দিয়ে চারটে কামরা থেকে যা কামায়, ব্যাংক ব্যালেন্স দ্বিগুণ হয়ে যায় রাতারাতি। এই ঘটনার পর পুলিসের একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানায়, গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে, কোন দরজা দিয়ে না ঢুকে হোটেলের এগারোতলার কামরা থেকে অলঙ্কারগুলো চুরি করা হয়েছে–দেখেশুনে মনে হয়, সুদক্ষ একদল দড়াবাজের কাজ।

অথচ কাউকে ভাগ দেয়া স্বভাব নয় রোজির, গোটা একটা দলের কাজ একাই করছিল ও।

রোজির মূলধন বলতে তিনটে জিনিস–অসাধারণ রূপ, অস্বাভাবিক শারীরিক সামর্থ্য আর দুঃসাহস। এই তিনটে গুণ চলতি শতাব্দীর সেরা সফল চোরে পরিণত করেছে তাকে। তবে সাধারণ চোরদের মত যা পাবে তাই চুরি করবে, রোজি সেরকম মেয়ে নয়। শুধু একটা জিনিসই চুরি করে সে–হীরে।

আন্তর্জাতিক ক্রাইমের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে সোহানা, কাজেই এই উদীয়মান তারকা সহজেই তার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। সম্ভবত রোজি কারভার মেয়ে বলেই তার প্রতি একটু বিশেষ আগ্রহ এবং দুর্বলতা অনুভব করে সে। রোজির পরবর্তী কীর্তিকলাপের ওপর নজর রাখতে গিয়ে আবিষ্কার করল, এ মেয়ে একটা প্রতিভা। সম্ভাবনাটা উঁকি দিল হঠাৎ করেই, একে কাজে লাগানো যায় না? একে সৎ পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা কি একেবারেই অসম্ভব? চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি।

এই প্রথম নয়, এর আগেও অপরাধ জগতের দু'একটি প্রতিভাকে ইউনাকোয় কাজ করার সুযোগ দিয়েছে সোহানা। জাতিসংঘের এই প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলো চাঁদা দেয়, তারা একটা জিনিসই দেখতে চায়–ইউনাকো একের পর এক সাফল্য অর্জন করুক। সাফল্য কোন্ পথে এল, কে সাহায্য করল, সে-ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। সোহানার এতে বরং সুবিধেই হয়েছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পথ এখন পরিষ্কার।

সেজন্যেই তার আমলে ইউনাকো প্রায় প্রতিটি প্রজেক্টে সাফল্যের মুখ দেখছে।

সুযোগের অপেক্ষায় থাকল সোহানা। রোজি কারভার প্রথম ভুল করলেই তাকে তুলে আনবে ইউনাকোয়। বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। একটা ব্যাংকের ভল্ট থেকে পাঁচ লাখ ডলারের হীরে বসানো অলঙ্কার সরাল রোজি, পালাবার সময় সেটা জমা রাখল প্রেমিকের কাছে। লোকটা লোভ সামলাতে পারল না, রোজিকে ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়ার সময় ধরা পড়ল পুলিসের হাতে। জেরার মুখে রোজির নাম বেরিয়ে এল। সুইস পুলিস গ্রেফতার করল রোজিকে। এমনি সময়ে তাদের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে এল সোহানা।

ইউনাকো থেকে যথেষ্ট রোজগার করে রোজি, এমনিতেও সে অনেক টাকার মালিক, চুরি করার তার আর দরকার করে না। কিন্তু মুশকিল হলো, রোজি তো আসলে টাকার লোভে চুরি করে না। এই কাজে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা আছে, সেটাই উপভোগ করে সে। ইউনাকোয় ফিল্ড অফিসার হিসেবে তার যে ভূমিকা, আগের চেয়ে আরও নিরাপদে হীরে চুরি করতে পারে সে। এবং যদি চায়, কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। নিজেকে শোধরাবে, সেজন্যে সময় দরকার রোজির। সোহানা তাকে ইচ্ছে করেই শক্ত করে না বেঁধে একটু ঢিল দিয়ে রেখেছে, দেখতে চায়, চুরির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লোভ সামলাতে পারে কিনা। সেজন্যেই রোজিকে পার্ট টাইম এজেন্ট হিসেবে রাখা হয়েছে। মাত্র তেইশ বছর বয়স তার, সোহানা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, সম্মানজনক জীবন শুরুর সময় এখনও পেরিয়ে যায়নি তার।

মানামার একটা পাঁচ তারা হোটেলের 'ফয়ে'-য় বসে আছে রোজি কারভার। পনেরো মিনিটও হয়নি এখানে এসেছে সে, এরই মধ্যে হীরে বসানো আঙটি আর শার্টের বোতাম দেখে দ্রুত একটা হিসেব করে ফেলেছে–শুধু এই হোটেলেই এক লাখ ডলারের হীরে আছে। বাহরাইনের বেশিরভাগ হীরে কি তাহলে পুরুষরাই ব্যবহার করে? চৌর্যবৃত্তি ছেড়ে দিলেও, মনে মনে প্ল্যান করলে তো আর দোষের কিছু নেই। তার অনুমান, বাহরাইনের শেখের প্রাসাদেই আছে সবচেয়ে বেশি হীরে। নিরাপত্তা রক্ষীদের বেষ্টনী ভেদ করে কিভাবে প্রাসাদে ঢোকা যায় তার প্ল্যানটা প্রায় তৈরি করে ফেলেছে সে, এই সময় বাধা পড়ল। দেখল এয়ারফোর্স ওয়ানের নতুন সিকিউরিটি চীফ মাসুদ রানা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

কৌতুক ও কৌতূহল বোধ করল রোজি। রানাও ইউনাকোর একজন তালিকাভুক্ত এজেন্ট, কিন্তু নিজের পরিচয় জানানো চলবে না ওকে। সাবরিনা আর্চার ব্রিফ করার সময় রানা সম্পর্কে এমন সব তথ্য ও ঘটনার কথা জানিয়েছে, সাংঘাতিক কৌতূহলী হয়ে আছে রোজি। কিন্তু রিভলভিং দরজার কাছ থেকে যতই কাছে এগিয়ে এল রানা, কৌতুক আর কৌতূহলের বদলে বিস্ময় আর উত্তেজনা বোধ করতে শুরু করল সে। ফটো দেখেছে ঠিকই, ঠিক সেটা দেখে বুঝতে পারেনি মাসুদ রানা এই রকম সুদর্শন, সুঠাম শরীরের অধিকারী। সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করল চোখ দুটো। কি অদ্ভুত মায়া, কি গভীর দৃষ্টি। রোজি অনুভব করল, তার বুকের ভেতর হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে, ঘামতে

শুরু করেছে হাতের তালু।

ফোয়া-য় ঢুকে রিসেপশনের দিকে এগোচ্ছিল রানা, রোজি কারভারকে দেখে এদিকে এগিয়ে এল। এয়ারম্যান ফার্স্ট ক্লাস-এর ইউনিফর্ম পরে রয়েছে মেয়েটা। কাছাকাছি এসে, হাঁটার গতি মন্থর হয়ে এল রানার। রূপ তো নয়, যেন আগুন!

উঠে দাঁড়াল রোজি।

'তুমি বোধহয় লিজার বদলি, তাই না?' জানতে চাইল রানা। রেডিওতে জানানো হয়েছে রানাকে, শেষ মুহূর্তে একজন ফ্লাইট ট্রাফিক স্পেশ্যালিস্ট অসুস্থতার কারণে এয়ারফোর্স ওয়ানে চড়েনি, তার বদলে রোজি কারভার নামে একটা মেয়ে বাহরাইনে তোমার কাছে রিপোর্ট করবে।

সিভিল এয়ার লাইনের ভাষায় ফ্লাইট ট্রাফিক স্পেশ্যালিস্টকে স্টুয়ার্ডেস বলা হয়। বাহরাইনে খালি বোয়িং নিয়ে আসার সময় মাত্র একজন স্টুয়ার্ডেস ছিল, ম্যানেজ করে নিতে অসুবিধে হয়নি বিগ হার্ভের। কিন্তু ফিরতি পথে দু'জন লাগবে। প্রেসিডেন্টের জেটের বেলায় নিয়ম হলো, নতুন ক্রুকে প্রথমেই রিপোর্ট করতে হবে সিকিউরিটি চীফের কাছে।

স্যালুট করে পরিচয়-পত্রটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল রোজি। ইউনাকোর ডেপুটি ডিরেক্টর সোহানা চৌধুরী প্রথম পেন্টাগনের সাথে রেডিওতে কথা বলে। তাদের অনুমতি পাবার পর সাবরিনা আর্চারের হাত থেকে এই পরিচয়-পত্র পায় রোজি।

পরিচয়-পত্র ফিরিয়ে দিয়ে হাত বাড়াল রানা। হাতটা ধরল রোজি। শক্ত, আর কর্কশ লাগল রানার হাতের স্পর্শ। সমান চাপ দিতে গিয়েও নিজেকে ঠেকিয়ে রাখল রোজি। এই লোকের বন্ধু হতে চায় সে।

'ইয়েস, স্যার,' বলল, সে। 'রোজি কারভার। এয়ারফোর্স ওয়ানের কাছে রিপোর্ট করছি। আপনি মেজর মাসুদ রানা, স্যার?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তোমাকে রোজি বলে ডাকতে পারব তো?'

'অফ ডিউটির সময়, স্যার।'

মৃদু হাসল রানা। 'স্যারটা বাদ দেয়া যায় না? বিশেষ করে অফ ডিউটির সময়ে?'

তারপর দু'জনেই হেসে উঠল।

সোফায় বসল ওরা। এয়ারফোর্স ওয়ানের শিডিউল জানতে চাইল রোজি। বাহরাইনে সব জিনিস পাওয়া যাবে না, বলল রানা, তাই জেনেভায় পৌঁছে স্টোর ভরবে ওরা। ওখান থেকে ফুয়েলও নেয়া হবে। রাতটা সুইটজারল্যান্ডে থাকবে ওরা। মানামা থেকে এয়ারফোর্স ওয়ান টেক-অফ করবে, ঘড়ি দেখল ও, চার ঘণ্টা পর।

'তুমি কি এই হোটেলেই উঠেছ?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, আর সবাইও তাই উঠেছে,' বলল রোজি। নিজের কামরায় রানাকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার, কিন্তু এখুনি এ ধরনের প্রস্তাব দেয়া ভদ্রতা-বিরোধী হয়ে যাবে মনে করে অনেক কষ্টে লোভ সংবরণ করল।

এক মিনিট পর সোফা ছেড়ে দাঁড়াল রানা। কেন যেন হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠল রোজি, ফস্ করে বলে বসল, 'আজ রাতে আমি একটা ডিনার পার্টি দিচ্ছি, স্যার। আপনি আসবেন?'

'ডিনার পার্টি?'

'জ্বী, স্যার।'

'এত স্যার স্যার করছ কেন?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

'ডিনারে তাহলে আপনাকে পাব?' রোজি নাছোড়বান্দা।

'আর কে কে থাকছে?'

'কারভার, মাসুদ, রোজি, রানা, আমি, আপনি···আর আমরা দু'জন।'

হেসে ফেলল রানা। বলল, 'ঠিক আছে।'

রানার চলে যাওয়াটা রোজি একা নয়, ফয়ে-র আরেক প্রান্ত থেকে আরেকজন লোক খুঁটিয়ে লক্ষ করল। ছোট একটা নোটবুক বের করে কি যেন লিখল সে।

এয়ারফোর্স ওয়ানের চীফ স্টুয়ার্ড মাস্টার সার্জেন্ট পিটি ফবের নিজের পরিচয় দিয়ে রোজির কাছে একটা মেসেজ পাঠাল।–ক্রুদের সবাইকে হোটেলের লবিতে জড়ো হতে বলেছেন কমান্ডার বিগ হার্ভে।

এলিভেটর থেকে নেমেই লবির একধারে গ্রুপটাকে দেখতে পেল রোজি, কিন্তু তাদের মধ্যে রানা নেই দেখে অকারণেই খারাপ হয়ে গেল মনটা। কর্নেল বিগ হার্ভেকে স্যালুট করল সে, নিজের পরিচয় জানাল। সবার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিল বিগ হার্ভে। রোজি লক্ষ করল, আলাপ থামিয়ে সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। একজন আরেকজনের পাঁজরে কনুইয়ের মৃদু গুঁতো দিয়ে ফিসফিসে গলায় কি যেন বলছে, সম্ভবত তার রূপের প্রশংসা হচ্ছে।

'আমাদের সাথে সময়টা তোমার ভালই কাটবে, রোজি,' কমান্ডার কৌতুকের সুরে বলল। 'তুমি যদি মজা না-ও পাও, ক্রুরা নিজেদের বঞ্চিত করবে না, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।'

হেসে উঠল সবাই।

'আকাশে থাকার সময় সাথে আকাশ-পরী থাকলে ভাল লাগে, এই আর কি!' ফোড়ন কাটল লে. কর্নেল পল।

চেহারায় হাসি ফুটল রোজির, কিন্তু লে. কর্নেলের দিকে তাকাল না সে, কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের সিকিউরিটি চীফ কোথায়, জানেন?'

'শুনলে তো!' কমান্ডার কিছু বলার আগেই কবি কবি চেহারার মেজর প্যাট্রিক হল হতাশ সুরে বলল। 'কারও কোন আশা নেই। আমাদের টপ হিরো এরই মধ্যে আকাশ-পরীর কোমল হৃদয়ে তুফান তুলে বসে আছে···'

'হয়েছে,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বলল কমান্ডার। 'শুরুতেই ওকে নিয়ে কাড়াকাড়ি কোরো না তো।' রোজির দিকে ফিরল সে। 'এজেন্ট গডলিম্যানকে নিয়ে বেরিয়েছে রানা। এয়ারপোর্টে যাবার সময় ওপেক মন্ত্রীরা যে রাস্তাগুলো ব্যবহার করবেন, চেক করবে ও। ফিরতে দেরি হবে ওর। ওখান থেকে যাবে

বোয়িঙে। চেক, ডাবল চেক, তারপর রি-চেক করবে প্লেন, পুলিস, এয়ারপোর্ট গার্ড, লাগেজ হোল্ড, এমন কি রানওয়েতে কোথাও ফাটল আছে কিনা তাও খুঁটিয়ে না দেখে ছাড়বে না। যা দেখলাম, যেটা করে নিখুঁত ভাবে করে মানুষটা। আমার ক্রুদের সম্পর্কেও এই কথাটা বলতে পারলে সুখী হতাম।'

রোজি লক্ষ করল, ক্রুদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কমান্ডারের, সেজন্যেই কারও মধ্যে সন্ত্রস্ত কোন ভাব নেই, সবাই বেশ হাসিখুশি আর সহজ। খানিক পর আবার কাজের কথায় ফিরে গেল ব্রিগ হার্ভে। তার প্রশ্নের উত্তরে সার্জেন্ট ফবের জানাল, অতিথি মন্ত্রীদের কি দরকার হবে না হবে তার একটা তালিকা হোয়াইট হাউস থেকে দেয়া হয়েছে তাকে। অতিরিক্ত আরও একটা তালিকা খানিক আগে তার হাতে এসে পৌচেছে প্রাসাদ থেকে। বেশিরভাগ কেনাকাটাই শেষ, কিছু যা বাকি আছে তা হোটেল আর মানামার বাজার থেকে আনানো হবে। এখানে সব জিনিস পাওয়া যাবে না, কাজেই জেনেভায় পৌছেও মার্কেটিং করতে হবে।

'হাতে আর আমাদের সময় আছে মাত্র এক ঘণ্টা,' কমান্ডার জানাল। 'কেবিন পারসনেলরা সিক্সটিন আওয়ারে চড়বে বোয়িঙে। ফ্লাইং ক্রু আর অপারেটররা চড়বে সিক্সটিন ফিফটিতে। রিপোর্টিং টাইমের আধ ঘণ্টা আগে এই হোটেলের বাইরে মিনিবাস পাবে সবাই। বোয়িঙের চাকা ঘুরবে আঠারো ঘণ্টা পাঁচ মিনিটে।'

নিজের স্টাফ নিয়ে চলে গেল সার্জেন্ট ফবের। তারপর একে একে বিদায় নিল ফ্লাইং ক্রুরা। রোজিকে এক কোণে ডেকে নিয়ে এল কমান্ডার বিগ হার্ভে। নতুন ক্রু রোজি, এয়ারফোর্স ওয়ান সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানাবার দায়িত্ব কমান্ডারেরই। সবশেষে তাকে এই অ্যাসাইনমেন্টের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বোঝাল সে।

'ব্যাপারটাকে আনন্দ ভ্রমণ হিসেবে নেয়া উচিত হবে না,' বলল বিগ হার্ভে। 'এয়ারফোর্স ওয়ান ব্যবহার করার অনেক কারণের মধ্যে একটা হলো, আমাদের নিজেদের এনার্জি সেক্রেটারি মি. ম্যালকম ফিলপট বাহরাইন থেকে ওয়াশিংটন ফিরছেন। তবে আসল কারণ হলো, ওপেক মন্ত্রীদের খুশি করতে চাই আমরা। এই কথাটা তোমার ভুললে চলবে না।'

'আপনি আরও একটু ব্যাখ্যা করুন, কমান্ডার, প্লীজ।'

'তেল নিয়ে যে তেলেসমাতি কাণ্ড সারা দুনিয়া জুড়ে চলছে, আমি আশাকরি, এসব ব্যাপারে তুমিও কিছু কিছু জানো,' বলল বিগ হার্ভে। 'এই যে আলোচনাটা চলছে এটা যদি সফল না হয়, গ্রহণযোগ্য একটা চুক্তিতে যদি না আসা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-কারখানাগুলো প্রোডাকশন কমিয়ে দিতে বাধ্য হবে, ফলে আমরা গাড়ি ছেড়ে সাইকেল চালাতে বাধ্য হব। ইলেকট্রিকের বদলে জ্বালব মোমবাতি। এই বিপর্যয় এড়াতে হলে, ওপেকের সাথে আমাদের একটা চুক্তি হতেই হবে। কাজেই, এই ট্রিপে কোন রকম খুঁত থাকা চলবে না, কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটা চলবে না। তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে, রোজি। কোমল, নিপুণ আচরণ করবে তুমি। একজন স্টুয়ার্ডেসের ব্যবহার অনেক সময়

গোটা দুনিয়ার চেহারা বদলে দিতে পারে–একটুও বাড়িয়ে বলছি না। কিছু যদি মনে না করো, একটা মন্তব্য করব?'

মৃদু হেসে অনুমতি দিল রোজি।

'তুমি সুন্দরী–তোমার এই কাজে সেটা উপরি সুবিধে এনে দেবে।'

একটু লালচে হলো রোজি, কিন্তু প্রতিবাদ করে কিছু বলল না। কমান্ডার তো আর মিথ্যে কথা বলেনি!

কানে টেলিফোন রিসিভার নিয়ে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছে অ্যালেক্স রাসকিন। 'রাশান ভাষা আপনি বোঝেন না?' ধমক লাগাল সে। 'আমি বলছি, এটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে পারকিনকে। হ্যাঁ, সম্ভব হলে এখুনি।...ওসব ধানাইপানাই আমি শুনতে চাই না। যেভাবে পারেন, তাকে খবর দিন। আমার কথা এবার বুঝতে পেরেছেন, ড. কোচ?' কথা শেষ করে আড়চোখে জেনারেল কামচিনের দিকে একবার তাকাল রাসকিন। সামনে জনি ওয়াকারের বোতল নিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে কামচিন, হাতে একটা গ্লাস। অ্যাপার্টমেন্টে তার উপস্থিতি রাসকিনের জন্যে মহা অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার।

'আমি আপনার কথা প্রথমবারই বুঝেছি, মি. রাসকিন,' অপরপ্রান্ত থেকে বলল ডাক্তার কোচ। 'প্লীজ, আমার কথাটাও আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। বোয়িং রওনা হতে আর বেশি দেরি নেই। এই মুহূর্তে পারকিন ভীষণ ব্যস্ত। তার ওপর, বেচারার ঘাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ উপদেশ আর ধমক দিচ্ছে কবির চৌধুরী, তার সাথে তাল মেলাচ্ছে মেনিলথিন। এখন আপনিই বলুন, কিভাবে আমি তার সাথে যোগাযোগ করি।'

'করতেই হবে!' হুঙ্কার ছাড়ল পারকিন। 'কিভাবে করবেন, সেটা আপনি জানেন। এবং আমি বেশি দেরি সহ্য করব না!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখি কি করতে পারি আমি,' বলল ডাক্তার। রাসকিন এত হম্বিতম্বি কেন করছে, অনুমান করতে অসুবিধে হয়নি তার। কামচিনকে নিজের ক্ষমতা দেখাচ্ছে রাসকিন। পারকিনের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়, প্রথমে এ-কথা বলে, তারপর যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি জানিয়ে, রাসকিনকে কামচিনের কাছে বড় হবার সুযোগ করে দিল ডাক্তার। ভবিষ্যতেও রাসকিনের সাথে কাজ করতে হবে তাকে, সাহায্য করলে লাভ বৈ লোকসান নেই। 'ওর সাথে যোগাযোগ করার একটা রাস্তা আছে বটে, দেখি সেটা ব্যবহার করা যায় কিনা।'

'তাড়াতাড়ি,' কঠিন সুরে বলল রাসকিন। 'পারকিনকে নতুন নির্দেশ দিতে হবে। অপারেশনের গোটা চেহারা বদলে যাবে তাতে। মস্কো থেকে হটলাইনে নির্দেশ এসেছে, ড. কোচ, অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।' এগিয়ে এসে ক্রাডলের সামনে দাঁড়াল সে, খটাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল। তারপর বিজয়ীর চেহারা নিয়ে ফিরল কামচিনের দিকে। 'ডাক্তার ব্যাটাকে ভয় না দেখালে কাজ হয় না।'

হাসল না, মন্তব্য করল না, এমন কি রাসকিনের দিকে ফিরেও তাকাল না

কামচিন।

ডাক্তারের মেসেজ পাবার পর ঘাড়ের ওপর থেকে মেনিলথিনকে সরাতে আধঘণ্টা লেগে গেল পারকিনের। টেলিফোনে কামচিনের ঠাণ্ডা হিম কণ্ঠস্বর শুনে তার শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা ঢেউ নেমে এল। প্রথমে রাশিয়ান ভাষায় কথা বলল কামচিন। তারপর, পারকিনের যাতে বুঝতে ভুল না হয়, সব আবার ইংরেজিতে বলল সে।

'সংক্ষেপে কবির চৌধুরীর ব্যাপারটা এই রকম। তার টাকা দরকার। তাই এয়ারফোর্স ওয়ানের ওপর নজর পড়েছে। ওটা এখন বাহরাইনে। ওপেকের কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে ওয়াশিংটনে যাবে। বোয়িং বা মন্ত্রীদের নিয়ে কি করবে কবির চৌধুরী, ওপেন লাইনে সেটা আর বললাম না।'

পারকিন উত্তরে জানাল, 'আমি বুঝতে পেরেছি।' রিসিভারটা ঘামে ভেজা দুই হাত দিয়ে কানের সাথে চেপে ধরে আছে সে।

'কবির চৌধুরীর এই প্ল্যান একটা পর্যায় পর্যন্ত সন্তোষজনক,' বলে চলল কামচিন, 'কিন্তু এই ব্যাপারটা থেকে আমাদের নিজেদের স্বার্থ আদায় করতে হলে, তার এই প্ল্যানের ভেতর আরেকটু নিষ্ঠুরতা থাকতে হবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'না…মানে, আমি ঠিক…'

'বুঝতে পারছি, আরও পরিষ্কার করে বলতে হবে,' পারকিনকে বাধা দিল কামচিন। 'আমরা চাই, যুক্তরাষ্ট্র যেন খুব ফাঁপরে পড়ে। তার যেন ক্ষতি হয়, খুব বেশি ক্ষতি হয়। যতটা কল্পনা করতে পারো, ততটা ক্ষতি। যাতে, তার ওপর খেপে যায় ওপেক। এবার বুঝতে পেরেছ? এমন নিষ্ঠুরতা দেখাবে তুমি, ওপেকের সবাই যেন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আক্রোশে ফুঁসতে থাকে। এর ফলে ওদের মধ্যে তেল-চুক্তি হবে না। সেটা তো চাই-ই আমরা, আরও চাই—ওপেক দেশগুলো যেন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সব সম্পর্ক ছেদ করে। কি, আরও ব্যাখ্যা করতে হবে?'

অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইল পারকিন, 'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে…না, তা কি করে হয়!'

'হয়। আর আমি ঠিক তাই বলতেও চাইছি। তোমার বোঝার সুবিধের জন্যে এখন আমি কোন রাখঢাক করছি না। মনে গেঁথে নাও কথাটা। ওপেক মন্ত্রীদের খুন করবে তুমি, কোন সাক্ষীকেও বাঁচিয়ে রাখবে না। তার মানে, এয়ারফোর্স ওয়ানের ক্রুদেরও মারতে হবে তোমার। শুধু একজনের ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। আসল মাসুদ রানাকে আমরা সামলাব।'

অপর প্রান্তে চুপ করে থাকল পারকিন। ব্যাপারটা হজম করার জন্যে তাকে কিছুটা সময় দিল কামচিন।

তারপর আবার বলল, 'কাজটা তুমি কিভাবে করবে, সেটা তোমার ব্যাপার, পারকিন। কিন্তু এতে তোমার ব্যর্থ হওয়া চলবে না। যাই ঘটুক, এই নির্দেশ তোমাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। শুধু তুমি একা বেঁচে থাকো, তাও আমরা মেনে নেব। সবার সাথে তুমি নিজেও যদি মারা পড়ো,

তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। তবে, আমরা চাইব, তুমি বেঁচে থাকো। রাখি।'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে রিসিভার রেখে দিল কামচিন। রাসকিনের হাত থেকে আরেক গ্লাস জনি ওয়াকার নিল সে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে সেটার দিকে ঝাড়া পনেরো সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল পারকিন। মুখের চেহারা ফ্যাকাসে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

এলিভেটর থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামল পারকিন, ছুটে এসে তার একটা হাত চেপে ধরল মেস্মিলথিন। 'ইউনিফর্ম পরো, জলদি! পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি আমরা। আহমেদ কায়াম রিপোর্ট করেছে!'

গডলিম্যানকে পিছনে নিয়ে এয়ারফোর্স ওয়ান থেকে নেমে এল রানা। সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউনিফর্ম পরা একদল বাহরাইনী পুলিস অফিসার। সবাই সশস্ত্র। হার্ডস্ট্যান্ডে একটা দাগ দেখে থামল রানা, জুতোর ডগা ঘষল সেটার ওপর।

দেঁতো হাসি হেসে গডলিম্যান ফিসফিস করে বলল, 'ওটা কোন ফাটল নয়, রানা। আর যদি হয়ও, রানওয়েতে তো নয়।'

এরপর পুলিস অফিসারদের সাথে পরিচিত হলো রানা। বাহরাইনী পুলিস বিভাগ কিছুক্ষণের জন্যে তার অফিসারদের রানার অধীনে ছেড়ে দিয়েছে, এয়ারফোর্স ওয়ান বাহরাইনে থাকতে যদি কোন অঘটন ঘটে, কেউ অন্তত তাদেরকে দুষতে পারবে না।

অফিসারদের প্রত্যেককে সিকিউরিটি শিডিউলের একটা করে কপি দিল রানা, তারপর গডলিম্যানকে নিয়ে এগোল টার্মিন্যাল ভবনের দিকে। টার্মিন্যাল ভবনের একটা জানালা থেকে ওদের ওপর নজর রাখছিল একজন আরব, ওদেরকে এদিকে আসতে দেখে চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে টয়লেটে গিয়ে ঢুকল সে।

টার্মিন্যালের ছাদে, প্যারাপেটের তিন জায়গায় পজিশন নিয়েছে তিনজন মেশিন-গানার। 'ওদের সাথে কথা বলে এসো, গডলিম্যান। এয়ারফোর্স ওয়ানের পঞ্চাশ গজের মধ্যে আন অথোরাইজড কাউকে দেখলেই গুলি করে মারতে হবে। প্রোগ্রামের কপিও দিয়ে এসো। কনভয় নিয়ে যখন আসব, ওদের গুলি খেয়ে মরতে চাই না আমি।'

'তুমি কি এখন...?'

'হোটেলে ফিরে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'শাওয়ার সেরে এনার্জি সেক্রেটারির সাথে আরেকবার কথা বলতে হবে। তোমার কোন প্রশ্ন আছে?'

'না।'

টার্মিন্যাল ভবন থেকে বেরিয়ে এল রানা। সামনে একজন আরব লোক রয়েছে, ওর আগে আগে হাঁটছে, কিন্তু তাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ করল না ও। লোকটার গলার সাথে বুকের ওপর ঝুলছে একটা বিনকিউলার।

এয়ারপোর্টের সামনেটা সতর্কতার সাথে দেখে নিল রানা। বাহরাইনী পুলিস পজিশন নিতে শুরু করেছে চারদিকে। দু'ধারের ফুটপাথের ওপর হাত ধরাধরি করে দাঁড়াচ্ছে তারা, হিউম্যান ব্যারিকেড রচনা করছে। রানা যখন এসব দেখছে, আরব লোকটা, যার নাম আহমেদ কায়াম, একটা আঙুল নেড়ে কি একটা ইঙ্গিত দিল।

একদল ড্রাইভার এক জায়গায় জড়ো হয়ে গল্প-গুজব করছিল, তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে স্ট্যান্ডের প্রথম ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

ডাকার ভঙ্গিতে রানা হাত তুলতেই ছুটে এল ট্যাক্সিটা, ঘ্যাঁচ করে দাঁড়াল ওর পায়ের কাছ থেকে ছ'ইঞ্চি দূরে। দরজা খুলে উঠে বসল রানা। নিজের হোটেলের নাম বলল। দ্রুত একটা ইউ টার্ন নিয়ে মেইন রোডে উঠে এল ট্যাক্সি। ডান দিকে একটা গলি পড়ল, সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগোবার সময় আড়চোখে তাকাল ড্রাইভার। গলির একটু ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো একটা ক্যাডিলাক। দেখল, আহমেদ কায়াম তাড়াহুড়ো করে উঠছে তাতে।

সীটে বসেই বাহরাইন আর জেনেভার সিকিউরিটি শিডিউলে মনোযোগ দিল রানা। কালো ক্যাডিলাককে যদি দেখেও থাকে, মনে কোন সন্দেহের উদয় হয়নি। বাহরাইন আর উপসাগরীয় দেশগুলোয় ক্যাডিলাকের ছড়াছড়ি, অবাক হবার কিছু নেই।

চোরা চোখে রিয়ার-ভিউ মিররে তাকাচ্ছে ড্রাইভার, রানাকে দেখে ভাব-সাব বোঝার চেষ্টা করছে।

বাহরাইনের প্রধান দ্বীপের সাথে মুহারাক এয়ারপোর্টের যোগাযোগ রাখছে একটা কজওয়ে। চোখ তুলে সামনে রোদ ঝলমলে রাস্তার বিস্তার আর দু'পাশে শান্ত, নির্জন পানি দেখে নিয়ে আবার কাগজ-পত্রে মন দিল রানা।

হাইওয়েতে এসে পড়ল ট্যাক্সি। রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রেখে এক হাত দিয়ে পায়ের কাছ থেকে একটা এ্যারোসল স্প্রের বোতল তুলে নিল ড্রাইভার।

মুখ তুলল রানা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরা অবস্থায় সীটের ওপর ঘুরে গেল ড্রাইভার, আরেক হাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। ফিরছে রানা, ইতোমধ্যে রিভলভারের জন্যে হাত ঢোকাতে শুরু করেছে পকেটে। দম আটকে রেখেছে ড্রাইভার, বোতাম টিপে রানার একেবারে মুখের ওপর গ্যাস স্প্রে করল সে।

সীটের ওপর সোজা হয়ে বসল ড্রাইভার। রানার কি অবস্থা হলো দেখার জন্যে অপেক্ষা পর্যন্ত করল না। হাইওয়ে থেকে নেমে একটা সাইড রোডে ঢুকল ট্যাক্সি। ঠিক একেবারে পিছনে চলে এসেছে ক্যাডিলাক।

সীটের ওপর এলিয়ে পড়ল রানা, রিভলভার পর্যন্ত পৌঁছল না হাত। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

গলি থেকে বেরিয়ে এসে মরুভূমির প্রান্তে থামল ট্যাক্সি, পাশে এসে দাঁড়াল ক্যাডিলাক। ড্রাইভারকে একটা জায়গার নাম বলল আহমেদ কায়াম। আবার ছুটল ট্যাক্সি। মরু-পথ ধরে তাকে অনুসরণ করে এগোল ক্যাডিলাক।

পাঁচ মিনিট পর একটা মরুদ্যানে এসে থামল গাড়ি দুটো। মাটি আর পাম

গাছের পাতা দিয়ে তৈরি কয়েকটা ঘর রয়েছে এখানে। ফাঁকা, নির্জন পরিবেশ। ট্যাক্সির দরজা খুলে অজ্ঞান শরীরটা টেনে-হিঁচড়ে বাইরে বের করে নিয়ে এল আহমেদ। একটা ঘর থেকে অলস ভঙ্গিতে বেরিয়ে এসে খুঁটিয়ে দেখল রানাকে মেনিলথিন, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ঘরের দিকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল আরেক মাসুদ রানা। বারবার দু'জনকে দেখল মেনিলথিন, কোথাও কোন অমিল নেই।

মেনিলথিনের নির্দেশে রানার পকেট থেকে যা পাওয়া গেল সব বের করে বালিতে বিছানো একটা কাপড়ের ওপর রাখতে শুরু করল আহমেদ। এক এক করে গুনল মেনিলথিন—ওয়ালেট, রিভলভার, সিকিউরিটি শীল্ড, পরিচয়-পত্র, টাকা, কলম, রুমাল। কাপড়ের চারকোণা এক করে তুলে নিল সে, তারপর ধরিয়ে দিল পারকিনের হাতে। তৈরি করা ইউনিফর্ম আগেই পরে নিয়েছে পারকিন, সেটার পকেটে সব ভরে নিল সে।

'এখন ওকে ভেতরে নিয়ে যাও,' আহমেদকে বলল মেনিলথিন। 'তারপর জ্ঞান ফিরিয়ে আনো। আমার কিছু তথ্য দরকার, ও ছাড়া আর কারও জানা নেই সেগুলো।'

'জ্ঞান যদি ফেরে তবে তো!' হেসে উঠে বলল পারকিন।

'ফিরবে না মানে?' বিরক্ত দেখাল মেনিলথিনকে। 'অতটা গ্যাস দেয়া হয়নি যে মরে যাবে এখুনি।'

'কিন্তু তথ্যগুলো যদি না বলতে চায়?' আবার জিজ্ঞেস করল পারকিন।

কাঁধ ঝাঁকাল মেনিলথিন। 'মরতে তো ওকে হবেই,' বলল সে। 'সেটা সহজ হবে নাকি কঠিন, ওই বেছে নেবে।'

'ওর সম্পর্কে যা জেনেছি, কঠিন মৃত্যুই বেছে নেবে ও, এ আমি গ্যারান্টি দিয়েই বলতে পারি,' বলে ট্যাক্সিতে চড়ল পারকিন। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। হাইওয়ের দিকে ফিরে চলল সে।

ফুল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার, কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। আজেবাজে কেউ নয়, তার প্যাসেঞ্জার হলো এয়ারফোর্স ওয়ানের খোদ সিকিউরিটি চীফ।

পাঁচ

বোয়িং ইন্টারকন্টিনেন্টাল জেট এয়ারলাইনারের সাথে এয়ারফোর্স ওয়ানের আকার আকৃতির কোন অমিল নেই। একশো তিপ্পান্ন ফিট লম্বা, এক ডানার প্রান্ত থেকে আরেক ডানার প্রান্ত পর্যন্ত একশো পঁয়তাল্লিশ ফিট নয় ইঞ্চি চওড়া। চারটে ইঞ্জিন, প্র্যাট অ্যান্ড হুইটনি টারবোজেট—একশো পঞ্চাশ টনেরও বেশি ওজন নিয়ে টেক-অফের ক্ষমতা রাখে।

কোথাও না থেমে হাজার মাইলের বেশি উড়তে পারে এয়ারফোর্স ওয়ান,

ল্যান্ড করতে পারে পাঁচ হাজার ফিটেরও ছোট রানওয়েতে। চার হাজার ঘণ্টা ওড়ার অভিজ্ঞতা নেই যে পাইলটের, তাকে এর কন্ট্রোলে বসতে দেয়া হয় না।

এই বোয়িঙের ফ্লাইট-সিলিং রয়েছে চল্লিশ হাজার ফিটেরও বেশি, দশজনের কম ক্রু নিয়ে কখনও আকাশে চড়ে না। ঘণ্টায় পাঁচশো পঞ্চাশ মাইল গতিতে ওড়ে, এটাই একমাত্র বোয়িং যার নেভিগেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে একজন লে. কর্নেল। এয়ারফোর্স ওয়ানের ফ্লাইট ক্রুরা ব্লু ইউনিফর্ম পরে, স্টুয়ার্ড আর স্টুয়ার্ডেসরা পরে মেরুন রঙের ব্লেজার, সাথে নীল ট্রাউজার বা স্কার্ট, প্রতিটি ইউনিফর্মে আঁটা থাকে প্রেসিডেনশিয়াল সার্ভিস ব্যাজ।

অনেকটা বলতে গেলে ঘটনাচক্রেই, এয়ারফোর্স ওয়ানের ভেতরে কুটির শিল্পের বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে। ভেতরের সাজ-সজ্জা থেকে শুরু করে তৈজসপত্র পর্যন্ত সবই শুধু এই প্লেনের জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরি করে শিল্প মালিকরা ফার্স্ট সিটিজেনের পছন্দের জন্যে নমুনা দাখিল করে থাকে, যারটা নির্বাচিত হয় সে সংশ্লিষ্ট জিনিসটি বিনা পয়সায় উপহার হিসেবে দান করে কৃতার্থ বোধ করে। বলাই বাহুল্য, এই দুর্লভ সম্মান সব কোম্পানীর কপালে জোটে না। সমস্ত জিনিসে, যেমন, সিলভার অয়্যার, ক্রিস্টাল গ্লাস, ডিনার প্লেট, কাপ-পিরিচ, ছাইদানী, দিয়াশলাই থেকে শুরু করে ডিনার ন্যাপকিনেও প্রেসিডেনশিয়াল সীল মারা থাকে, স্যুভেনির শিকারীরা পঞ্চাশ বা একশো গুণ বেশি দাম দিয়ে কিনতে চায় এক একটা।

এই ট্রিপের জন্যে মেজে-ঘষে-ধুয়ে পালিশ করা হয়েছে এয়ারফোর্স ওয়ানকে, নতুন করে আরেকবার যত্ন নেয়া হয়েছে টায়ারগুলোর। মুহারাক এয়ারপোর্টে সগর্ব ভঙ্গিতে, হলুদাভ রোদে ভিজছে সে ঠায় দাঁড়িয়ে—রুপোর মত ঝলমল করছে তার সাদা শরীর। আজ আবার একদল আরোহী নিয়ে যাত্রা শুরু করবে সে, এবং ঐতিহ্য বজায় রেখে আরোহীদের কাছ থেকে কোন পয়সা নেবে না।

দুটো স্টারবোর্ড এঞ্জিন, তিন আর চার নম্বর, এরই মধ্যে চালু করা হয়েছে। বোয়িঙের দ্রুত স্টার্ট নিতে সুবিধে হবে তাতে, তাছাড়া এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেম আর অন্যান্য যন্ত্রপাতির জন্যেও পাওয়ার সাপ্লাই হবে। স্টোর, স্পেয়ার ইনভেন্টরি খুঁটিয়ে পরীক্ষা এবং অনুমোদন করা হয়েছে, ওপেক মন্ত্রীদের ব্যাগ-ব্যাগেজ আগেভাগেই পৌঁছে দেয়া হয়েছে লাগেজ হোল্ডে। ফ্লাইট ডেকে যে-যার আসনে এসে বসেছে ক্রুরা, প্লেন নিয়ে আকাশে ওঠার আগে প্রাথমিক প্রস্তুতি সারতে ব্যস্ত সবাই।

মাস্টার সার্জেন্ট পিটি ফবের অতিথিদের একটা প্রিন্ট আউট তালিকা এয়ারম্যান রোজি কারভারের হাতে ধরিয়ে দিল। 'পড়ো,' গম্ভীর সুরে বলল সে। 'এবং মুখস্থ করো। কারও চেহারা বা পরিচয় ভুললে চলবে না। কারণ এঁরা কেউ কারও চেয়ে কম নন—এক একজন আধুনিক মোগল সম্রাট। মনে রেখো, এই মন্ত্রী মহোদয়গণ ভিআইপি নন ইডিপি।'

বিমূঢ় দেখাল রোজিকে। 'কি বললেন? ইডিপি? মানে?'

'কি বললেন—"সার্জেন্ট"।'

'দুঃখিত,' তাড়াতাড়ি ভুলটা শুধরে নিল রোজি। 'কি বললেন, সার্জেন্ট?'

'ইডিপি। একসেপশন্যালি ডিসটিংগুইশড প্যাসেঞ্জার। সাবধান, চা-পানি ফেলে ওদের কারও মোজা বা কাপড় ভিজিয়ে দিয়ো না, ওরা কেউ অভিযোগ করলে তোমার হয়তো ফাঁসি হবে না; কিন্তু নিশ্চিতভাবে জেনো, এই প্লেনে ওঠার সুযোগ জীবনে আর দ্বিতীয়বার পাবে না।'

'ঠিক আছে, আমার মনে থাকবে, সার্জেন্ট,' বলল রোজি। ক্রুদের মধ্যে ফবেরই একমাত্র পুরুষ, লক্ষ করেছে সে, তার রূপ-যৌবন সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা কৌতূহল নেই। অথচ এয়ারফোর্স ওয়ানে এই লোকই তার বস্।

'তোমার সবচেয়ে বড় কাজ কি মনে আছে?' জানতে চাইল সার্জেন্ট ফবের। 'পানীয় পরিবেশন করা—ঠাণ্ডা, গরম।' রোজির পাশে দাঁড়ানো লাল চুলো স্টুয়ার্ডেস হেলেনের দিকে তাকাল সে। হেলেনের চোখে স্টীল রিমের চশমা, কোমরটা সরু, ইউনিফর্ম ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে বিশাল স্তন-যুগল, কিন্তু এসব দিকে নজর না দিয়ে তার চোখে তাকাল সার্জেন্ট। 'আর তোমার আসল কাজ কি, মনে আছে, হেলেন?'

'নাস্তা পরিবেশন করা,' হাসি চেপে বলল হেলেন।

'পরে আমি যদি বলি বা তোমরা যদি ভাল মনে করো, দায়িত্ব বদলাবদলি করতে পারবে,' বলল ফবের। 'কিন্তু তোমরা দু'জনেই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা জেনে রাখো। আমাদের এই সম্মানীয় মেহমানরা সবাই মুসলিম। মদ স্পর্শ করা এদের জন্য হারাম। কাজেই, ভুল করে পরিবেশন তো করবেই না, ওই জিনিসের নাম পর্যন্ত মুখে এনো না। তবে কেউ যদি ইঙ্গিতে ও-জিনিস চায়, গোপনে সবার অজান্তে তাকে সেটা সাপ্লাই দেয়ার দায়িত্বও তোমাদের। পরিষ্কার?'

দুই স্টুয়ার্ডেস একযোগে বলে উঠল, 'পরিষ্কার, সার্জেন্ট।'

বোয়িঙের খোলা হ্যাচ দিয়ে ভেতরে ঢুকল সাইরেনের শব্দ, প্রতি মুহূর্তে বাড়তে লাগল সেটা। রোজি অনুমান করল, মোটর শোভাযাত্রা বোধহয় কজওয়েতে পৌঁছে গেছে।

অদ্ভুত একটা উত্তেজনা বোধ করল রোজি। রোমাঞ্চ আর চ্যালেঞ্জ, এই দুটোর ওপর সেই ছোটবেলা থেকে দুর্দান্ত নেশা তার। কয়েকজন তেলমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এই বোয়িঙে চড়েছে সে, শেষ পর্যন্ত কি হবে কেউ বলতে পারে না, কিন্তু সব মিলিয়ে পরিবেশটা তার ভাল লাগছে। এঁরা কেউ সাধারণ লোক নন, দুনিয়ার সেরা ধনী কয়েকটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। মনে মনে আশা করল রোজি, এঁদের কারও কাছে এমন হীরের টুকরো থাকতে পারে, জীবনে যা দেখবে বলে আশা করেনি সে। হীরের প্রতি তার জন্মগত দুর্বলতা রয়েছে, দুর্লভ একটা হীরে নাই বা হাতে এল, শুধু দেখতে পেলেও অপরিসীম আনন্দ আছে।

তারপর সিকিউরিটি চীফের কথা মনে পড়তেই সারা শরীরে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। এই ট্রিপে রানার মত একজন সুদর্শন ব্যক্তির সান্নিধ্য পাওয়া,

সে-ও কম বড় ভাগ্যের কথা নয়। আবার তাকে দেখার জন্যে উতলা হয়ে উঠল রোজি।

বহু-ব্যবহারে কুকুরের নরম কান হয়ে গেছে কমপিউটর প্রিন্ট আউট। এই খানিক আগে কবির চৌধুরীর ফাইলে রাখা হয়েছে সেটা, খোলা ফাইলটা পড়ে রয়েছে ডেস্কের ওপর, সোহানার চোখের সামনে। আধ ঘণ্টার মধ্যে কম করেও পঁচিশবার সেটার ওপর চোখ বুলিয়েছে সে। আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'দুটো গেছে, বাকি এখন তিনটে।'

'ম্যাডাম?' প্রশ্ন করল রাশীদ সোনাইদি।

'কিছু না,' মুখ তুলে বলল সোহানা। 'অল সেট ফর বাহরাইন?'

'ইয়েস, ম্যাডাম।' মৃদু গলায় বলল রাশীদ। জানাল, ঠিক সময় মতই, আধ ঘণ্টার মধ্যে যাত্রা শুরু করবে এয়ারফোর্স ওয়ান। আর সব ক্রুর সাথে ইউনাকোর এজেন্ট রোজিও বোয়িঙে চড়েছে। প্লেনে সবার শেষে চড়বে মাসুদ রানা, ওপেক মন্ত্রীদের ডেলিভারি দেবার পর।

মুহূর্তের জন্যে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে কি যেন চিন্তা করল সোহানা। তারপর চোখ তুলে তাকাল তার সামনের দেয়ালে, যেখানে কয়েক ডজন ওয়াল-ক্লক ঝুলছে। প্রতিটি ঘড়ির ডায়ালে এক-একটা দেশের নাম লেখা রয়েছে, সে-দেশের স্থানীয় সময় নির্দেশ করছে কাঁটাগুলো। ডায়ালে বাহরাইন লেখা ঘড়ির দিকে তাকাল সে। সাথে সাথে পেটের ভেতর সড়সড় একটা অনুভূতি হলো। শেষবার সময় দেখার পর দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে! অথচ মনে হচ্ছে, দু'মিনিট আগে সময় দেখেছে সে।

অস্থির লাগছে সোহানার। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে পাশের চেয়ার থেকে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ল সাবরিনা আর্চার, সোহানার হাত ধরে অভয় দেয়ার ভঙ্গিত একটু চাপ দিল সে।

পাঁচটা ঘটনার কথা বলেছে ইউনাকো কমপিউটর, এগুলোর ওপর কবির চৌধুরীর নেক নজর পড়তে পারে। পাঁচটার মধ্যে দুটো ঘটনা ঘটে গেছে, কোন বিপদ হয়নি—না কবির চৌধুরীর তরফ থেকে, না আর কারও তরফ থেকে। ইউনাকোর একজন এজেন্ট মস্কো থেকে রিপোর্ট পাঠিয়েছে সোনার চালান নিরাপদেই পৌচেছে সেখানে। আরেকজন এজেন্ট কায়রো থেকে জানিয়েছে, ইসরায়েলের সাথে মিশরের প্রতিরক্ষা আলোচনা ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে।

এবার ঘটতে যাচ্ছে তিন নম্বর ঘটনা। ওপেক মন্ত্রীদের নিয়ে এয়ারফোর্স ওয়ান ওয়াশিংটন আসবে। আসতে পারবে তো? আসতে দেবে তো কবির চৌধুরী? প্রশ্নগুলো কুরে কুরে খাচ্ছে সোহানাকে। রানা রয়েছে ওই প্লেনে।

উদ্বেগ বোধ করছে সোহানা, এবং মন বলছে সেটা অকারণ নয়। হয়তো কিছুই ঘটবে না, কিন্তু কিছু একটা ঘটবে এ একরকম ধরেই নিয়েছে সে। কবির চৌধুরীকে জানা আছে ওর, তাকে একদম বিশ্বাস করতে পারছে না। মুশকিল হলো, এয়ারফোর্স ওয়ানকে মাটি থেকে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

কবির চৌধুরী বা তার লোক যদি বোয়িঙে উঠতে পারে, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কাজ সারা হয়ে যাবে তাদের। প্লেন আকাশে থাকার সময় কবির চৌধুরী দু'জন এজেন্টকে নিরস্ত্র করতে পারে, এমন কি খুনও করতে পারে। ব্যস, তাতেই তার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওদের দু'জনকে কাবু করতে পারলে এয়ারফোর্স ওয়ানকে হাইজ্যাক করা কোন সমস্যাই নয়। অথচ এখানে বসে কারও পক্ষে করার মত কিছুই থাকবে না। অসহায় বোধ করার সেটাই তার প্রধান কারণ।

বোয়িঙের যাত্রা চাক্ষুষ করার জন্যে চমৎকার একটা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সোহানার নির্দেশে কাজটা করেছে রাশীদ সোনাইদি। একটা যোগাযোগ উপগ্রহ থেকে পেন্টাগনকে সিগন্যাল দেওয়া হয়, সিগন্যালটা আসে বোয়িঙের ইনার্শিয়াল নেভিগেশন সিস্টেম থেকে যোগাযোগ উপগ্রহ হয়ে। অনেক খেটেখুটে আবিষ্কার করেছে রাশীদ, কোন্ ফ্রিকোয়েন্সিতে রিলে করা হয় সিগন্যালটা। এরপর ইউনাকোর কমপিউটরের সাহায্য নিয়ে কোড ভাঙা হয় সিগন্যালের, ওই কমপিউটরই সেটাকে অনুবাদ করে বিশাল ওয়াল ম্যাপে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলে।

এই মুহূর্তে ওটা পিনের একটা মাথার মতই ছোট, বাহরাইনের দ্বীপে জ্বলজ্বলে একটা তারা যেন দপ দপ করছে। কিন্তু প্লেনটা আকাশে উঠলেই ট্র্যাকার-বাগ সিগন্যাল উজ্জ্বল সবুজ সাপের মত ফুটে উঠবে মধ্যপ্রাচ্য, নিকট প্রাচ্য আর মেডিটেরেনিয়ানের ওপর—অনুসরণ করবে কমান্ডার বিগ হার্ভের নির্বাচিত কোর্স, তা সে যে পথ ধরেই বোয়িঙকে জেনেভায় নিয়ে যাক না কেন।

প্রেসিডেন্টের প্লেন আকাশে ওঠার পর, তার যা করার কথা তাই যদি করতে থাকে, যেখানে যাবার কথা তাই যদি যেতে থাকে, তাহলে সবুজ ট্র্যাকার লাইন ম্যাপের ওপর এগোতে থাকবে। কিন্তু বোয়িঙের যদি কিছু হয়, ম্যাপের ওপর থেকে ওই সাপ অদৃশ্য হয়ে যাবে।

সব যদি ঠিকঠাক মত চলে, এয়ারফোর্স ওয়ানের সঠিক পজিশন আর কোর্স প্রতি মুহূর্তে জানতে পারবে সোহানা। কিন্তু সব ঠিকঠাক মত চলবে কি? মন বলছে, না।

এবং কিছু যদি ঘটেই, দুশ্চিন্তায় ছটফট করা ছাড়া আর কি করার থাকবে তার?

'তুমি রেডি,' ফোনের রিসিভার থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর, 'নাকি দেরি আছে?'

হাতে ধরা রিসিভারের দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কৌডি পারকিন। কে কথা বলছে? কার গলা? চিনতে পারছি না কেন? কে হতে পারে? অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় করে এল মনে, কোনটারই উত্তর জানা নেই তার। নার্ভাস হয়ে পড়ল পারকিন। কি করবে সে এখন?

প্রথম পরীক্ষাটা এভাবে শুরু হবে, ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি পারকিন। রানার ঘনিষ্ঠদের কাউকে ওর সামনে হাজির করলে উতরে যাবার ষোলো আনা

সম্ভাবনা ছিল তার। ফোনে এই লোকটা কে কথা বলছে, জানার কোন উপায় নেই। তার চেহারা বা পোশাক কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। গলার সুর শুনে বোঝা যায়, রানার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেজন্যেই নিজের পরিচয় বা নাম বলেনি। বুকের ভেতরটা ধুক ধুক করছে—শুরুতেই ব্যাপারটা কেঁচে গেল নাকি?

রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের টেপ করা গলার আওয়াজ বারবার তাকে শুনিয়েছে মেনিলথিন, সেগুলো সব মনে রেখেছে পারকিন। হলপ করে বলতে পারে, এই লোকের কণ্ঠস্বর জীবনে এই প্রথম শুনছে সে।

সাহস হারালে চলবে না, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল পারকিন। অপেক্ষা করাই সবদিক থেকে ভাল এখন, ভাবল সে। নিজের পরিচয় সম্পর্কে লোকটা কোন সূত্র দিতে পারে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল, সামলাবার চেষ্টা করল সেটা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। টেলিফোন কল এলে কি করতে হবে বলে দিয়েছে মেনিলথিন, সেটা মনে পড়ে গেল। প্রথমে মুখ খোলার দরকার নেই, তাতে চিন্তা করার সময় পাওয়া যাবে। শেষ পর্যন্ত যদি লোকটাকে চেনার কোন উপায় না বেরোয়, রঙ নাম্বারের দোহাই দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখতে হবে।

তাই করতে যাচ্ছিল নকল রানা, অপরপ্রান্ত থেকে বাধা দিল লোকটা। জানতে চাইল, 'কি হলো, মেজর? কথা বলছ না কেন?'

মেজর! সম্বোধনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতাও রয়েছে। দ্রুত চিন্তা করছে পারকিন। বন্ধু, কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠ নয়। মিলিটারি বা এয়ারফোর্সের লোক হতে পারে। এয়ারফোর্স ওয়ানের ক্রুদের কেউ একজন? ফ্লাইট ক্রু কেউ হতে পারে না, ইঞ্জিনিয়ার নয়, টেকনিশিয়ান বা স্টুয়ার্ডও হতে পারে না। এরা কেউ সিকিউরিটি চীফকে তার বেডরুমে ফোন করে বিরক্ত করবে না। তাহলে?

রানার সাথে দরকার থাকতে পারে এই রকম লোক এয়ারফোর্স ওয়ানে মাত্র একজনই আছে। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার সিদ্ধান্ত নিল পারকিন। যা আছে কপালে, ঝুঁকিটা নিয়ে দেখা যাক। সমস্যাটাকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, এ থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করতে হবে।

'দুঃখিত, ব্যাসিল,' খুক করে একবার কেশে বলল পারকিন। 'আমি আরেক জগতে ছিলাম।'

অপরপ্রান্তে ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ব্যাসিল গডলিম্যান, 'আমার তো ভয়ই করছিল···যাক, মাটিতে যখন পা পড়েছে, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর বোধহয় পাব, কি বলো? তোমার হয়েছে?'

আবার চুপ করে থাকল পারকিন, এবার ইচ্ছে করেই। মুখ ঘামছে এখনও, তবে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করেছে সে। বিপদের প্রথম হামলাটাকে ঠেকিয়ে দিয়েছে সে। লোকটার পরিচয় জানা গেছে। কিন্তু ওদিকে সে-ও চুপ করে আছে কেন? কিছু সন্দেহ করেছে নাকি? আবার একটু নার্ভাস বোধ করল পারকিন। কিন্তু মুখ খুলল না।

আবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল গডলিম্যান। 'কি হলো, রানা? আমার সাথে কথা বলতে না চাইলে পরিষ্কার করে বলো সেটা! পানির আওয়াজ শুনে বুঝতে

পারছি, তুমি বাথরুমে রয়েছ। এখনও গোসলই হয়নি?'

'এই করব।'

'কথা বলার জন্যে ধন্যবাদ, চীফ,' বলল গডলিম্যান। 'আমি কি নিচে থেকে ওপরে উঠব, নাকি এখানে এই রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করব তোমার জন্যে?'

'চলে এসো,' বলল পারকিন। 'তবে পাঁচ মিনিট সময় দাও, তা না হলে দিগম্বর অবস্থায় পাবে আমাকে।'

খানিক ইতস্তত করে হঠাৎ সবজান্তার মত হেসে উঠল গডলিম্যান, 'বুঝেছি! তোমার সাথে কেউ আছে! পাঁচ মিনিট সময় চাইছ, আমি পৌঁছুবার আগেই যাতে তাকে বিদায় করে দিতে পারো, তাই না?'

'দূর মাথা খারাপ নাকি!' সহজ গলায় বলল পারকিন। 'যত সব উদ্ভট চিন্তা। পাঁচ মিনিট পর। কফি নিয়ে এসো।' রিসিভার নামিয়ে রেখে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম খুলে শাওয়ারের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। শুধু শরীর ভেজানো, একে গোসল বলে না। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে, পরিষ্কার আন্ডারপ্যান্ট পরে তোয়ালে জড়িয়ে নিল কোমরে। পিছনে একজন ওয়েটারকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল গডলিম্যান। ওয়েটারের ট্রলিতে শুধু কফি নয় স্যান্ডউইচও রয়েছে।

'তোমার কথামত,' সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট বলল, 'এয়ারপোর্ট গার্ডদের সাথে কথা বলেছি আমি।' হাত চালিয়ে কাপড় পরছে পারকিন। 'ওদের অফিসাররা বেশ চালাক-চতুর, কি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে সে-সম্পর্কে সচেতন। গার্ডরাও সতর্ক হয়ে আছে। ভাবসাব দেখে মনে হলো, গুলি করার অজুহাত খুঁজছে।' হঠাৎ হাসল গডলিম্যান। 'ভুল করে তোমাকে গুলি করবে, সে-ভয় নেই। কথা শুনে বোঝা গেল, তোমার প্রতিটি অণু-পরমাণু ওদের নখদর্পণে। কিভাবে জানি না, ওদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছ তুমি। ওপেক মন্ত্রীরা তাদের সিকিউরিটি চীফ হিসেবে তোমাকে বেছে নিয়েছেন, খবরের কাগজে সেটা নাকি বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। ওরা দেখলাম তোমাকে নিয়ে গর্বিত।'

'খুশি হতে পারলাম না,' সোফায় বসে একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিল পারকিন। 'আমার ব্যাপারটা গোপন থাকা উচিত ছিল।'

'ওদেরকে সে-কথাই বলে এসেছি—মাসুদ রানা প্রচার পছন্দ করে না।'

'সব তাহলে ঠিক আছে?' প্রশ্ন করল পারকিন।

'ওরা বলেছে, এয়ারফোর্স ওয়ানের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না কেউ। বাইরে পুলিস অফিসারদের সাথেও কথা বলেছি আমি। উঁচু কোন বিল্ডিং বা ফুটপাথে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা স্নাইপারদের ঠেকাবার জন্যে যথেষ্ট সতর্কতা নিয়েছে ওরা।'

'ভিড়ের মধ্যে থেকে কিছু ঘটবে, সে-ভয় আমি করছি না,' বলল পারকিন। কফির কাপে চুমুক দিল সে। 'স্নাইপাররাও সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হয় না। আসলে, আমি ভয় পাচ্ছি ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্সকে। তারা

একদল কমান্ডো পাঠিয়ে এয়ারফোর্স ওয়ানের ওপর হামলা চালাতে পারে, তারপর হয়তো দোষটা চাপাবে পি এল ও-র ওপর।'

'এবার তোমাকে চেনা যাচ্ছে, মেজর মাসুদ রানা,' হেসে উঠে বলল গডলিম্যান। 'একটুও বদলাওনি তুমি। সেই আগের মতই সতর্ক আর সাবধান।'

'তোমার কোন প্রশ্ন আছে, কিংবা আমাকে কিছু জানাতে চাও?' জিজ্ঞেস করল পারকিন। 'সিকিউরিটির ব্যাপারে কোথাও কোন ত্রুটি রয়ে গেছে বলে মনে করো?'

'না, সব ঠিক আছে,' বলল গডলিম্যান। 'আমার বিশ্বাস, বাহরাইনে থাকতে কিছু ঘটবে না। কিন্তু জেনেভায় কি হবে না হবে বলা কঠিন।' কথা শেষ করে মুচকি একটু হাসল সে।

'হুঁ।'

'বিশেষ করে এয়ারফোর্স ওয়ানকে পাহারা দেবার জন্যে তোমাকে তো আমরা ওখানে সব সময়ের জন্যে পাচ্ছি না।'

'মানে?' কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল পারকিন।

'খবর ছুটে গেছে, মেজর রানা,' আবার মুচকি হাসল গডলিম্যান। 'জেনেভায় আজ রাতে আমাদের একজন সুন্দরী স্টুয়ার্ডেসের সাথে ডিনার খাচ্ছ তুমি।'

তাই নাকি? মুখের ভেতর প্রশ্নটাকে ঠেকাবার জন্যে আরেকটু হলে জিভে কামড় দিয়ে ফেলছিল পারকিন।

উদার হস্তের চড়-চাপড় আর পানির ছিটা খেয়ে জ্ঞান ফিরে এল রানার। কুঁড়েঘরের মাটির মেঝেতে বিবস্ত্র শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। মুখের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে আহমেদ কায়াম। মাথাটা একবার এপাশ-ওপাশ করল রানা, চোখ দুটো সামান্য একটু ফাঁক হলো। তাই দেখে মেনিলথিনকে ডাকল আহমেদ।

ঘরে ঢুকে আহমেদের পাশে দাঁড়াল মেনিলথিন, রক্তাক্ত রানাকে দেখে কৃত্রিম সমবেদনার সুরে বলল, 'আহা-হা, কেউ কাউকে এমন করে মারে?'

আহমেদের আরেক পাশে দাঁড়াল রোগা-পটকা সায়েদ। খিক খিক করে হেসে উঠে বুটের ডগা দিয়ে খোঁচা দিল রানার পাঁজরে। হুস শব্দে বাতাস বেরিয়ে এল রানার নাক দিয়ে, ব্যথায় ককিয়ে উঠল ও।

'দুঃখিত,' মেনিলথিনকে বলল আহমেদ। 'আমার লোকের পা হড়কে গিয়েছিল।'

হেসে উঠল জার্মান মেনিলথিন। 'রানা?' গলা চড়িয়ে ডাকল সে।

চোখ দুটো আরও একটু মেলল রানা।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'কে তুমি?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল রানা। মুখের ভেতর অস্বাভাবিক বড় লাগছে জিভটাকে। ঠোঁট জোড়া সীসার মত ভারী। নোনা স্বাদ পেল

ও–রক্ত।

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর চাই,' বলল মেনিলথিন। 'অনেক কথা জানতে চাই আমরা। বলবে?'

ঝাপসা দেখছে রানা, দৃষ্টি পরিষ্কার করার জন্যে মাথা ঝাঁকাল ও।

চোখ জোড়া বিস্ফারিত করে অবিশ্বাসের সাথে জানতে চাইল আহমেদ, 'মানে? ও কি সহযোগিতা করতে রাজি নয়?'

মুখের ভেতর খানিকটা রক্ত আর থুথু জমেছে, সেটুকু থো করে ছুঁড়ে দিল রানা। আহমেদের নাকের পাশে পড়ল সেটা।

রুমাল দিয়ে মুছে, রক্ত আর থুথুটুকু চোখের সামনে তুলে দেখল আহমেদ। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সায়েদ, এখনও তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস?'

চোখের পলকে বিদ্যুৎ খেলে গেল সায়েদের শরীরে। 'ইয়াহু' বলে এক লাফ দিল সে, শূন্যে উঠে গেল, পড়ল রানার পেটে দু'পা দিয়ে। পেশী শক্ত করে রেখেছিল রানা, তা না হলে গলে যেত পেটের ভেতর সবকিছু। এতেও যথেষ্ট হয়নি মনে করে একই আওয়াজ আর ভঙ্গিতে আবার ওর পেটের ওপর লাফ দিয়ে পড়ল সায়েদ। গোঙানির মত শব্দ বেরোল রানার মুখ থেকে।

ট্রাফিক পুলিসের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল মেনিলথিন। 'হয়েছে, এবার একটু থামো। ওর সাথে কথা বলতে চাই। তোমরা যদি এভাবে মেরামত করতে থাকো, ইচ্ছে থাকলেও জবান বেরুবে না ওর।'

রানার চুল ধরে ওপর দিকে টানতে শুরু করল আহমেদ। বসাল ওকে। কিন্তু চুল ছাড়ল না, টেনে ধরেই থাকল। মাটির পাতিলটা তুলে রানার মুখের ওপর উপুড় করল সায়েদ। দুর্গন্ধে দম আটকে এল রানার। পচা পানি।

'মেজর রানা,' বলল মেনিলথিন, 'বুঝতেই পারছ, আমরা যদি তোমার ওপর রেগে যাই, তোমার মৃত্যুও হতে পারে। কাজেই আমাদেরকে রাগিয়ে দেয়া তোমার উচিত হবে না। এখন বলো, তুমি কি আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে রাজি আছ?'

সারা শরীরে ব্যথা, তবু ক্ষীণ একটু হাসল রানা। 'তোমরা কে, আমি জানি না। কিন্তু তোমরা কি, সেটা আমি বুঝতে পারছি। মাছি–কিন্তু গিলতে চেষ্টা করছ আস্ত একটা টিকটিকি।' মেনিলথিন কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'তারচেয়ে, আমাকে ছেড়ে দাও। কথা দিচ্ছি, পুলিসকে ইনফর্ম করব না।'

'এই রকম একটা গাধা লোককে এয়ারফোর্স ওয়ানের সিকিউরিটি চীফ করা হয়েছে, ভাবতেও পারি না!' আহমেদের দিকে ফিরে বলল মেনিলথিন। ফিরল রানার দিকে। 'তোমাকে বোধহয় আরও মেরামত করতে হবে?'

মেনিলথিনের কথায় কান না দিয়ে আবার বলল রানা, 'তোমাদের উদ্দেশ্য কি আমি জানি না। কিন্তু বাহরাইনী আর্মি আর পুলিস আমার খোঁজে দ্বীপটাকে চষে ফেলবে। আমাকে ছাড়া এয়ারফোর্স ওয়ান টেক-অফ করবে না। ভাল চাও তো ছেড়ে দাও আমাকে...'

'আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই?' সকৌতুকে

জানতে চাইল মেনিলথিন।

'না।'

'কিন্তু আমার বস্ বলেছেন, তোমার ওপর হামলা হলেই তুমি নাকি বুঝতে পারবে, কার নির্দেশে হামলাটা হলো, কে আছে এসবের পিছনে!'

'তোমার বস্?'

'তোমার শত্রু।'

কবির চৌধুরী? কোন কারণ নেই, তবু এই নামটাই প্রথমে মনে পড়ল রানার। বলল, 'তেমাদের উদ্দেশ্য যে ডাকাতি নয়, সেটা পরিষ্কার। জামা-কাপড়, আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করার বা পরিচয় দেবার কোন উপায় নেই আমার। তার মানে, আমি তোমাদের টার্গেট...তাছাড়া আমার পরিচয় জানো তোমরা।'

হেসে উঠল মেনিলথিন, যেন দারুণ মজা পেয়েছে। 'জানি বৈকি, মেজর। কিন্তু একটা কথা, নিজের গুরুত্ব খুব বাড়িয়ে দেখছ তুমি। বললে, তোমাকে ছাড়া এয়ারফোর্স ওয়ান নাকি টেক-অফ করবে না।' আবার একদফা হাসল মেনিলথিন। 'তোমার সাথে আমি একমত হতে পারলাম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি যে বোয়িঙে ওঠোনি বা নেই, এটা কেউ লক্ষই করবে না।'

তাকিয়ে থাকল রানা। ওর চুল ছেড়ে দিয়ে পিঠে, শিরদাঁড়ার ওপর হাঁটু ঠেকিয়ে রেখেছে আহমেদ, যেন আবার শুয়ে না পড়ে। 'বুঝলাম না,' বলল রানা। 'আমি জানি, আমাকে না নিয়ে এয়ারফোর্স ওয়ান বাহরাইন ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না।'

'তোমার গরহাজিরা ফ্লাইট ডেকে সামান্য অস্বস্তি সৃষ্টি করবে, তা মানি,' বলল মেনিলথিন। 'কিন্তু তাই বলে এয়ারফোর্স ওয়ান তোমাকে ছাড়া টেক-অফ করবে না, এ তুমি নিজের গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে বলছ। কর্নেল...কি যেন, হ্যাঁ, বিগ হার্ভে—তোমাকে না দেখে সে হয়তো মেজর প্যাট্রিক হলকে নিজের উদ্বেগের কথা জানাবে। প্যাট্রিক হল তো পাইলট, তাই না? তার কাছ থেকে খবরটা হয়তো নেভিগেটর লে. কর্নেল পলের কানে যাবে, নেভিগেটরের কাছ থেকে শুনবে মাস্টার সার্জেন্ট কেভ ব্রাউন, ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ব্যস, ওই পর্যন্তই, আর কেউ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তুমি কি বলো, মেজর?'

চোখে এখনও ঝাপসা দেখছে রানা। মাথাটা কাজ করছে না। অবিশ্বাসের সাথে আবার মাথা ঝাঁকাল সে। লোকটা যা বলছে, তার কোন অর্থই হয় না। 'তুমি কিছুই জানো না,' বলল ও। 'ওয়াশিংটন এ খবর জানবে। আর জানার সাথে সাথে...'

'তুমি এন্ডরু এয়ারফোর্স বেসের কথা বলতে চাইছ, তাই না? ফ্লাইট ডেকের কথাবার্তা খোলা লাইনের মাধ্যমে মনিটর হয়ে পৌঁছে যাবে ওখানে?'

'না, তা সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'তবে, রেডিওতে ওদের সাথে কথা বলতে দু'সেকেন্ডও লাগবে না বিগ হার্ভের। আমি আবার বলছি, আমাকে না নিয়ে টেক-অফ করবে না প্যাট।'

'ধন্যবাদ, রানা,' মুচকি হেসে বলল মেনিলথিন। 'যা জানার দরকার ছিল,

জেনেছি আমি। আহমেদ!'

'ইয়েস, বস্!' লাফ দিয়ে মেনিলথিনের সামনে এসে দাঁড়াল আহমেদ।

'তথ্যগুলো কাকে কাকে জানাতে হবে, তুমি জানো। এয়ারফোর্স ওয়ানের ফ্লাইট ডেকের সাথে সরাসরি কোন মনিটরিং সিস্টেম এন্ডরু এয়ারফোর্স বেসের নেই। ওরা শুধু রেডিওর সাহায্যে যোগাযোগ করতে পারে। আর মেজর প্যাট্রিক হলকে প্যাডি বা প্যাট্রিক বলা চলবে না, বলতে হবে প্যাট। বুঝেছ?'

একগাল হেসে মাথা কাত করল আহমেদ। হাতঘড়ি দেখল সে। 'মানামায় ফেরার পথে ফোন করব আমি। এরই মধ্যে দেরি করে ফেলেছি। আমার হুজুর আবার গোস্যা করবেন।'

'হুজুরের কথা ভুলে যাও, যা বলছি করো তাড়াতাড়ি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল আহমেদ, পিছন থেকে মেনিলথিন বলল, 'চাবি?'

দাঁড়িয়ে পড়ল আহমেদ, পকেট হাতড়ে চাবির একটা গোছা বের করে ছুঁড়ে দিল মেনিলথিনের দিকে। সেটা লুফে নিয়ে রানার দিকে ফিরল মেনিলথিন।

দেখল, সায়েদের হাতে ধরা কারবাইনের দিকে চট করে একবার তাকাল রানা। 'বোকামি হয়ে যাবে,' বলল সে। 'তুমি সুযোগ দেবে, এই আশাতেই ট্রিগারে আঙুল রেখে অপেক্ষা করছে সায়েদ।'

মেনিলথিনের নির্দেশে রানাকে কাপড় পরাতে শুরু করল সায়েদ। কারবাইনটা থাকল মেনিলথিনের হাতে। রানার প্রতিটি নড়াচড়া অনুসরণ করছে কারবাইন। শার্ট আর আন্ডারপ্যান্ট রানারই, ট্রাউজারটা সুতী কাপড়ের, আনকোরা নতুন। লেদার বেল্টটাও তাই। শার্টের ওপর কালো রঙের ঢোলা হাতা একটা আলখাল্লা পরানো হলো ওকে। হুড নামিয়ে ঢেকে দেয়া হলো ওর মুখ।

রানাকে মাঝখানে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। মেনিলথিনের ওপর শরীর ছেড়ে দিয়ে কোনরকমে হেঁটে এল রানা। ঘরের পিছনে কয়েকটা গাছের আড়ালে একটা গাড়ি দেখা গেল, সেটার পাশে এসে দাঁড়াল তিনজন। পিছনের সীটে তুলে দেয়া হলো রানাকে। তার পাশে বসল মেনিলথিন। কারবাইনটা এখন সায়েদের হাতে, ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল সেটা।

পকেট থেকে একটা ওয়ালথার নাইন এম এম পিস্তল বের করে রানার আহত পাঁজরে চেপে ধরল মেনিলথিন। 'কুবুদ্ধি এঁটে কোন লাভ হবে না। স্রেফ মারা পড়বে।'

গাড়ি ছেড়ে দিল সায়েদ।

'কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?' ক্লান্ত সুরে জানতে চাইল রানা। চোখ দুটো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসছে। অবশ্য খোলা রাখলেও লাভ হত না, কালো আবরণ ভেদ করে বাইরের কিছুই দেখতে পেত না ও।

'নরকে নয়, বলতে পারো বেহেশতে!' বলে হা হা করে হাসতে লাগল. কি যেন একটা মজা আছে এর মধ্যে।

'তোমরা মারাত্মক ভুল করছ,' মেনিলথিনের হাসি থামলে বলল রানা। 'আমার কথা বিশ্বাস করো, তোমরা ধরা পড়ে যাবে।'

'তুমি জানো না কার নির্দেশে কাজ করছি আমরা, তাই একথা বলছ.' বলল মেনিলথিন।

'আর বোধহয় আধ ঘণ্টা পর এয়ারফোর্স ওয়ানের টেক-অফ করার কথা.' বলল রানা। 'আমার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এটা বোধহয় এরই মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে। বাহরাইন পুলিস আর আর্মিকে লাগানো হবে আমাকে খুঁজে বের করার জন্যে...'

'এই এক গান শুনতে আর ভাল লাগে না!' কৃত্রিম বিরক্তির সাথে খেঁকিয়ে উঠল মেনিলথিন। 'শোনো তাহলে, মেজর রানা। তোমার গরহাজিরা কেউ লক্ষই করবে না, আমার এই কথার অর্থ তুমি বুঝতে পারোনি। আমি বলতে চেয়েছি, প্লেনে তুমি নেই, এটা কেউ টেরই পাবে না। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, প্লেনে তুমি থাকবে।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। লোকটা ঠাট্টা করছে? হাত দিয়ে হুড সরিয়ে আধবোজা চোখে মেনিলথিনের দিকে তাকাল ও। দেখল. চেহারা গম্ভীর করে রেখেছে লোকটা। 'তুমি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ?'

'তার দরকার পড়বে না। তুমি ওখানে না গেলেও ওরা দেখতে পাবে তুমি ওদের চোখের সামনে আছ। এখন আর তোমাকে বলতে কোন অসুবিধে দেখছি না ; না, তুমি এয়ারফোর্স ওয়ানে থাকছ না। কিন্তু আরেকজন থাকছে। তোমার পদেই। সিকিউরিটি চীফ হিসেবে।'

বোকা বোকা লাগল নিজেকে রানার। বুঝতে না পেরে মেনিলথিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল শুধু।

'যার কথা বলছি, তাকে দেখে বিগ হার্ভে, অ্যাডাম হল, ক্লেভ ব্রাউন, অ্যান্থনি পল থেকে শুরু করে ইউনাকোর অনারারি ডিরেক্টর মেজর জেনারেল রাহাত খান, ডেপুটি ডিরেক্টর সোহানা চৌধুরী, বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট—কেউই কোন সন্দেহ করবে না, তাকেই রানা বলে মনে করবে। হ্যাঁ. এই লোকের সাথে তোমার চেহারার মিল আছে—যথেষ্ট মিল আছে।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে শুরু করল রানার মাথায়। কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!' ভাবল, তাহলে কি কবির চৌধুরীই আবার নতুন কোন চাল চেলেছে? নিশ্চয়ই তাই!

'হ্যাঁ. ঠিক ধরেছ তুমি, রানা,' রানার মনের কথা যেন পড়তে পারল মেনিলথিন। 'আমার প্রভুকে তুমি চেনো।'

'কবীর চৌধুরী।'

'না,' গম্ভীর সুরে বলল মেনিলথিন। 'মি. কবির চৌধুরী।' তার হাতে অ্যারোসল স্প্রে দেখা গেল। একটু পর জ্ঞান হারাল রানা। গডলিম্যানকে নিয়ে হোটেলের লবি হয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে নকল রানা, এই সময় একজন

ওয়েটার ছুটে এসে জানাল, টেলিফোন। গডলিম্যানকে অপেক্ষা করতে বলে কাউন্টারের সামনে এসে রিসিভার তুলল পারকিন। আহমেদের দেওয়া তথ্যটা মন দিয়ে শুনল, তারপর তাকে জানাল, কনভয়ে যোগ দেওয়ার জন্যে হোটেল থেকে রওনা হচ্ছে সে।

ফিরে আসতে গডলিম্যান জিজ্ঞেস করল, 'কার ফোন?'

'সব কথা জানতে চাওয়া উচিত নয়,' হাসি মুখে উত্তর করল পারকিন।

'সরি,' বলল গডলিম্যান। চেহারা দেখে মনে হলো, ব্যাপারটাকে সহজভাবেই নিয়েছে সে।

বাহরাইন থেকে কয়েক হাজার মাইল উত্তরে, দুর্গের মত একটা বাড়ির হলঘরে বসে রয়েছে কবির চৌধুরী, সেখানে বসেই আহমেদের ফোন পেল সে। রিসিভার রেখে দিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করল।

ছোট্ট একটা রিপোর্ট পেল কে.জি.বি. কর্মকর্তা জেনারেল কামচিন। অত্যন্ত সমীহের সাথে কবির চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাল সে। তারপর রিসিভার রেখে দিয়ে অ্যালেক্স রাসকিনের হাত থেকে এক গ্লাস জনি ওয়াকার নিল।

'সব ঠিক আছে?' জানতে চাইল রাসকিন।

'থাকবে না কেন!' বলে মুচকি হাসল জেনারেল।

ছয়

মুহারক এয়ারপোর্টের হার্ডস্ট্যান্ডে থরথর করে কাঁপছে ভিসি-ওয়ান থ্রী সেভেন সি স্ট্র্যাটোলাইনার।

সাইরেন বাজিয়ে একটা প্রবেশ নিষেধ রাস্তায় ঢুকে পড়ল মোটর শোভাযাত্রা। কাছে চলে এসেছে মুহারক এয়ারপোর্ট, রানওয়েতে পৌঁছুবার জন্যে এটাই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত আর নিরাপদ রাস্তা। শোভাযাত্রার সামনে সশস্ত্র পথ-প্রদর্শকরা মোটর সাইকেলে রয়েছে, হঠাৎ তারা নির্ধারিত শিডিউল ভঙ্গ করে থামতে শুরু করল, রাস্তার দু'পাশে দাঁড়ানো কয়েকশো বাহরাইনী সেনা আর পুলিসের চোখের সামনে।

কনভয়ের শেষ লিমুসীন তখনও পুরোপুরি থামেনি, ঝট করে দরজা খুলে সেটা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল পারকিন-রানা। একটা ফিল্মে প্রেসিডেন্টের এয়ারপোর্ট আগমন চাক্ষুষ করেছে সে, তাতে সিকিউরিটি চীফ ঠিক এই কাণ্ডই করে, তার জায়গায় রানা হলেও এই করত।

বোয়িঙের ফ্লাইট ডেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি নেয়া শুরু হয়েছে। চীফ স্টুয়ার্ড মাস্টার সার্জেন্ট পিটি ফবের বাচ্চাওয়ালী মুরগীর মত খুঁটিনাটি বিষয়ে চেঁচামেচি করছে—টেবিল ক্লথের কোনা কুঁচকে আছে কেন, আরও কেন চকচক করছে না ক্রিস্টাল গ্লাস ইত্যাদি। বরাবরের মত, যাত্রা শুরু করার

আগের মুহূর্তে যা হয়, উত্তেজনা আর টেনশনে ভুগছে কমান্ডার বিগ হার্ভে। কিন্তু প্যাট্রিক হলেরও চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই–শান্ত, স্থির নিরুদ্বিগ্ন। চার্টেড ফ্লাইট প্ল্যানের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল অ্যান্থনি পল।

এয়ারপোর্টের বাইরে মোটর শোভাযাত্রা দেখার জন্যে কৌতূহলী লোকের একটা ভিড় অনেক আগে থেকেই জমে উঠেছিল, সেটাকে সামলানো একটু কঠিন হয়ে উঠল। চওড়া রাস্তা ছেড়ে শোভাযাত্রা সরু একটা রোডে ঢুকে পড়তেই দু'পাশ থেকে চেপে এল ভিড়। এই রোড থেকে সরাসরি রানওয়েতে পৌছুনো যাবে।

কনভয়ের সামনে চলে এসেছে পারকিন, হুঙ্কার ছেড়ে নির্দেশ দিল সে, 'ভিড় সরাও! রাস্তা পরিষ্কার করো!'

সশস্ত্র সৈনিকরা কারবাইন উল্টো করে ধরে লোকজনের গায়ে গুঁতো দিতে শুরু করল। বেদম লাঠি চালাচ্ছে পুলিস। বিশাল গেট খুলে যেতেই আবার সচল হলো কনভয়। মোটর সাইকেল আরোহীদের পিছু নিয়ে রানওয়েতে পড়ল শোভাযাত্রা। তারপর এয়ারফোর্স ওয়ানের বন্ধ হ্যাচের সামনে এক এক করে থামতে শুরু করল ঝকঝকে কালো লিমুসীনগুলো।

চীফ স্টুয়ার্ড হিসেবে সম্মানীয় মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাবার দায়িত্ব পিটি ফবেরের। হ্যাচ খুলে সিঁড়ির নিচে নেমে এল সে, আন্তরিক হাসিতে উদ্ভাসিত চেহারা, সাদা দাঁত মুক্তোর মত ঝকঝক করছে। সৌদী আরবের তেল-মন্ত্রী ড. শেখ মোহাম্মদ ওয়াহাব সিঁড়ির কাছে চলে এলেন, মাথা একটু নিচু করে বাউ করল ফবের। ড. ওয়াহাবের ভারী চেহারায় স্মিত হাসি ফুটল। ওপেক টাইকুনদের মধ্যে একমাত্র ড. ওয়াহাবই সম্পূর্ণ আরব পোশাক পরেন, রিয়াদের একজন সুখ্যাত দর্জি তাঁর এই পোশাক অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে তৈরি করে থাকে। উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

দ্বিতীয় গাড়িতে লিবিয়ান পতাকা পত পত করছে। এবারও একই ভূমিকা পালন করল পিটি ফবের। শেখ মো. ইব্রাহিম আতাফীর বয়স হবে পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, সুন্দর একজোড়া গোঁফের অধিকারী তিনি, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। পিটি ফবেরের হাতটা ধরে কয়েক দফা ঝাঁকি দিলেন তিনি। তাঁর পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল একজন পোর্টার, হাতে হ্যান্ডব্যাগ।

এরপর এলেন ইরাকের শেখ আদনান দারজাল। মোটাসোটা ভদ্রলোক, এমন চওড়া গোঁফ তাঁর, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

আরোহীদের নামিয়ে দিয়ে এক এক করে বিদায় নিচ্ছে গাড়ি।

এরপর গাড়ি থেকে নামলেন ম্যালকম ফিলপট, মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারি। এর আগেও এয়ারফোর্স ওয়ানে একাধিকবার চড়েছেন তিনি, ক্রু আর স্টাফদের প্রায় সবাইকে চেনেন। ফবেরের সাথে করমর্দনের সময় হালকা একটু রসিকতা করলেন তিনি। 'অনেক সময় যুদ্ধ করেও একজন বীরকে নোয়ানো যায় না,' বললেন তিনি, 'কিন্তু ভাল খাবার আর সেবা দিয়ে তার মন জয় করা পানির মত সহজ। কথাটা তোমার মুখেই শুনেছিলাম কিনা ঠিক মনে নেই।'

'মনে রেখেছেন বলে ধন্যবাদ, স্যার,' আন্তরিক হাসি ফবেরের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

শেষ গাড়িতে বাহরাইনের জাতীয় প্রতীক আঁকা রয়েছে, সেটা বোয়িঙের সামনে থামতেই ব্যারিকেডের ওদিক থেকে লোকজন হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল। এই গাড়ির আরোহী সম্পর্কে আগে থেকে কিছু জানা না থাকলে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হত পিটি ফবেরকে।

পরনে কমপ্লিট স্যুট, কিন্তু মাথায় আরবীয় পাগড়ী, শেখ জাহিদ আল খালিদের নাকটা যেমন বড়, তেমনি টিকালো। বেশ ভারী চেহারা তাঁর, ষাট বছর বয়সেও প্রচুর শক্তি রাখেন শরীরে, চোখ দুটো কারও চোখে পড়লে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে তাকে। হাত জোড়া ভারী, কাঁধ জোড়া চওড়া, কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, তাঁর বাঁ পা হাঁটুর কাছ থেকে নেই, হাঁটুর নিচে ট্রাউজারটা ফাঁপা। সাথে করে তেরো বছরের নাতিকে নিয়ে এসেছেন খালিদ, এই সুযোগে এয়ারফোর্স ওয়ানে চড়ে সুইটজারল্যান্ডে তার স্কুলে ফিরে যাচ্ছে ফারুক।

গাড়ির আরেক দিকের দরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে এল একজন আরব লোক, পিছনে বনেট খুলে ভেতর থেকে বের করে আনল ভাঁজ করা একটা হুইলচেয়ার। ভাঁজ খুলে সেটাকে ঠেলে নিয়ে এল গাড়ির দরজার সামনে।

'ধন্যবাদ, আহমেদ,' বললেন জাহিদ আল খালিদ। তাঁর নাতি এবং আহমেদ কায়াম হুইলচেয়ারে বসতে সাহায্য করল তাঁকে। ইতোমধ্যে ধাপগুলো সরিয়ে ফেলেছে এয়ারফোর্স কর্মীরা, সিঁড়িটা এখন সমতল আর ঢালু। তার ওপর দিয়ে ঠেলে হুইলচেয়ারটাকে বোয়িঙে তোলা হলো। দাদুকে অনুসরণ করে ফারুকও চড়ল প্লেনে, তার পিছু পিছু উঠে এল ব্যাসিল গডলিম্যান। নোটবুকে টিক চিহ্ন দেয়া নামগুলোর ওপর চোখ বুলাল পিটি ফবের। একজন এনার্জি সেক্রেটারি—আমেরিকান। চারজন ওপেক মন্ত্রী, সবাই আরব। একজন কিশোর, সে-ও আরব। ইরান আর ভেনিজুয়েলা প্রতিনিধি পাঠালে এয়ারফোর্স ওয়ানে সবগুলো ওপেক সদস্যকে পাওয়া যেত, কিন্তু সম্ভবত রাজনৈতিক কারণেই তারা কেউ উপস্থিত নয়।

সব শেষে প্লেনে চড়ল কোডি পারকিন। তরতর করে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠে এল সে, ডাইনে-বাঁয়ে কোনদিকে তাকাল না। হাতে একটা রিভলভার, চেহারায় অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাস। তার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল এয়ারফোর্স ওয়ানের হ্যাচ। তারপর সরিয়ে ফেলা হলো সিঁড়ি।

ফোনের রিসিভার সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরে রাশীদ সোনাইদি বলল, 'পেন্টাগন, ম্যাডাম,' হঠাৎ করে তার চেহারায় গাম্ভীর্য আর সমীহের ভাব এসে গেছে। 'জেনারেল টমসন।'

ছোঁ দিয়ে রিসিভারটা একরকম কেড়েই নিল সোহানা, 'খবর কি, জেনারেল?' স্পষ্ট উচ্চারণে, দ্রুত কিন্তু তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল সে। 'বাহরাইন থেকে কি বলা হচ্ছে রিপোর্টে?'

'আবহাওয়ার খবর,' সকৌতুকে বললেন জেনারেল টমসন। 'তুমি কি অন্য কোন খবর আশা করছ, মিস সোহানা? আরও একটা তেলের খনি আবিষ্কার হয়েছে কিনা, বা এই ধরনের কিছু?'

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে, সম্পূর্ণ অন্য সুরে বলল সোহানা, 'আমি এয়ারফোর্স ওয়ানের কথা জানতে চাইছি, জেনারেল।' আগের চেয়ে শান্ত, কিন্তু ঠাণ্ডা দৃঢ়তার সাথে কথা বলছে ও। 'জানতে চাইছি ওখানে সব ঠিক আছে কিনা। বিপদের কোন আভাস আপনি পেয়েছেন?'

'অ্যাই মেয়ে, তোমার হয়েছে কি বলো তো?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল টমসন। 'এত উতলা হচ্ছ কেন?'

'কি যে হয়েছে, তা আমি নিজেও জানি না, জেনারেল,' স্বীকারোক্তির মত শোনাল সোহানার কথাগুলো। 'কিন্তু আমার মন বলছে, খারাপ কিছু একটা না ঘটেই পারে না...'

অপর প্রান্তে চুপ করে থাকলেন জেনারেল টমসন। ইউনাকোর চলতি মেয়াদের এই ডেপুটি ডিরেক্টর মেয়ে এবং অল্প-বয়স্কা হলেও, গত ক'মাসের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন তিনি, মিছে ভয় পাবার বা অন্তসারশূন্য কথা বলার পাত্রী নয় সে। রাহাত খান তাঁর বন্ধু এবং সেই সূত্রে সোহানা চৌধুরী তাঁর স্নেহের পাত্রী হলেও, যোগ্যতা আর বুদ্ধিমত্তার জন্যে মেয়েটিকে তিনি খুব উঁচু নজরে দেখেন।

কিন্তু এয়ারফোর্স ওয়ানের ব্যাপারে সোহানার এই উদ্বেগ কেন, তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। ওতে রানা আছে বলে কি? আপনমনে হাসলেন তিনি। বললেন, 'এয়ারফোর্স ওয়ানের পাইলট আর কমান্ডারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে আমাদের, সোহানা। সবগুলো সিস্টেম ঠিকভাবে কাজ করছে, প্লেনে যাদের থাকার কথা তারাই আছে যে যার জায়গায়। সম্ভবত ঠিক এই মুহূর্তে আরোহীরা তোমার এজেন্ট রোজি কারভারের সাহায্য নিয়ে যার যার সীটে বসেছেন। আর মাসুদ রানা তো আছেই, নিরাপত্তার দায়িত্ব তার হাতে পড়ায় আমরা এখানে সবাই খুশিই হয়েছি। ইউনাকোর আর কোন এজেন্ট এয়ারফোর্স ওয়ানে আছে কিনা আমার জানা নেই, তবে চেয়ার-টেবিল বা ইঞ্জিনের কাউলিং হিসেবে ছদ্মবেশ নিয়ে দু'একজন যদি থেকে থাকে, আমি একটুও আশ্চর্য হব না। যদি থাকে, তারাও নিরাপত্তার দিকটা দেখবে। তোমার দুশ্চিন্তার আমি তো কারণই খুঁজে পাচ্ছি না। এবার নিয়ে তুমি আমাকে তিনবার ফোন করলে।'

'দুঃখিত,' বলল সোহানা। কিন্তু প্রসঙ্গটাকে বাড়তে দিল না আর। জানতে চাইল, 'আচ্ছা, জেনারেল, আপনার ওখানে তো রাডার-প্লটও আছে, তাই না?'

অপরপ্রান্তে হাসি চাপলেন জেনারেল টমসন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের এখানে রাডার-প্লট আছে।' এরপর, অসীম ধৈর্যের সাথে রাডার-প্লট কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন তিনি। হেঁড়ে গলায়, প্রায় চিৎকার করে কথা বলার অভ্যেস তাঁর, রিসিভারটা কানের কাছ থেকে বেশ একটু সরিয়ে রাখল সোহানা। সবশেষে জানতে চাইলেন তিনি, 'সন্তুষ্ট?'

'কমপ্লিটলি,' বলল সোহানা। তারপর একটা অন্যায় স্বীকার করল ও, গলার সুরে আন্তরিক দুঃখ ফুটিয়ে বলল, 'বোয়িঙের কোর্স ফলো করার জন্যে রাডার-প্লট সিস্টেম চালু করেছে ইউনাকো...,' সোহানা তার কথা শেষ করতে পারল না, জেনারেল তাকে বাধা দিলেন। বিস্ফোরণের জন্যে মনে মনে নিজেকে তৈরি করল সোহানা।

কিন্তু জেনারেল টমসন হালকা সুরে বললেন, 'আমাদের ইনার্শিয়াল গাইডেন্স সিস্টেম ট্যাপ করবে তোমরা, আর আমরা তা জানতে পারব না, তুমি কি সত্যি তাই ভেবেছিলে? তোমরা একজনকে পাঠিয়েছিলে, আমরা জানি। এন্ডরু এয়ারফোর্স বেসের ওদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যেন দেখেও না দেখার ভান করে।' খানিক হেসে নিলেন জেনারেল, তারপর বললেন, 'শার্লক হোমসের নানী শাশুড়ী, আমরা গতকাল জন্মাইনি!'

ছোট একজোড়া ঢোক গিলে ব্যাপারটা হজম করল সোহানা। প্রসঙ্গ বদলাতে ওর জুড়ি নেই, বলল, 'ঠিক আছে, জেনারেল, আপনি তাহলে কথা দিন, কোথাও কোন রকম গোলমাল ধরা পড়ার সাথে সাথে আপনি আমাকে জানাবেন?'

জেনারেল আবার ওকে অভয় দিয়ে জানালেন, 'কোন গোলমাল হবে না। বোয়িঙ এত বেশি ওপরে চড়বে না যাতে আরোহীদের কষ্ট হয়। দূর পাল্লার প্লেন ওটা, ফ্লাইটের প্রথম দফায় যতটুকু দূরত্ব পেরোতে হবে তার চেয়ে অনেক বেশি দূরত্ব পেরোবার ক্ষমতা রাখে। ওতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ফুয়েল রয়েছে। সামগ্রিক ভাবে বোয়িঙের অবস্থাও খুব ভাল। যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'তবু,' নাছোড়বান্দার মত চাপ দিল সোহানা।

'ঠিক আছে,' অগত্যা বললেন জেনারেল টমসন। 'একবার যখন মুখ থেকে বের করেছ, আদায় তুমি ঠিকই করে নেবে। তুমি যদি চাও তো আমি আরও অনেক কিছু রিপোর্ট করতে পারি। এই যেমন ধরো, মাসুদ রানার সর্দি হয়েছে কিনা। কিংবা কে কতবার হাঁচি দিয়েছে...'

'ধন্যবাদ,' এদিক থেকে গলা ভারী করে বলল সোহানা। 'ওসব রিপোর্ট আমার কোন কাজে লাগবে না, জেনারেল।' রিসিভার ক্রাডলে রেখে দিয়ে মুখ তুলে বাহরাইন লেখা ওয়াল-ক্লকের দিকে তাকাল ও।

আর দু'মিনিটের মধ্যে টেক-অফ করবে এয়ারফোর্স ওয়ান।

এয়ারফোর্স ওয়ানের এক নম্বর স্টেটরুমটা বেশ বড়ই বলা চলে। মেহমানদের জন্যে এখানে রয়েছে আর্মচেয়ারের ব্যবস্থা। প্রতিটি চেয়ারে চাকা লাগানো আছে, নাড়াচাড়া বা সরাবার জন্যে লিভারের ব্যবস্থা। মাঝখানে টেবিল, দু'পাশে দুটো করে চেয়ার। এই রকম অনেকগুলো সেট। মুখে চাঁদের হাসি নিয়ে আধুনিক মোগল সম্রাটদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে সবাইকে বসাল রোজি। কিশোর ফারুককে দেখে খুশি লাগল তার, কিন্তু ছেলেটা তার সাথে ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত ব্যবহার করছে দেখে চেহারায় ক্ষীণ বিষাদের ছায়া নিয়ে সেখান থেকে

সরে এল ও।

ফ্লাইট ডেকের ইন্টারকম জ্যান্ত হয়ে উঠতেই ঝাঁঝাল কণ্ঠে জানতে চাইল বিগ হার্ভে, 'কে শুনি?'

'ফবের, স্যার,' জবাব এল। 'মেহমানরা সবাই প্লেনে চড়ে আরাম করে বসেছেন।'

'সীট বেল্ট?'

এক মুহূর্ত পর উত্তর দিল ফবের 'বাঁধা হয়েছে, কর্নেল।'

'ঠিক আছে,' বলল কমান্ডার। তারপর মাইক্রোফোনে কথা বলল সে, 'ক্লিয়ার টু স্টার্ট ওয়ান অ্যান্ড টু?' গ্রাউন্ড ক্রুদের একজন পোর্ট এঞ্জিন এলাকাটা চেক করে দেখল, বলল, 'ক্লিয়ার অন বোথ।'

'স্টার্ট, টু,' অর্ডার করল কমান্ডার।

একটা বোতামে চাপ দিল হল। 'স্টার্টিং টু,' বলল সে। দু'নম্বর এঞ্জিন চালু হতেই কাঁপুনি বেড়ে গেল এয়ারফোর্স ওয়ানের। আবার বলল সে, 'টু স্টেডি।'

'স্টার্ট ওয়ান।'

'স্টার্টিং ওয়ান।' আরও একটু বাড়ল বোয়িঙের কাঁপুনি। 'ওয়ান স্টেডি। রোটেশন ওয়ান অ্যান্ড টু।'

'মুভ ইট,' অর্ডার এল কমান্ডারের।

বোয়িং ছেড়ে দিয়ে সেটাকে সামনে বাড়তে দিল হল, 'ট্যাক্সিয়িং পাওয়ার' রিপোর্ট করল, বরাদ্দ করা রানওয়ের দিকে যাবার জন্যে ছেড়ে এল হার্ডস্ট্যান্ড। থ্রটল অপারেট করছে কমান্ডার বিগ হার্ভে, এঞ্জিনের আওয়াজ তীক্ষ্ণ শিসের মত হয়ে উঠল। 'লেটস গো!' বলল সে। এয়ারফোর্স ওয়ানের স্পীড বাড়তে শুরু করল।

'রোলিং,' ছোট্ট করে জানানো হল।

একশো নট স্পীডে ছুটছে প্লেন, এই সময় কন্ট্রোলের দায়িত্ব নিল বিগ হার্ভে। পাইলট 'ভি-ওয়ান' বলতেই কোডটা রিপিট করল কমান্ডার–তার মানে, মাটি থেকে প্লেনকে শূন্যে তোলার চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত পাল্টাবার আর কোন উপায় নেই। প্লেনকে আকাশে তুলতেই হবে।

'ভি-টু।'

'রোটেট।'

'রোটেটিং।' কন্ট্রোল ইওক আস্তে করে পিছিয়ে নিয়ে এল বিগ হার্ভে! মুক্ত, নীল আকাশে উঠে পড়ল এয়ারফোর্স ওয়ান।

বোয়িঙে চড়ে সোজা পিছনের টয়লেটের দিকে এগোল পারকিন। পথে মাস্টার সার্জেন্ট কেভ ব্রাউন ছাড়া আর কারও সাথে দেখা হলো না তার। ব্রাউন কুশল জানতে চাইলে ছোট্ট করে শুধু মাথা ঝাঁকাল পারকিন, হন হন করে পাশ কাটিয়ে গেল তাকে। টয়লেটে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করল সে। পকেট থেকে বের করল অ্যারোসল স্প্রের অপেক্ষাকৃত খুদে একটা সংস্করণ। একটা ওয়াল কেবিনেটের দরজা খুলে টয়লেট সরঞ্জামের পিছনে লুকিয়ে রাখল

সেটা।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল পারকিন, পিছনের প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে পৌঁছুতেই একজন নয়, একসাথে দু'জন স্টুয়ার্ডেসের সামনে পড়ে গেল সে। সাথে সাথে বুঝল, এটা তার দ্বিতীয় পরীক্ষা– সংকট বলাই ভাল। গডলিম্যানকে তবু এড়াবার উপায় ছিল, রঙ নাম্বার বলে ফোনের রিসিভার রেখে দিলেই হত। কিন্তু এদেরকে এড়ানো সম্ভব নয়। মনে মনে ভেবে রেখেছিল, একবারে একটা করে মেয়েকে সামলাবে সে, কিন্তু বিধি বাম, তা হবার নয়। এখন প্রশ্ন হলো, এদের দু'জনের মধ্যে কার সাথে আজ রাতে ডিনার খাবার কথা ঠিক হয়ে আছে তার?

কোডি পারকিন মাসুদ রানার আকৃতি আর চেহারা পেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মন মানসিকতা আর রুচি তার নিজেরটাই রয়ে গেছে, একটুও বদলায়নি। ডাক্তার কোচের প্রতিভা অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সত্যিকার সুন্দরী মেয়েদের সান্নিধ্য উপভোগ করা পারকিনের আয়ত্তের বাইরে, তাই দ্বিতীয় সারির মেয়েদেরকে পছন্দ করতেই অভ্যস্ত সে। তাছাড়া, লালচুলো মেয়ে বিশেষভাবে পছন্দ তার।

কাজেই তার নজর আটকে থাকল হেলেনের ওপর। রোজি কারভারের দিকে মাত্র একবার তাকাল সে, সাথে সাথে ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি। হেলেনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত লোভাতুর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হাসল সে। বলল, 'এয়ারম্যান, আমাদের ডিনার-ডেটের কথা ভুলে যেয়ো না কিন্তু।'

বাড়িটা আহমেদ কায়ামের। অন্ধকার এক কামরায় জ্ঞান ফিরে এল রানার।

আহমেদ শুধু বাহরাইনী তেল মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি নয়, শেখ জাহিদ আল খালিদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ও সে। শেখের অত্যন্ত বিশ্বস্ত আর প্রিয়পাত্র বলে তিনি তাকে নিজের বিশাল প্রাসাদের ভেতর গোটা একটা বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন বসবাসের জন্যে। রানাকে এখানে আটক রাখার প্রস্তাবটা আহমেদেরই, মেনিলথিনকে ব্যাখ্যা করে বোঝায় সে, এরচেয়ে নিরাপদ জায়গা গোটা বাহরাইনে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

জ্ঞান ফেরার পর অবাক হয়ে আবিষ্কার করল রানা, তার হাত-পায়ে শেকল নেই, এমনকি রশি দিয়েও বাঁধা হয়নি। কিন্তু একটু পর বুঝল, প্রতিপক্ষের এই অবহেলায় ওর খুশি হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই। একটাই জানালা ঘরে, মোটা লোহার রডগুলোর পিছনে কাঁচের কবাট, কিন্তু ফ্রেমটা লোহার–ওয়েল্ডিং করে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বাতাস চলাচলের জন্যে সিলিঙের কাছাকাছি একটা ভেন্টিলেটর আছে বটে, কিন্তু সেটা দিয়ে কোনমতে হাত গলতে পারে, মাথা গলবে না। একটাই দরজা, বাইরে থেকে তালা দেয়া। বিছানার উল্টো দিকে একটা বড়সড় দেয়াল আলমারি, কবাটে হাতল আছে।

বিছানা থেকে নেমে জানালার সামনে আসতেই হাঁপিয়ে উঠল রানা। সারা শরীরে তীব্র ব্যথা। ভারী পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখল, কোমরের নিচে ট্রাউজার নামিয়ে হলুদাভ, ঝাঁঝাল পানি ছাড়ছে একজন লোক দেয়ালের গায়ে।

ওকে দেখে হাতের কালাশনিকভ রাইফেলটা নেড়ে দেঁতো হাসি হাসল সে। তাড়াতাড়ি পর্দা ছেড়ে দিল রানা। তারপর আবার, এবার ধীরে ধীরে, সামান্য একটু ফাঁক করল সেটা।

এখনও রয়েছে গার্ড। রাইফেলটা রাশিয়ান, কালো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। লোকটাও আরব নয়।

দরজার তালা খোলার আওয়াজ হলো। এক মুহূর্ত পর বিছানার ওপর টর্চের আলো পড়ল। একপাশে দেখা গেল একটা টেবিল, একটা চেয়ার, ওয়াশবেসিন। মুখের ওপর আলো পড়তে, চোখে হাত তুলল রানা। আলোর পিছনে এসে দাঁড়াল মেনিলথিন, টর্চটা অন্য এক লোক ধরে আছে। দরজার পাশের সুইচবোর্ডে হাত উঠে গেল মেনিলথিনের, খুট করে আওয়াজের সাথে জ্বলে উঠল ইলেকট্রিক বালব। দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলল সে, এক নম্বর গার্ড টর্চ নিভিয়ে দিল। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করল দু'নম্বর গার্ড। তিনজনই সশস্ত্র।

'আওয়াজ শুনে বুঝলাম, তুমি নড়াচড়া করছ,' বলল মেনিলথিন। 'এত মারধরের পরও তুমি বহাল তবিয়তে আছ দেখে, বিশ্বাস করো, আমি খুশি।'

একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে রানা। বিছানার ওপর গিয়ে বসল ও। নাকের ফুটোর নিচে শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে। ঠোঁট, নাক, কপালের বাঁ দিকটা বেঢপভাবে ফোলা। মুখের কয়েক জায়গায় চামড়া নেই। সবচেয়ে বেশি ব্যথা লাগছে বুকে আর পাঁজরে। হাঁটু আর পায়ের গোড়ালিও জখম হয়েছে।

'এদের সামনে মন খুলে কথা বলতে পারো তুমি,' বলল মেনিলথিন 'এরা কেউ ইংরেজি বোঝে না।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর এমন ভাব দেখাল যেন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেছে তার, বলল, 'ও, হ্যাঁ, ভাল কথা, আমাদের প্ল্যান একটু বদল করা হয়েছে। প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল, তোমাকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু পরে সেটা সংশোধন করা হয়। লাশ নয়, জ্যান্ত মাসুদ রানা উপকারে লাগতে পারে।'

হাসতে গিয়ে ঠোঁটে ব্যথা পেল রানা। ভারী জিভ আড়ষ্টভাবে নেড়ে বলল, 'কবির চৌধুরী বুঝি তাই আশা করছে? আমি তার উপকারে লাগব?'

কাঁধ ঝাঁকাল মেনিলথিন। 'সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হলো, এখনও তুমি আস্ত রয়েছ। তোমাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই, এ-থেকেই কি সেটা প্রমাণ হয় না?'

'প্রমাণ হয়, আমার কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য পাবার আশায় আছ তোমরা।'

'আরও তথ্য? কি রকম?'

'তোমরাই জানো,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল মেনিলথিন। 'তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, মেজর। মিস্টার চৌধুরী নয়, অন্য এক পার্টি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তোমার সাথে কথা বলার সাংঘাতিক আগ্রহ ওদের। সত্যি কথা বলতে কি, প্রস্তাবটা তোমাকে জানাবার জন্যে আমাকে ধরেছে তারা।'

'তাই? কিন্তু তারপর, আমার সাথে কথা বলা শেষ হলে?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল মেনিলথিন। 'কে বলতে পারে! তবে দেখেশুনে বুঝতে পারছি, ওদের কাছে অনেক দাম তোমার। দুর্লভ একটা সম্পদের মত। কে জানে, ওরা হয়তো তোমাকে পছন্দ করতে শুরু করবে।'

কথা বলার ফাঁকে চোরাচোখে গার্ডদের দিকে কয়েকবার তাকিয়েছে রানা। মেনিলথিন হয়তো সত্যি কথাই বলছে, এরা ইংরেজি বোঝে না। ওদের কথা শুনছে তারা, কিন্তু বুঝতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। দু'একবার হেসে উঠেছে, কিন্তু মেনিলথিনের হেসে ওঠার কয়েক সেকেন্ড পর, দেখাদেখি।

মেনিলথিনের দিকে তাকাল রানা। 'কারা তারা?' তিক্ত সুরে জানতে চাইল ও। 'আমার সাথে কি কথা বলতে চায়?'

'হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না,' বলল মেনিলথিন। চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল, রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে চায়। 'রাশিয়ানরা।'

সর্বনাশ। এর মধ্যে কে.জি.বি-ও আছে! চোখ পিট পিট করে তাকাল রানা, একটা ভুরু উঁচু হলো একটু। 'কবির চৌধুরী জানে?'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মেনিলথিনের মুখে। জবাব দিল না সে।

তারমানে, কবির চৌধুরী জানে না, ভাবল রানা। 'কবির চৌধুরীর এই অপারেশনের সাথে কে.জি. বি-র কি সম্পর্ক?'

মাথা নাড়ল মেনিলথিন। অর্থাৎ উত্তর দেবে না।

'রাশিয়ানদের দূত হিসেবে কাজ করছ তুমি, তোমার লাভটা কি?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে ঘন ঘন কয়েকবার তর্জনীর আগাটা চুলকাল মেনিলথিন।

'আগেই বোঝা গেছে, তুমি কবির চৌধুরীর লোক,' বলল রানা। 'টাকার লোভে তার সাথে বেঈমানী করতে চাইছ?'

এবার মুখ খুলল মেনিলথিন। 'যাকে ভয় করি, তাকে একটু প্যাঁচে ফেলার সুযোগ পেলে ছাড়ব কেন?' আশা করেনি রানা, তবু গোটা ব্যাপারটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলল সে। একজন লোক পাঠিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করেছে রাশিয়ানরা, এরই মধ্যে প্রচুর টাকা পেয়েছে সে–বিনিময়ে রানাকে তার বিশ্বাস করাতে হবে, কে.জি.বি-র এই প্রস্তাব কোন ভাঁওতা বা ফাঁদ নয়, একেবারে জেনুইন।

সবশেষে আবার বলল মেনিলথিন, 'ওরাই তোমার সাথে কথা বলতে চায়, আমি বা কবির চৌধুরী না। প্রাণের ওপর যদি মায়া থাকে, খেলতে রাজি হও, মেজর। এছাড়া বাঁচার কোন পথ নেই তোমার।'

কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল মেনিলথিন, গার্ড দু'জনকে পিছনে নিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। বাইরে থেকে তালা লাগানো হলো দরজায়।

চিন্তা করছে রানা। দুটো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে ও। একটা তার মধ্যে ভয়ঙ্কর। কবির চৌধুরীর হাত থেকে ছুটে গিয়ে নকল রানা রাশিয়ানদের সাথে

হাত মিলিয়েছে, অন্তত মেনিলথিনের কথা থেকে সেটা আন্দাজ করা যায়। তাহলে কি কবির চৌধুরীকে ডাবলক্রস করার জন্যে নকল-রানাকে ব্যবহার করার প্ল্যান করছে কে.জি.বি? তাই যদি হয়, কে.জি.বি-র পক্ষে কি জিম্মিদেরকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে? জিম্মিরা বেঁচে থাকলে এসবের পেছনে রাশিয়ার হাত আছে এটা প্রকাশ হয়ে পড়বে, কাজেই তারা ওদেরকে কোন্ সাহসে বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে?

নিজের অসহায়ত্বের কথা মনে পড়ে যেতে ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা, রাগের মাথায় দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল নিরেট দেয়ালে। জিম্মিদেরকে মেরে ফেলা হবে, এই তথ্য একমাত্র সে-ই জানে, কিন্তু এই ঘরের ভেতর আটকা থাকলে সেটার মূল্য কি! বাইরে বেরুতে পারলে রাশিয়ানদের বাধা দেবার একটা চেষ্টা অন্তত করতে পারবে সে। কিন্তু বেরুবে কিভাবে?

মেনিলথিনের দেয়া আরেকটা তথ্য—গার্ডরা ইংরেজি বোঝে না। শুধু তাই নয়, তারা আরবও নয়। তাহলে কোথাকার লোক ওরা? যদি জানতে পারে, সেটা কি তার মুক্ত হবার ব্যাপারে কোন কাজে লাগবে? বন্ধ ঘরের ভেতর ছটফট করতে লাগল অসহায় রানা।

সাত

আবারও ভাগ্যগুণে সঙ্কট কাটিয়ে উঠল পারকিন।

রোজি আর হেলেন পাশাপাশি, গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ডিনারের কথাটা তুলতেই পারকিন দেখল, বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠছে হেলেনের চোখ। সাথে সাথে রোজির দিকে ফিরল সে, এক সেকেন্ড দেরি না করে জানতে চাইল, 'কি, কথা বলছ না যে? ডিনার খাবার কথা সত্যি তুমি ভুলে গেছ নাকি?'

এবার রোজির বিস্মিত হবার পালা। 'কথাটা আপনি হয়তো আমাকেই বলেছেন,' বলল সে, 'কিন্তু হেলেনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন বলে আমি ভাবলাম...অন্তত প্রথমবার আপনি ওর দিকে তাকিয়েই কথাটা বলেছেন, মি. রানা।'

চেহারায় কৌতুক মেশানো অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়ে তুলল পারকিন। 'তাই? ফর গডস সেক, আমি খেয়াল করিনি। দুঃখিত। আসলে হয়েছে কি জানো, সিকিউরিটি চীফের দায়িত্ব পালন করতে হলে এত দিকে মনোযোগ দিতে হয়, ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারে ভুল করে বসি। তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

মুচকি একটু হেসে রোজি বলল, 'সন্ধের দিকে ভুলের মাত্রা বেড়ে এমন অবস্থা হবে না তো যে ডিনারের কথা মনে রাখা দূরে থাক, হয়তো দেখা যাবে আমাকেই আপনি চিনতে পারছেন না?'

সহাস্যে প্রতিশ্রুতি দিল পারকিন, যাই ঘটুক না কেন, তার মত সুন্দরীকে

না চিনতে পারার মত মানসিক বিপর্যয় ঘটবে না ওর। হেলেন বলল, 'কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এই ভদ্রলোকের সাথে বেশিদূর এগিয়ো না, অন্তত বিয়ের প্রস্তাব যেন দিতে না পারেন। বিবাহিত জীবনে ইনি যদি স্ত্রী মনে করে আর কাউকে জড়িয়ে ধরেন, আমি একটু আশ্চর্য হব না!' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল হেলেন, তার দেখাদেখি রোজি আর পারকিনও।

হালকা আরও দু'একটা কথা হলো। তারপর বিদায় নিল পারকিন, বলল, 'আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে।' বলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল ওখান থেকে।

হন হন করে প্লেনের সামনের দিকে এগোল পারকিন। ভাগ্যিস সময় থাকতে শুধরে নেয়া গেছে ভুলটা, তা না হলে ফ্যাসাদেই পড়তে হত তাকে। কবির চৌধুরীর যোগান দেয়া ফাইলে রানার বান্ধবীদের ফটো দেখেছে সে, কিন্তু হলপ করে বলতে পারে সেগুলোর মধ্যে এই মেয়েদের ছবি নেই। হতে পারে, রানা হয়তো এই মেয়েটির সাথে নতুন পরিচিত হয়েছে। মুশকিল হলো, পারকিন এমন কি এই মেয়ের নাম পর্যন্ত জানে না।

ফ্লাইট ডেকে পৌঁছে চেহারা খুব গম্ভীর করে রাখল পারকিন, কেউ যাতে ওর সাথে কথা বলতে উৎসাহ না পায়। কোনরকম দ্বিধা না করে নিজের সিকিউরিটি ফাইলের পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে। পিটি ফবেরের ক্রু আর প্যাসেঞ্জার লিস্টটা খুঁজে নিয়ে দ্রুত চোখ বুলাল নামগুলোর ওপর। লাল-চুলো মেয়েটা যদি হেলেন হয়, তাহলে এই মেয়েটা নিশ্চয়ই রোজি—রোজি কারভার। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

তবে, ভাবল পারকিন, আসলে এটা কোন সমস্যাই নয়। মেয়ে দুটোর কেউই প্রাণ নিয়ে জেনেভায় পৌঁছুবে না। দুঃখ হয় হেলেনের জন্যে। শালী খাসা মাল!

আপন মনে হাসল পারকিন।

'প্রাইভেট জোক, চীফ?' পারকিনের ঠোঁটে হাসি দেখে জানতে চাইল গডলিম্যান।

'আরে না,' বলল পারকিন। 'ডিনার ডেটের কথা মনে পড়ে গেল।'

'রোজি কারভার,' চোখ টিপে বলল গডলিম্যান। 'সবাইকে টেক্কা দিয়ে ওকে তুমি রাজি করালে কিভাবে তাই ভাবি। ডিনার থেকে ফিরে এসে ফুল রিপোর্ট দিতে হবে আমাকে,' আবদার করল সে।

'উঁহু!' হাসিমুখে চোখ টিপল পারকিন। 'কল্পনা করে নিও।'

ইউরেকার কন্ট্রোল রুমে রয়েছে ওরা। ওয়ার্ল্ড ম্যাপের ওপর সবুজ ফোঁটা খানিক ইতস্তত করে চলতে শুরু করল, সেইসাথে গলা চড়িয়ে সাবরিনা আর্চার বলল, 'এয়ারফোর্স ওয়ান আকাশে উঠেছে, সোহানা!'

চোখ তুলে তাকাল সোহানা। পরম স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'এবার তাহলে কফি খেতে পারি আমরা। আপাতত বিপদ কেটেছে।'

সোহানা ভয় করেছিল, প্লেন নিচে থাকতেই কিছু একটা ঘটিয়ে বসবে

কবির চৌধুরী। খোদার মর্জি সেটা যখন ঘটেনি, আশা করা যেতে পারে এয়ারফোর্স ওয়ান নিরাপদেই জেনেভায় পৌঁছুবে আর, প্লেন আকাশে থাকতে কবির চৌধুরী যদি কিছু ঘটাবার প্ল্যান করে থাকে, বাধা দেবার জন্য রানা আর রোজি তো আছেই। রানাকে কাবু করা অত সহজ নয়, প্রাণ থাকতে ওপেক মন্ত্রী বা এয়ারফোর্স ওয়ানের ক্ষতি হতে দেবে না ও। তাকে সাহায্য করবে রোজি এইসব কথা ভেবে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে চেষ্টা করল সোহানা। চেয়ার ছেড়ে উঠে এগোল দরজার দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল ও। রাশীদ সোনাইদিকে আবার মনে করিয়ে দিল, 'বোয়িঙের মনিটরিং চলতেই থাকবে, বিরতিহীন। আর, পেন্টাগনের লাইন খোলা রেখে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখো জেনারেল টমসনের সাথে। নেপলসের সায়ে রেডিও যোগাযোগ রাখছেন তিনি। ওটা আমাদের ডাবল-চেক। কোন ব্যাপারে সামান্যতম অস্বস্তিবোধ করলে সাথে সাথে খবর দেবে আমাকে। চোখের পাতা না ফেলে নজর রাখতে হবে আমাদের।'

সাবরিনাকে নিয়ে চেম্বারে ঢুকল সোহানা। জানালার দিকে পিঠ দিয়ে, নিজের [illegible] দিকে মুখ করে বসল ও। আরেক কোণে, একটা আর্মচেয়ারে গা এলি[illegible] দিল সাবরিনা। একজন ইউনিফর্ম পরা পিয়ন এসে কফি দিয়ে গেল ওদের।

'আমি বোধহয় একটু বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,' মৃদু গলায় বলল সোহানা। 'এয়ারফোর্স ওয়ানে রানা আছে, কিছু যদি ঘটেও, সামলে নিতে পারবে ও।'

ক'সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর সাবরিনা বলল, 'সেজন্যে তোমাকে দোষ দেয়া যায় না। কবির চৌধুরী যেভাবে জেল থেকে বেরিয়ে এল, আতঙ্কিত হবার জন্যে সেটা যথেষ্ট। তাছাড়া, ওপেক মন্ত্রী আর এয়ারফোর্স ওয়ান—কবির চৌধুরীর জন্যে এর চেয়ে লোভনীয় আর কি হতে পারে? তবে তুমি যেমন মনে করেছিলে বাহরাইনে কিছু ঘটবে, আমি তা মনে করিনি।'

পা দুটো সামনে মেলে দিয়ে হাইহিলের ডগার দিকে তাকাল সোহানা। 'জেনেভা?'

'হতে পারে।'

'কিন্তু আমরা সাবধান হইনি, এ কথা বলা যাবে না,' বলল সোহানা। রানাকে আগেই বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছে, অ্যাপ্রোচ আর টাচ-ডাউনের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে তাকে। সুইস সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা পাওয়া যাবে তাদের কাছ থেকে। এয়ারপোর্টে নিরাপত্তা রক্ষী থাকবে, যে-সব রাস্তা দিয়ে মেহমানরা যাবেন সে-সব রাস্তায় সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করা হবে। হোটেল আর প্রাইভেট ডিনার পার্টিতেও স্পাই, পুলিস, সিকিউরিটি গার্ড দেয়া হবে। মন্ত্রীদের কে কোথায় কখন যাবেন বা অবস্থান করবেন, তার একটা তালিকা তৈরি করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। মন্ত্রীদের সাথে যাঁরা দেখা করবেন তাঁরা আগেই অনুমতি নিয়েছেন, এবং তাঁদের প্রত্যেকের কাছে বিশেষ কার্ড পৌঁছে দেয়া হয়েছে। তিনি যে-ই

হোন, মেহমানদের কাছাকাছি পৌঁছুতে হলে কার্ড দেখতে চাওয়া হবে। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সোহানা। 'আমার তা মনে হয় না। জেনেভায় সুবিধে করতে পারবে না কবির চৌধুরী। ওখানে কিছু ঘটবে না।'

'জেনেভা প্রসঙ্গ আরও পরে আসছে,' বলল সাবরিনা। কফির কাপে দীর্ঘ একটা চুমুক দিল সে। 'তার আগে কি ঘটে দেখো।'

ঝট করে মুখ তুলল সোহানা।

'বোয়িং আকাশে থাকতে?'

ওপর নিচে মাথা দোলাল সাবরিনা।

'ধেত্তেরি!' ঝাঁঝের সাথে বলল সোহানা। 'দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করছি আমি, আর তুমি কিনা...'

বোয়িঙের স্টেটরুমে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক আরোহীর পানীয়ের অর্ডার ছোট্ট একটা প্যাডে লিখে নিল রোজি। চা, কফি, কোক এক একজন এক একটা অর্ডার দিয়েছেন। শুধু এনার্জি সেক্রেটারি ম্যালকম ফিলপট কোন অর্ডার দেননি। বাহরাইনের শেখ কফি ও কোক, দুটোই চেয়েছেন—কোক সম্ভবত তার কিশোর নাতির জন্যে। কফিতে চিনি দিতে নিষেধ করেছেন তিনি। নাতির সাথে আলাপ জমাবার রোজির চেষ্টা এবারও ব্যর্থ হয়ে গেছে। যতটুকু বুঝতে পারছে রোজি, নিজেকে একেবারে ছোট্টটি ভাবতে রাজি নয় ছেলেটা, রোজি তাকে খোকা বলাতেই বোধহয় তার সদ্য জাগা পৌরুষে আঘাত লেগেছে, তা না হলে রোজির সাথে তার এই নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা আচরণের আর কি কারণ থাকতে পারে? ছেলেটাকে চকলেট সাধতে গিয়ে রীতিমত একটা হোঁচট খেয়েছে সে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফারুক ঠাণ্ডা সুরে জানিয়ে দিয়েছে তাকে, 'ওসব আমি খাই না।' কথাটা অবশ্য নিখুঁত উচ্চারণে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলেছে সে।

ভাগ্যিস শেখ জাহিদ আল খালিদের চোখে পড়েনি ব্যাপারটা। নাতির ব্যবহার লক্ষ্য করে তিনি হয়তো অসন্তুষ্ট হতে পারতেন, একটা অস্বস্তিকর দৃশ্যের অবতারণা হতে পারত।

দশ মিনিট পর ট্রলি নিয়ে আবার স্টেটরুমে ঢুকল রোজি। ম্যালকম ফিলপটের সাথে এখনও দাবা খেলছেন বাহরাইনী শেখ। ট্রলি থেকে সবাইকে যার যার পানীয় পরিবেশন করল রোজি। একটু অবাক হলো, যখন দেখল, বাহরাইনী শেখ নিজে কোক নিয়ে নাতিকে দিলেন কফি। ছেলেটা চিনি ছাড়া কফি খায় কেন?

দশ মিনিট পর অনেকগুলো ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। রোজি মনে করেছিল নাতির আচরণ লক্ষ্য করেননি শেখ জাহিদ আল খালিদ, সেটা ঠিক নয়। ইঙ্গিতে কাছে ডেকে বাহরাইনী শেখ ওকে বললেন, 'আমার নাতি চকলেট না নেয়ায় তুমি হয়তো অস্বস্তিবোধ করছ, মিস রোজি। না-না, আমাকে বাধা দিয়ো না। ওর বয়সী ছেলেদের কাছে জীবন অত্যন্ত রোমাঞ্চকর আর মধুর, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ওর জন্যে সেটা সত্যি নয়।'

এনার্জি সেক্রেটারি একটু বিস্ময় আর উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলেন, 'কেন?'

'ফারুক টয়লেটে গেছে, এই সুযোগে কথাটা জানিয়ে দিই তোমাকে,' রোজিকে বললেন বাহরাইনী শেখ। 'ফারুক ডায়াবেটিসে ভুগছে। ওর মেডিক্যাল অ্যাডভাইজার ওকে মিষ্টি খেতে নিষেধ করেছেন।'

'এই বয়সে...দুঃখজনক,' বিড়বিড় করে বললেন ম্যালকম ফিলপট।

'আমি দুঃখিত, মি. খালিদ,' বলল রোজি। 'আমি যদি জানতাম...'

'তোমাকে ডেকে কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো, ফারুকের আচরণে আমি দুঃখ পেয়েছি সেটা তোমাকে জানানো,' বললেন শেখ। প্রসঙ্গ পালটে জানতে চাইলেন, 'আমার একটা উপকার করতে পারবে?'

'ইয়েস, স্যার!' সাগ্রহে বলল রোজি।

বাহরাইনী শেখ জানতে চাইলেন, এয়ারফোর্স ওয়ানে তাঁদের সাথে কোন ডাক্তার আছে কিনা। দুঃখ প্রকাশ করে রোজি তাঁকে জানাল, প্রেসিডেন্ট ভ্রমণ করার সময় তাঁর সাথে একজন ডাক্তার সাধারণত থাকেন বটে, কিন্তু এবারের এই ফ্লাইট অল্প সময়ের বলে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয়নি। তবে, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছুই নেই। সে নিজে একজন কোয়ালিফায়েড প্যারামেডিক। ফারুকের যদি কিছু দরকার হয়, সাহায্য করতে পারলে খুশি হবে সে।

ধন্যবাদ জানালেন বাহরাইনী শেখ। বললেন, 'তাহলে বোধহয় এই জিনিসটার দায়িত্ব তোমার ঘাড়েই চাপানো উচিত।' টেবিল থেকে একটা লেদার ব্যাগ তুলে রোজির হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি।

ব্যাগের মুখ খুলে ভেতরে তাকিয়ে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ আর ইনসুলিন ক্যাপসুল দেখতে পেল রোজি। 'ঠিক আছে, স্যার। এ নিয়ে আপনাকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

শেখের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে স্টেটরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন ম্যালকম ফিলপট, তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে হাসি চাপল রোজি। লক্ষ করল, এনার্জি সেক্রেটারির সাথে বেরিয়ে গেল এয়ারম্যান হেলেনও। নিজের প্রাইভেট কেবিনে ঢুকবেন এনার্জি সেক্রেটারি, সেখানে তাঁকে স্কচ হুইস্কি পরিবেশন করবে হেলেন। মুসলিম মেহমানদের সামনে ওই জিনিস তিনি ছুঁতে পারেন না।

স্টেটরুমের একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল পারকিন। রোজির কপালে চিন্তার অস্পষ্ট রেখা পড়ল।

সেই ঘটনাটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি ও। রানার ব্যাখ্যা হেলেন সত্যি বলে মেনে নিয়েছে, কিন্তু রোজি পারেনি। কাজের চাপ যতই থাক, একজন লোক হেলেনকে রোজি আর রোজিকে হেলেন বলে কিভাবে ভুল করতে পারে? এই ঘটনা তার আত্মসম্মানেও আঘাত দিয়েছে। প্রথম দর্শনে রানার প্রতি যে আকর্ষণ বোধ করেছিল সে, তার অর্ধেকও অবশিষ্ট নেই। একেবারে যে হতাশ হয়ে পড়েছে তা নয়, কিন্তু এই ক্ষত সারাবার জন্যে রানা যদি কোন চেষ্টা না করে, কিংবা আবার যদি এই ধরনের কিছু ঘটে, এই

লোকের কথা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করবে রোজি।

খানিক আগে রানা সম্পর্কে প্রশ্ন করার একটা সুযোগ পেয়েছিল রোজি। চীফ স্টুয়ার্ড পিটি ফবের বলছিল, মাসুদ রানাকে অনেক আগে থেকেই চেনে সে। কথার পিঠে কথা তুলে রোজি জানতে চাইল, 'ভদ্রলোকের মেজাজ বা স্মৃতিশক্তি কি রকম?'

কোন কিছু সন্দেহ করেনি চীফ স্টুয়ার্ড। হেসেছে। জানাল, 'প্রথমটার ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করব না, কিন্তু দ্বিতীয়টার ব্যাপারে বলব, মাসুদ রানার সাথে লেটেস্ট কমপিউটরের খুব একটা পার্থক্য নেই। কিছুই ভোলে না সে। তবে কাজের সময় সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যায়, এমন কি তোমার মত সুন্দরী মেয়েও তখন ওর দৃষ্টি কাড়তে পারবে না।'

কপালে চিন্তার ক্ষীণ রেখা নিয়ে স্টেটরুমের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে রোজি, নরম কার্পেটে হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। তাই কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ঘুরে তাকাতেই দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যাসিল গডলিম্যান। 'ভূত নই,' বলে হাসল সে।

'দুঃখিত,' বলল রোজি। 'আমি আসলে এ জগতে ছিলাম না।'

'আশ্চর্য ব্যাপার তো!' গডলিম্যানের চেহারা থেকে মুছে গেল হাসি। 'এই ট্রিপে অনেকেই দেখছি ছুতো পেলেই আরেক জগৎ থেকে বেড়িয়ে আসছে!'

'মানে?' পরিষ্কার কোন কারণ ছাড়াই অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠল রোজি। 'ও-কথা বললেন কেন?'

রোজিকে হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে উঠতে দেখে অস্বস্তি বোধ করল গডলিম্যান। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বলল, 'না, তেমন কিছু না...।'

কিন্তু রোজি ছাড়ল না তাকে। কেন যেন তার মনে হলো, ব্যাপারটা ওর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তার জেদ বাড়ছে লক্ষ করে অগত্যা মুখ খুলতে রাজি হলো গডলিম্যান।

বলল, 'আসলে সামান্য ব্যাপার, কিন্তু ঘটনাটা ঘটার সময় অদ্ভুত লেগেছিল আমার। তুমি যেমন বললে, এ-জগতে ছিলে না, আমার বসও আমাকে টেলিফোনে ঠিক এই কথাই বলেছিল।'

'রানা?'

মাথা ঝাঁকাল গডলিম্যান। 'হ্যাঁ।'

'টেলিফোনে মানে...উনি বাহরাইনে থাকতে?' উত্তেজনা বোধ করছে রোজি। 'ঠিক কি ঘটেছিল বলুন তো?'

আবার বলল গডলিম্যান, 'ব্যাপারটা সিরিয়াস কিছু না।' হোটেলের নিচে থেকে টেলিফোন করেছিল সে, ফোন ধরেছিল রানাই, কিন্তু অনেকক্ষণ কোন সাড়া দেয়নি সে। 'মনে হচ্ছিল আমি যেন কোন দেয়ালের সাথে কথা বলছি।'

খুব সাবধানে, এক একটা শব্দ নির্বাচন করে জানতে চাইল রোজি, 'রানা কি আপনাকে চিনতে পারছিল না?'

বিস্মিত দেখাল গডলিম্যানকে। বলল, 'হ্যাঁ। ঠিক তাই। অন্তত প্রথম দিকে তাই মনে হয়েছিল আমার—কার সাথে কথা বলছে তা যেন বুঝতে

পারছিল না ও।'

ফ্লাইট ডেক। সীটে হেলান দিয়ে প্যাট্রিক হলকে নির্দেশ দিল বিগ হার্ভে, 'পজিশন জানার জন্যে নেপলসের সাথে যোগাযোগ করো।'

হুক থেকে মাইক্রোফোনের মাউথ পিস তুলে নিয়ে পাইলট বলল, 'নেপলস কন্ট্রোল। এয়ারফোর্স ওয়ান কলিং নেপলস কন্ট্রোল।'

সাড়া দিল নেপলস কন্ট্রোল।

পাইলট বলল, 'উই আর ক্রসিং টোয়েনটি ফোর ডিগ্রীজ ইস্ট অ্যাট ফ্লাইট লেভেল টু হানড্রেড এইটি অ্যান্ড ইস্টিমেটিং টোয়েনটি-টু ডিগ্রীজ ইস্ট অ্যাট থারটি-ওয়ান।'

নেপলস কন্ট্রোল জানাল, 'রোভার, এয়ারফোর্স ওয়ান, তোমাকে আমি স্ক্রীনে পেয়েছি। কল অ্যাট টোয়েনটি-টু ডিগ্রীজ ইস্ট।'

এয়ারফোর্স ওয়ানের কয়েকশো মাইল দূরে, রানওয়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একটি বোয়িং। এড্রিয়াটিক সাগরের তীরে রানওয়ের একেবারে শেষ প্রান্তে চুপচাপ বসে আছে প্লেনটা।

প্লেনের চারদিকে এবং ভেতরে, কোথাও আলো নেই। আকাশে ঘন মেঘ জমেছে। ওপর থেকে তাকালে মাটির ওপর একটা ছায়া ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না ওটাকে।

হঠাৎ করেই একসাথে জ্বলে উঠল দশ বারোটা গাড়ির হেডলাইট। তার মধ্যে জীপ, কার, ছোট পিকআপ লরিও রয়েছে। উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল একটু একটু ধুলো উড়ছে বাতাসে।

জ্যান্ত হয়ে উঠল প্লেনের এঞ্জিন। ধীর কিন্তু সগর্ব ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে আলোর মাঝখানে থাকল সেটা।

আট

এয়ারফোর্স ওয়ানের সাথে এই বোয়িঙের আকার-আকৃতি বা আঙ্গিক কাঠামোগত কোন অমিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। বাইরের সজ্জা বা পরিচ্ছদ, দুটো প্লেনের একই রকম। প্রেসিডেনশিয়াল প্রতীক চিহ্ন, ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা লেখাটা, সাদা ফিউজিলাজ, কালো-নীল নাক, ম্লান নীল পেট আর এঞ্জিন কাউলিং—সব এক।

রানওয়ের আরেক প্রান্তে, সাগরের পাশে, নিজের গাড়িতে বসে আছে কবির চৌধুরী। আকাশে ওড়ার প্রস্তুতি লগ্নে বিশাল বোয়িংটা ধেয়ে আসছে তার দিকে, চেহারায় আত্মতৃপ্তির উজ্জ্বল ভাব নিয়ে সেটার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে সে।

পার্টনার হিসেবে কে.জি.বি-কে সাথে নেবার পর বড় ধরনের এই একটা উপকারই করেছে তারা–এয়ারস্ট্রিপটা ম্যানেজ করে দিয়েছে কবির চৌধুরীকে। ফোর থাউজ্যান্ড ফাইভ হানড্রেড-প্লাস ফিটের এই এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করা হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, যুদ্ধের পর থেকে এটাকে আর ব্যবহার করা হয়নি। জায়গাটা যুগোশ্লাভিয়ার ডালমাটিয়ান উপকূল এলাকায়, জাডার আর সাইবেনিকের মাঝখানে।

প্ল্যানটা যখন মাথায় আসে তখন থেকেই একটা ব্যাপারে সচেতন ছিল কবির চৌধুরী–প্রেসিডেন্টের প্লেন চুরি করে কোন ধনতান্ত্রিক দেশে নিয়ে যাওয়া চলবে না, নিয়ে যেতে হবে ঈস্টার্ন ব্লকের কোন দেশে। কিন্তু টিটো মারা গেলেও, যুগোশ্লাভিয়া তার জন্যে নিষিদ্ধ এলাকা।

রাশিয়ানদের জন্যে তা নয়। দাবি মেনে নিয়ে ঠিক যে ধরনের রানওয়ে ওর দরকার, ব্যবস্থা করে দিয়েছে তারা। যে ক'জন লোক দরকার, তাও জোগাড় করে দিয়েছে। রানওয়ের ওপর দাঁড়ানো গাড়িগুলোর ড্রাইভিং সীটে বসা লোকজন, সেই সাথে এই মুহূর্তে বাহরাইনে যারা মাসুদ রানাকে পাহারা দিচ্ছে–এদের সবাইকে উগ্র বাম ও রাশান পন্থী পার্টিজান গ্রুপ থেকে বেছে নেয়া হয়েছে। যুগোশ্লাভ সরকার বা আইনকে পরোয়া করে না এরা, এদের ঘাঁটি রয়েছে কাছাকাছি একটা দুর্গম পাহাড়ে। এই অপারেশনের শেষ পর্যায়ে, কবির চৌধুরী যখন ওপেক মন্ত্রী আর মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারিকে জিম্মি রেখে মোটা টাকা আদায় করবে, এই গ্রুপটা সশস্ত্র গেরিলা দিয়ে সাহায্য করবে তাকে। যদিও, এরই মধ্যে, গ্রুপ কর্তৃপক্ষ তার ব্যাপারে একটু বেশি বেশি নাক গলাতে শুরু করেছে। কবির চৌধুরী ভাবল, কে.জি.বি-র ইঙ্গিতে নয় তো? সে জানে, এই গ্রুপটাকে তারাই ট্রেনিং দেয়, নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে।

প্লেনটা কোথাও থেকে চুরি বা ছিনতাই করেনি কবির চৌধুরী! এটা আসলেই একটা সাতশো সাত বোয়িং, যদিও ইউ.এস.এফ যাকে স্ট্র্যাটোলাইনার বলে, এটা সে জিনিস নয়। পুরানো একটা কার্গো ফ্রেটার খুঁজছিল সে, ভাগ্যগুণে পেয়েও গেছে। সচল থাকার দিন ফুরিয়ে এসেছে প্লেনটার, কিন্তু কবির চৌধুরীর কাছে খুব ভালই চলবে। খুব সস্তায়, একেবারে পানির দরে কিনেছে সে এটা। মেজেঘষে, রঙ চড়িয়ে একেবারে ঝকঝকে, নতুন করে তুলেছে। কাঠামোর কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি।

পিছনে বিশাল ছায়া নিয়ে কবির চৌধুরীর গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে গেল বোয়িং। এঞ্জিনের কান-ফাটানো গর্জন ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না কিছুক্ষণ। তারপর আকাশে উঠে গেল প্লেন।

গাড়িতে স্টার্ট দিল কবির চৌধুরী। মনে মনে ভাবল, এরপর ব্যাপারটা নির্ভর করছে রাশিয়ান আর তাদের ইটালিয়ান বন্ধুদের ওপর। খবরের অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর কিছু করবার নেই তার।

জুরিখ দূতাবাসের রেডিওরুমে পায়চারি করছে জেনারেল। বেলগ্রেড থেকে যুগোশ্লাভ ভাষায় মেসেজ আসছে, সাথে সাথে অনুবাদ করে জেনারেলকে

শুনিয়ে দিচ্ছে অপারেটর।

পায়চারি থামিয়ে হাতঘড়ি দেখল জেনারেল, তারপর মুখ তুলে তাকাল রাসকিনের দিকে। রেডিও অপারেটরের দিকে ঝুঁকে রয়েছে রাসকিন, একটা প্যাডে নোট নিচ্ছে। প্রকাণ্ড মাথা উঁচু করে পুরু ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে তুলল সে, বলল, 'কংগ্র্যাচুলেশনস, কমরেড। সবকিছু প্ল্যান মতই চলছে। মানে, আমাদের প্ল্যান মত, যদিও কবির চৌধুরীর এখনও ধারণা, এটা তারই প্ল্যান।'

কথা বলল না জেনারেল, শুধু চোখের পাতা অলস ভঙ্গিতে বন্ধ করে খুলল একবার। এটা তার একটা প্রিয় অভ্যেস, সায় বা সমর্থন দেয়ার জন্যে ব্যবহার করে।

আরও কাছে সরে এল রাসকিন। 'কিন্তু একটা ব্যাপারে খুঁতখুঁত করছে মন। মাসুদ রানাকে বাঁচিয়ে রেখে আমাদের লাভ কি? আমাদের জন্যে একটা হুমকি ও। মেরে ফেলতে অসুবিধে কোথায়?'

ভুরু কুঁচকে জেনারেল কামচিন বলল, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। রানা ছাড়া অন্য কেউ হলে এতক্ষণ মেরে ফেলা হত ওকে। কিন্তু তুমি অনেক কিছু জানো না।'

'জ্বী।'

'ইউনাকোর কথাই ধরো,' আবার বলল জেনারেল। 'ওটা চালাবার জন্যে আমরাও মোটা চাঁদা দিই, কিন্তু আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবার প্রবণতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে ওদের। ইউনাকো সম্পর্কে, তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা আছে রানার। তুমি কি মনে করো, তথ্যগুলো ওর কাছ থেকে জেনে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না?'

'অবশ্যই!'

'তারপর ধরো, পেন্টাগন, ইউ.এস এ.এফ, এয়ারফোর্স ওয়ান—এসব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে আজও আমরা কোন মার্কিন অফিসারকে মুঠোয় ভরতে পারিনি। রানা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক না হয়েও এসব সম্পর্কে অনেক কিছু জানে, সে-সব যদি ওর কাছ থেকে আদায় করা যায়, মন্দ কি?'

'তা তো বটেই!'

'আমাদের সাফল্য সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে, অ্যালেক্স?' হঠাৎ, এই প্রথম, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের জেনারেল কামচিনকে সামান্য একটু উত্তেজিত হতে দেখল রাসকিন। 'বাংলাদেশের এমন একজন এজেন্টকে আমরা ধরেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক গোপন আস্তানায় বহুদিন যাতায়াত আছে যার, নতুন সি.আই.এ. চীফের সাথে খাতির আছে যার, যুক্তরাষ্ট্রের অনেক গোপন সামরিক এবং ইন্টেলিজেন্স তথ্য যার নখদর্পণে। অথচ এই লোককে যে আমরা ধরেছি, তা না জানে বাংলাদেশ, না জানে যুক্তরাষ্ট্র। রানাকে শুধু যে মুঠোয় পেয়েছি তাই নয়, তার বদলে আরেকজনকে মাঠে নামিয়েছি আমরা, যাকে দেখে রানা বলে মনে করবে সবাই। শুধু এই একটা কাজে কেন, পারকিনকে দিয়ে আমরা রানার ভূমিকায় আরও অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারব।'

'জ্বী, তা পারব।'

'এই অপারেশনে আমাদের রানা অর্থাৎ পারকিনের সুনাম আরও অনেক বাড়বে,' বলল জেনারেল কামচিন। 'খবরের কাগজে বড় বড় হেডিঙে খবর বেরুবে—"এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাক নাটকের হিরো"। "ফরাসী সরকার যে ক্রিমিন্যালকে কাবু করতে পারেনি, সেই কুখ্যাত কবির চৌধুরীকে একক প্রচেষ্টায় ধ্বংস করেছে এই বাংলাদেশী যুবক"।'

'হোয়াট!' উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রাসকিনের। 'এই প্ল্যান করা হলো কখন?'

ঠোঁট মুচকে একটু হাসল জেনারেল। বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে বলেছে মস্কো। নয় কেন? কবির চৌধুরী যদি আমাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়, তার জন্যে আমাদেরকে যদি অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয়, কে বলেছে তবু তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে?'

'কিন্তু প্ল্যানটা কিভাবে করা হয়েছে, জেনারেল?'

'বিদ্রোহী গ্রুপ আর আমাদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবে পারকিন,' বলল জেনারেল। 'কবির চৌধুরী যখন কোন গোলমাল বা হামলা আশা করছে না, ঠিক সেই সময় আঘাত হানবে সে।'

'কিন্তু কবির চৌধুরী মারা গেলে তার আদায় করা টাকার কি গতি হবে?'

'কেন, আমরা রয়েছি কি করতে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল জেনারেল। 'কে.জি.বি. কি টাকা খরচ করতে জানে না?'

অন্ধকার ঘর থেকে দু'বার বেরুতে পারল রানা। একবার প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার সময়, আরেকবার সন্ধের খানিক আগে বাগানের তাজা বাতাসে হাঁটাচলা করে শরীরের আড়ষ্টতা কাটাবার জন্যে। দু'বারই কড়া প্রহরার ব্যবস্থা ছিল। শুধু যে সশস্ত্র গার্ড তা নয়, সাথে ভয়াল দর্শন প্রকাণ্ড একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুরও থাকল। অস্বাভাবিক লম্বা লোহার মোটা চেইন দিয়ে বাঁধা। সায়েদের খুব ভক্ত সে, ইঙ্গিত পেলেই রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শেখের প্রাসাদের ভেতর হলেও, আহমেদ কায়ামের এই বাড়ি একধারের আলাদা একটুকরো জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, প্রাসাদের সাথে এর কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই। বাড়িটা দোতলা। ট্রাফিকের আওয়াজ থেকে বোঝা যায়, রাস্তা থেকে দূরে নয়। বাড়ির সামনের দিকে মুখ করা দোতলার একটা ঘরে রাখা হয়েছে ওকে। শুধু এই একটা ঘরের জানালাই ওয়েল্ডিং করে বন্ধ করা।

বাড়ির ভেতর আরো তিনটে বেডরূম আর দুটো বাথরূম লক্ষ করেছে রানা, বৈঠকখানা বোধহয় নিচের তালায়। আহমেদ আর ফিরে আসেনি। গার্ড রয়েছে দু'জন, একজন বাগানে টহল দেয়, আরেকজন ঘরের বাইরে পাহারায় থাকে—এরা বিদেশী, কিন্তু কোন্ দেশের জানতে পারেনি ও। বাহরাইনী রয়েছে একজনই, সায়েদ। বাকি দু'জনের মধ্যে একটা হলো কুকুর, অপরজন মেনিলথিন।

অনেকভাবে পালাবার ফন্দি এঁটেছে রানা, কিন্তু কোনটাতেই সফল হবার

সম্ভাবনা দেখতে পায়নি। মেনিলথিন আর গার্ডরা জানে, প্রথম সুযোগেই পালাবার চেষ্টা করবে ও, তাই অত্যন্ত সতর্ক, কোন সুযোগ দিতে রাজি নয়। দুটো পেইন-কিলার ট্যাবলেট খেয়ে শরীরের ব্যথা একটু কমেছে ওর। মেনিলথিনকে ডাক্তার ডেকে আনতে বলেছিল ও, তার বদলে এই ট্যাবলেট জুটেছে কপালে।

সন্ধের একটু পর বাগান থেকে নিজের ঘরে ফিরল ও। অন্ধকার ঘর। আলো জ্বালা নিষেধ। বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তালা পড়ল।

বিছানায় বসে চিন্তা করছে রানা। তিন মিনিটের মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। দরকার হলে প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেবে, তবু মাঝরাতের আগেই এখান থেকে পালাবে সে। পালাবার নিরাপদ কোন উপায় নেই তা ঠিক, কিন্তু বিপদ-সংকুল উপায় সব সময়ই থাকে—ঝুঁকি নিতে পারলেই হয়। ওপেক মন্ত্রীদের মেরে ফেলা হবে, এই বিশ্বাস গেঁথে গেছে ওর মনে। তাঁদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে হলে, নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে প্রথমেই বেরুতে হবে এখান থেকে।

একটা শব্দ শুনে অবাক হলো রানা। এই শব্দ আগে পায়নি ও, এখানে পাবে বলে আশা করেনি। টেলিফোন বেজে উঠল। মনে হলো নিচে থেকে আসছে আওয়াজটা।

দু'মিনিট পর দরজার তালা খোলার শব্দ। আগের মতই সাবধানে ঘরে ঢুকল মেলিনথিন। গার্ডকে টর্চ জ্বালতে বলে প্রথমে দেখে নিল কোথায় আছে রানা, তারপর সুইচ অন করে শেড লাগানো বালবটা জ্বালল। এর আগে রানাকে নিষেধ করে দিয়ে গেছে সে, নিরাপত্তার খাতিরে ঘরের আলো জ্বালতে পারবে না ও। কারণটা আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে হয়নি রানার, সম্ভবত রাস্তা থেকে দেখা যায় বাড়িটা। ঘন ঘন আলো জ্বেলে মোর্স সিগন্যাল পাঠানো সম্ভব, কাজেই ঝুঁকিটা নিতে পারে না মেনিলথিন।

হাবভাব দেখে মনে হলো, ফুর্তিতে আছে লোকটা। 'তোমার জন্যে খবর আছে, মেজর রানা,' বলল সে। 'খুব বেশি দেরি নেই, এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে।'

'কোথায়?'

এমন ভাব করল, রানার কথা যেন শুনতে পায়নি, বলে চলল মেনিলথিন, 'আমার বন্ধুরা লোক পাঠাবেন, তারা তোমাকে জাহাজে করে নিয়ে যাবে।'

'সোজা রাশিয়ায়?' ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল রানা।

'হতে পারে, আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, আমার বন্ধুরা তোমার সাথে নিজেদের জন্য নিরাপদ কোন জায়গায় বসে কথা বলতে চান।'

'কিন্তু আমি চাই কিনা সেটা একটা প্রশ্ন নয়?'

'নিজের ভাল পাগলেও বোঝে, তুমি বুঝবে না কেন?' বলল মেনিলথিন। 'আমার বন্ধুরা তোমার সাথে কথা বলতে চান, এ তো তোমার সৌভাগ্য হে! ওদের কথামত চললে তুমি যে শুধু প্রাণে বেঁচে যাবে তাই নয়, জীবনে তোমার কোন অভাব থাকবে না।'

হাসি পেল রানার। 'ধন্যবাদ।'

'আরেকটা কথা। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোকজন আসার আগে এই ঘর থেকে বেরুতে চেয়ো না,' বলল মেনিলথিন। 'মিস্টার চৌধুরী খবর দিয়েছেন, আরও লোক দরকার তাঁর, কাজেই দু'জন গার্ডকে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

'কোথায়?' না চাইতেই গড় গড় করে অনেক তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছে লোকটা, আরও কিছু আদায় করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখল রানা।

'আমাদের অপারেশন্যাল বেসে,' এর বেশি কিছু বলল না মেনিলথিন। সম্ভবত রানার উদ্দেশ্য টের পেয়ে গেছে সে।

'গার্ডদের নিয়ে যাচ্ছ শুনে মন খারাপ হয়ে গেল,' বলল রানা। 'বোঝোই তো, ওদের সাথে আমার গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। আজ সারারাত ঘুমুতে পারব না আমি।'

ব্যঙ্গ গায়ে মাখল না মেনিলথিন। গার্ডদের পিছনে নিয়ে দরজার দিকে এগোল সে।

'গায়ে যা উৎকট গন্ধ,' পিছন থেকে রাশান ভাষায় বলল রানা, 'তোমরা দু'জন ঠিক যেন একজোড়া শুয়োরের বাচ্চা।'

কাজে লেগে গেল কৌশলটা। মেনিলথিন বাধা দেবার আগেই বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়াল গার্ড দু'জন, তাদের মধ্যে কম বয়েসীটা রানার মুখ লক্ষ্য করে রাইফেল তাক করল, অপরজনের মুখ থেকে ব্রাশ ফায়ারের মত বেরিয়ে আসছে অশ্রাব্য খিস্তি।

কোমরের ধাক্কায় রাইফেলধারীকে টলিয়ে দিল মেনিলথিন, তা না হলে লোকটা বোধহয় রানার মুখের ওপর গুলি করে বসত। মেনিলথিনের নির্দেশে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল গার্ড দু'জন।

এই সুযোগে ওদের ওপর লাফিয়ে পড়তে পারত রানা, কিন্তু বাড়িতে মাত্র একজন গার্ড আর কুকুরটা থাকবে জানার পর ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও।

গার্ডদের চেহারা দেখে ওদেরকে জার্মান বা রাশিয়ান বলে সন্দেহ হয়েছিল ওর। খিস্তি শুনে ভুলটা ভাঙল। দু'জনেই ওরা যুগোশ্লাভিয়ার লোক।

এয়ারফোর্স ওয়ানের শিডিউলের সাথে যুগোশ্লাভিয়ার কোন সম্পর্ক নেই, আবার আছেও। সুইজারল্যান্ডে যাবার পথে সবচেয়ে নিরাপদ রুটটা যদি বেছে নেয় বিগ হার্ভে, বোয়িং যে কোর্স ধরে এগোবে তার ঠিক পাশেই পড়বে যুগোশ্লাভিয়া। এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাক করে কোথাও তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে হলে যুগোশ্লাভিয়ার চেয়ে আদর্শ জায়গা আর পাবে না কবির চৌধুরী।

রাগ সামলানো চেহারা নিয়ে রানার দিকে তাকাল মেনিলথিন, গম্ভীর সুরে বলল, 'তোমাকে বোকা মনে করেছিলাম আমি, সেটা আমার একটা ভুলই হয়েছিল।'

মৃদু হেসে জবাব দিল রানা, 'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু এই তথ্য জেনে তোমার কোন ফায়দা নেই,' হিংস্র হয়ে উঠল মেনিলথিনের চেহারা। 'আসল কথাটা তোমাকে এতক্ষণ বলিনি...'

'সেটা কি, আমি জানি,' বলল রানা।

'জানো না,' দাঁতে দাঁত চাপল মেনিলথিন, বলল, 'এখান থেকে পালাতে পারবে, সে-আশা করে থাকলে ভুলে যাও। ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছি আমি। কিন্তু আসল কথা তা নয়। তোমাকে আমি মিথ্যে বলেছিলাম। সত্যি কথাটা হলো, তথ্য দিতে রাজি হলে রাশিয়ানরা তোমাকে আরও ক'দিন আরামে থাকতে দেবে, না দিলে, টরচার করে আদায় করবে ওরা। যেভাবেই হোক, তথ্য আদায় হবার পর, ওরা প্ল্যান করেছে, তোমাকে কুকুরের মত গুলি করে মারবে।'

রানার জন্যে এটা কোন অপ্রত্যাশিত খবর নয়। এই রকম কিছু একটা আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে ও।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে নিষ্ঠুর হাসি দেখা গেল মেনিলথিনের ঠোঁটে। 'তোমার যখন খেলার শখই হয়েছে, একজন সাথী দিয়ে যাচ্ছি ঘরের ভেতর–মন ভরে খেলতে পারবে তার সাথে।' বলে গার্ডদের নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কিন্তু বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগানো হলো না। দু'মিনিট পর একজন গার্ডকে নিয়ে কামরায় ঢুকল সায়েদ, সাথে কুকুর। নিজের কোমরে জড়ানো ভারী চেইনটা খুলল সে, এই ফাঁকে দরজার ফ্রেম আর দেয়ালের মাঝখানে বড়সড় একটা লোহার গজাল গাঁথল গার্ড। চেইনের এক মাথায় হুক, সেটা লাগানো হলো কুকুরের গলায় চামড়ার বেল্টের সাথে। চেইনের আরেক মাথা আটকানো হলো গজালের সাথে।

নোংরা দাঁত বের করে রানার মুখের ওপর হাসল সায়েদ। 'চেইন দেখে বুঝতেই পারছ, ঘরের সবখানে যেতে পারবে ও। তোমার জায়গায় আমি হলে, একচুল নড়তাম না। ডিনার খাওয়ার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে ওর, কিন্তু আজ আর খাবার দেব না ওকে। আলোটা জ্বালাই থাক, তাতে অন্তত ওকে তুমি আসতে দেখবে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল ওরা। মুখ ব্যাদান করে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে, রানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল অ্যালসেশিয়ান। বিছানার ওপর শক্ত কাঠ হয়ে শুয়ে আছে রানা, চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে থাকল প্রতিপক্ষের দিকে।

অবশেষে হার মানল কুকুর, মস্ত একটা হাই তুলে মেঝেতে পেট দিয়ে শুলো, থাবার ওপর থুতনি রেখে। কিন্তু চোখ দুটো খোলা, ধারালো সাদা দাঁতের ফাঁকে জিভ দেখা দিচ্ছে ঘন ঘন।

বাড়ির সদর দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল রানা। একটু পরই গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ ভেসে এল। অস্পষ্ট গলা পাওয়া গেল মেনিলথিনের, 'শালার দিকে খেয়াল রেখো, সায়েদ। এদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে ফেরত আসছি আমি।'

তার মানে, বাড়িতে লোক বলতে থাকল একজন, সায়েদ। আর তার কুকুর। পরীক্ষা করার জন্যে মাথা একটু তুলল রানা। আলোর একটা ঝলকের

মত উঠে দাঁড়াল অ্যালসেশিয়ান, দাঁত বের করে হিংস্র করে তুলল চেহারা।
আধঘণ্টা সময় আছে। মেনিলথিন ফিরে আসার আগেই এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে। সবার আগে কাবু করতে হবে কুকুরটাকে।
কিন্তু কিভাবে?

নয়

রাগে গজগজ করছে কমান্ডার বিগ হার্ভে। এই ফ্লাইট প্ল্যান তার নিজেরই তৈরি করা, কিন্তু নানা রকম বাধা নিষেধ থাকায় নিজের পছন্দসই রুট বেছে নিতে পারেনি সে। এয়ারফোর্স ওয়ান কখনও বেশ নিচে দিয়ে, কখনও অনেক ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। তাও সোজা-সরল রেখা ধরে নয়, কোর্স ফলো করার জন্যে একরকম সাপের মতই এঁকেবেঁকে এগোতে হচ্ছে বোয়িংকে।
প্ল্যান তৈরি করার আগে তাকে বলা হয়েছিল, রাজনৈতিক কারণে কয়েকটা দেশের ওপর দিয়ে এয়ারফোর্স ওয়ান উড়ে যেতে পারবে না। তাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা আছে। এয়ারফোর্স ওয়ানেরও কিছু সুবিধে-অসুবিধে আছে, যে কারণে বিগ হার্ভে নিজেই কয়েকটা দেশকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। ফলে আঁকাবাঁকা, উঁচু নিচু একটা ফ্লাইট প্ল্যান তৈরি না করে উপায় ছিল না কমান্ডারের। শুধু যদি প্রেসিডেন্ট একা থাকতেন প্লেনে, আরও নিরাপদ এবং জটিল একটা কোর্স ধরে এগোত এয়ারফোর্স ওয়ান।
সীমান্ত পেরিয়ে বন্ধু দেশ মিশরের ওপরে চলে এল বোয়িং, সেই সাথে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল কমান্ডার। পাইলট প্যাট্রিক হল আগের মতই নিরুদ্বিগ্ন, কবি-কবি চেহারায় স্মিত হাসি লেগে আছে। সুয়েজের দিকে কোর্স অ্যাডজাস্ট করল সে, স্টার বোর্ডের দিকে পোর্ট সাঈদ আর পোর্টের দিকে কায়রোকে রেখে পেরিয়ে এল খাল, আলেকজান্দ্রিয়ার ওপর দিয়ে বেরিয়ে এল মেডিটেরেনিয়ানে। নিচে ঝলমল করছে নীল পানি। শুনতে পেল মেহমানদের উদ্দেশে এই এলাকার জিয়োগ্রাফি আর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা ব্রডকাস্ট করছে কমান্ডার।
স্টারবোর্ডের দিকে ক্রিট দ্বীপ দেখতে পেল হল, ফ্লাইট প্ল্যান অনুসরণ করার জন্যে দিক বদল করল সে। বলকান রাষ্ট্রগুলোর ওপর দিয়ে এড্রিয়াটিক সাগরের দিকে যাবে না বোয়িং, সিসিলি পেরিয়ে মেডিটেরেনিয়ানের সী-রুট ধররে, ইতালির উপকূলে না পৌঁছানো পর্যন্ত কোর্স বদল করবে না, তারপর জেনোয়ার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে সীমান্ত পেরোবে, নামতে শুরু করবে জেনেভা এয়ারপোর্টে।
ওদিকে নকল এয়ারফোর্স ওয়ানও তার সাইটে, পোর্টের দিকে আবছাভাবে দেখতে পেল ক্রিট দ্বীপটাকে। খুব নিচে দিয়ে, রাডার স্ক্রীনের নাগালের বাইরে থেকে এড্রিয়াটিক সাগরের দিকে উড়ে যাচ্ছে বোয়িংটা। প্রেসিডেন্টের

এয়ারফোর্স ওয়ানের সাথে প্রায় সমান্তরাল একটা রেখার ওপর রয়েছে সেটা। অবশ্য কবির চৌধুরীর স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিতে দেরি আছে এখনও।

স্ট্র্যাটোলাইনারের রেস্টরুম কেবিনটা ফ্লাইট ডেকের পিছনে, স্টারবোর্ড সাইডে গ্যালির পাশেই। গডলিম্যান, কয়েকজন এঞ্জিনিয়ার আর নকল রানা বেশ মোটা টাকা বাজি ধরে পোকার খেলছে। পোকার খেলার প্রতি তেমন আকর্ষণ নেই রানার, গডলিম্যান জানে, তাই খেলার প্রস্তাবটা তার কাছ থেকে আসায় মনে মনে অবাক হয়েছে সে। ডিউটির সময় খেলায় মন দেয়া, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অন্তত রানার কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না। তবু ব্যাপারটাকে হালকা করে দেখার চেষ্টা করল গডলিম্যান। নিজেকে এই বলে বোঝাল, মানুষের মন সব সময় একরকম থাকে না, কাজ থেকে একটু হয়তো ছুটি নেবার ইচ্ছে হয়েছে রানার।

একনাগাড়ে পারকিনই জিতছে। শেষ দানের টাকা পকেটে ভরে উঠে দাঁড়াল সে। পাশের লোকটাকে বলল, সে আর খেলবে না।

'সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল গডলিম্যান। 'আমাকে দরকার হবে?'

মাথা নাড়ল পারকিন। 'না, আমাকে বাদ দিয়ে খেলো তোমরা,' বলল সে। 'কেন যেন কোন ব্যাপারেই মনোযোগ দিতে পারছি না।' ভুল ভ্রান্তি যা করেছে, এই ব্যাখ্যায় সব মেনে নেয়া হবে বলে ধারণা করল সে। 'জানি খারাপ কিছু ঘটবে না, তবু ঘুরেফিরে দেখে আসি একবার। মনটাকে শান্ত করা আর কি।'

'আমরা সউদী আরবের ওপর দিয়ে আসার সময় কেউ হয়তো লাফ দিয়ে চড়ে বসে আছে বোয়িঙে,' ঠাট্টা করে বলল একজন এঞ্জিনিয়ার!

আরেকজন বলল, 'চীফ, সাবধান, হ্যাচ খুলবেন না–ভেতরে ঢুকে পড়বে!'

হেসে উঠল ওরা চারজন। পারকিনও হাসিমুখে বিদায় নিল।

স্টেটরুমে ঢোকার সময় ওপেক মন্ত্রী বা মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারি, কারও দিকে সরাসরি তাকাল না পারকিন। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল শুধু, কিন্তু রোজি বা হেলেন কাউকে দেখতে পেল না।

বোয়িঙের পিছন দিকে, রেস্টরুম কমপ্লেক্স এরিয়ায় চলে এল সে। হেলেন ছাড়া আর কারও সাথে দেখা হলো না তার। মেহমানদের জন্যে স্ন্যাক নিয়ে রেস্টরুমে যাচ্ছে হেলেন। ট্রলির সামনে থেমে তার পথরোধ করে দাঁড়াল পারকিন। মুচকি হেসে বলল, 'তোমার সাথে আমার প্রাইভেট কথা আছে।'

'আমি কিন্তু হেলেন!' বলে খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা।

পারকিনও হাসল। 'এখন নয়, পরে, কেমন?' হেলেনের ট্রে থেকে একটা গরম কাটলেট তুলে মুখে পুরল সে।

'কি কথা?' মেয়েলী কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না হেলেন।

'কথাটা কি, জানি,' রহস্যময় একটু হাসি দেখা গেল পারকিনের ঠোঁটে। 'কিন্তু সেটা বলব কিভাবে জানি না। একটু সময় দাও, উপায় একটা বের করে ফেলব।' হেলেনকে পাশ কাটিয়ে টয়লেটের দিকে এগোল সে।

টয়লেটে ঢুকে ওয়াল কেবিনেট থেকে অ্যারোসল স্প্রে বের করে পকেটে রাখল পারকিন। সাথে সাথে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল না, এত তাড়াতাড়ি হেলেনের সাথে দেখা হয়ে গেলে অবাক হবে মেয়েটা। হাত-মুখ ধুতে পাঁচ মিনিট ব্যয় করল সে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল না কাউকে। গ্যালির সামনে এসে দাঁড়াল ও, এই সময় পিছন থেকে সকৌতুকে জানতে চাইল হেলেন, 'সিকিউরিটি চীফ, এবার বলবেন কি?'

দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল পারকিন, ট্রলি নিয়ে হেলেন সামনে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর খালি ট্রলিটা চোখ ইশারায় দেখিয়ে জানতে চাইল, 'শেখ সাহেবরা খুব খেতে পারেন, তাই না?'

'তা আর বলতে!' হেসে ফেলে বলল হেলেন, 'আমাদের চীফ অর্ডার সাপ্লাই দিতে একেবারে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন।'

'পিটি ফবের। কোথায় সে?' জানতে চাইল পারকিন।

ইঙ্গিতে পারকিনের পিছনের দরজাটা দেখাল হেলেন। 'ওখানে।'

'আরও অর্ডার নিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ,' বলল হেলেন। 'কি যেন বলবেন বললেন...'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সাহস দরকার, সেটা সঞ্চয় করার সময় তো অন্তত দেবে আমাকে,' আবার সেই রহস্যময় হাসি দেখা গেল পারকিনের ঠোঁটে। 'বলা যায় না, দশ সেকেন্ডের মধ্যে তৈরি হয়ে যেতে পারি আমি। কিন্তু তোমাকে আমি দেরি করিয়ে দিতে চাই না।'

'আপনি বললে দশ-বিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করতে পারি...'

'না। শেখ সাহেবদের অপেক্ষা করিয়ে রাখা উচিত হবে না তোমার। ঠিকমত ওদের সেবা যত্ন করতে পারলে, বলা যায় না, ওদের মধ্যে কেউ একজন হয়তো তোমাকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়ে বসতে পারেন—কিংবা হয়তো হারেমে থাকতে রাজি আছ কিনা জিজ্ঞেস করবেন...'

হুঁহ্ করে অসন্তোষ প্রকাশ করল হেলেন। পারকিনকে পাশ কাটিয়ে গ্যালির দরজার দিকে এগোল।

দরজাটা আবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল পারকিন, তারপর কবাটের গায়ে টোকা দিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'পিটি? আছ তুমি?'

'কে ডাকে?' পিটি ফবেরের গলা ভেসে এল বন্ধ দরজার ভেতর থেকে। দরজা খুলে উঁকি দিল সে, পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেলেন।

উজ্জ্বল হাসি উপহার দিয়ে পারকিন বলল, 'তোমাকে একটা জিনিস প্রেজেন্ট করতে চাই।' মুগ্ধ বিস্ময়ে মুখ খুলে কিছু বলতে গেল হেলেন, অ্যারোসল স্প্রে গ্যাসে ফুসফুস ভরে গেল তার। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল সে, মাস্টার সার্জেন্ট পিটি ফবেরের এক সেকেন্ড আগেই।

হাতঘড়ি দেখার জন্যে মাথা একটু তুলল রানা, সাথে সাথেই মেঝেতে পেট দিয়ে থাকা অ্যালসেশিয়ান গা মোচড় দিয়ে উঠল। আট মিনিট পেরিয়ে গেছে। আর দেরি করতে পারে না সে। চেষ্টা যদি করতেই হয়, এখুনি।

বিছানার ওপর উঠে বসল ও। ওর সাথে কুকুরটাও বসল, ঘাড়ের চুল খাঁড়া হয়ে উঠছে, খোলা মুখ, ভেজা জিভ দাঁতের পিছনে সেঁটে আছে।

এক ঝটকায় মেঝেতে পা নামাল রানা, গতির ধারাবাহিকতা না ভেঙে দেয়াল আলমারির কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল, হাত দুটো হাতল ধরার জন্যে খুঁজছে। নিঃশব্দে এগিয়ে এল অ্যালসেশিয়ান, সাথে করে টেনে নিয়ে আসছে চেইনটাকে। জোরাল বাতাসে ঝুলন্ত সেতু যেমন দোলে, পেশীবহুল তাগড়া শরীরটা সেই রকম দুলছে এদিক ওদিক। জ্বলজ্বলে চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যেও রানার চোখ থেকে সরল না।

হাতল ধরে জোরে মোচড় দিতেই ঘুরে গেল সেটা, শোল্ডার ব্লেডে কবাটের স্পর্শ পেল রানা। পাশে সরে এসে কবাট দুটোকে পুরোপুরি খুলে যেতে দিল ও। তাকাবার আগে মনে মনে আশা করল, ভেতরটা যেন যথেষ্ট বড় হয়। তারপর তাকাল।

আলমারি নয়, খুদে একটা ঘরই বলা চলে। ভেতরে ঢোকা যায়। তিন দিকের দেয়ালে কাঠের শেলফ, সব খালি। ভেতরে ঢুকল রানা। ওর পিছু নিয়ে কুকুরটাও।

আলমারি থেকে ঘরের মেঝেতে নেমে পড়ল ও, এবার আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি। ওর পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল কুকুরটাও, চেইনের আওয়াজ তুলে। কোন পরিশ্রম হয়নি, তবু হাঁপাচ্ছে জানোয়ারটা, সম্ভবত উত্তেজনায়। উৎকট একটা গন্ধে ভারী হয়ে উঠছে বাতাস।

আবার আলমারিতে চড়ল রানা, পিছনে অ্যালসেশিয়ানটাকে নিয়ে। আবার লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ও। কুকুরটাও তাই করল। কিন্তু কুকুরটাকে ভেতরে ঢোকার পর আধপাক ঘুরতে হলো, তারপর লাফ দিতে পারল সে। কিন্তু রানা তা করেনি। সামনে-পিছনে লাফ দিচ্ছে সে।

আবার লাফিয়ে ঢুকল রানা আলমারির ভেতর। মেঝেতে আধপাক ঘুরে কুকুরটাও লাফ দিয়ে ঢুকল ভেতরে। এবার এক লাফে কুকুরটাকে টপকে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। ভেতরে ঘুরতে শুরু করেছে অ্যালসেশিয়ান, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল রানা ওর নাকের সামনে।

ভেতর থেকে বন্ধ দরজার ওপর আছড়ে পড়ল উন্মাদ অ্যালসেশিয়ান। কিন্তু কবাট জোড়া ভাঙবে বলে মনে হলো না। হাত বাড়িয়ে ভারী খাটটাকে টেনে নিয়ে এল রানা, আলমারির দরজার সাথে ঠেকিয়ে দিল সেটাকে।

একছুটে তালা দেয়া দরজার সামনে চলে এল সে। গজালটা খসাবার জন্যে ঘন ঘন হ্যাঁচকা টান দিল কয়েকটা।

সিঁড়িতে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। সায়েদ আসছে। করিডরে পৌঁছে গেল সে। অন্ধকার আলমারির ভেতর এখনও তড়পাচ্ছে অ্যালসেশিয়ান, কলজে কাঁপানো হাঁক ছাড়ছে।

চেইনটা হাতে জড়িয়ে নিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে টান দিল রানা। কর্কশ আওয়াজ তুলে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল গজালসুইচ। অফ করে আলো নিভিয়ে দিল ও।

দরজার তালা খোলার শব্দ পেয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা। হাতে ঝুলছে বেশ খানিকটা চেইন।

ঘরের ভেতর আলো থাকার কথা, কিন্তু দরজা খুলে ভেতরে অন্ধকার দেখল সায়েদ। পিস্তলটা হাত বদল করল সে, আওয়াজের উৎসের দিকে টর্চ তাক করে বোতাম টিপল।

রানার প্রচণ্ড লাথি সায়েদের কব্জির হাড় ভেঙে দিল। হাত থেকে ছিটকে পড়ল পিস্তল, অ্যালসেশিয়ানের গর্জনের উত্তরে সাড়া দিয়েই যেন গুঙিয়ে উঠল সায়েদ। লাফ দিয়ে তার সামনে চলে এসে গলায় চেইনের মালা পরিয়ে দিল রানা, তারপর মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে চেইন ধরে হ্যাঁচকা টান দিল নিচের দিকে। মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল সায়েদ, চেইন টেনে গলার ফাঁসটা আরও শক্ত করল রানা। চিৎকারটা সায়েদের গলার ভেতর স্তিমিত হয়ে এল। ফাঁস আরও শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রাখল রানা। মেঝের ওপর হাত পা ছুঁড়ল সায়েদ শেষদিকে। তারপর স্থির হয়ে গেল।

হঠাৎ পিছনে একটা আওয়াজ শুনে ছ্যাৎ করে উঠল রানার বুক। ঝট করে ঘুরতেই দেখল, আলমারির দরজা ফাঁক করে ঘরের ভেতর বেরিয়ে আসছে বিশাল অ্যালসেশিয়ানটা। অবিশ্বাসে, আতঙ্কে গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল রানার। খাটটা একটু একটু পিছিয়ে আসছে, সেই সাথে আরও খুলে যাচ্ছে আলমারির দরজা। এখন আর ভয়ঙ্কর ডাক ছাড়ছে না অ্যালসেশিয়ান, ফোঁস-ফোঁস করছে সে। লাশের হাতে এখনও জ্বলছে টর্চ, তার আলোয় কুকুরটাকে লাফ দিতে দেখল রানা। আকারে বেড়ে ওঠা চোয়ালের কিনারা থেকে সাদা ফেনা আর লালার পিচ্ছিল ধারা ঝুলছে।

বিদ্যুৎ গতিতে গড়িয়ে সরে গিয়ে ছোঁ মেরে সায়েদের ওয়ালথারটা তুলে নিল রানা, খুনী অ্যালসেশিয়ান শূন্যে থাকতেই পরপর দুটো গুলি করল ও। ওর শরীরের ওপর দিয়ে উড়ে গেল অ্যালসেশিয়ান, আধখোলা দরজার গায়ে বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। নড়ল না আর।

নিচ তলায় নেমে তাজা বাতাসে ফুসফুস ভরে নিল রানা। বাড়িতে দ্বিতীয় গাড়ি আছে কিনা খুঁজতে শুরু করল ও। পিছন দিকে পাওয়া গেল একটা, কিন্তু ইগনিশনে চাবি নেই। আবার ছুটতে ছুটতে বাড়ির সামনে ফিরে এল ও, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। পায়ের ঠেলায় লাশটাকে চিৎ করল ও, ট্রাউজারের পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল।

গাড়ি নিয়ে বাড়িটা থেকে বেরুতে কোন অসুবিধে হলো না। সাংঘাতিক তাড়া অনুভব করলেও, বরাদ্দ গতিবেগ ছাড়িয়ে গেল না রানা। পুলিস দাঁড় করালে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাবে। এখনও মনস্থির করতে পারেনি, বাংলাদেশ দূতাবাসে যাবে, নাকি মার্কিন কনসুলেটে।

বাহরাইনের বাংলাদেশ দূতাবাস তাকে চেনে না, তবে মার্কিন কনসুলেটের দু'একজনকে চেনে ও। তাছাড়া, মার্কিন কনসুলেটের সাথে পৃথিবীর দূর-দূরান্তের রেডিও যোগাযোগ আছে, বাংলাদেশ দূতাবাসে সে-ধরনের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা জানা নেই রানার।

মার্কিন কনসুলেটে যাবে বলেই স্থির করল ও। সিদ্ধান্ত নেবার পর আসল সমস্যার কথা মনে পড়ল ওর।

ঠাট্টার সুরে মেনিলথিনকে বলেছিল রানা, আমার অস্তিত্ব প্রমাণ করার বা পরিচয় দেবার কোন উপায় রাখোনি তোমরা। ওর কাছ থেকে সব রেখে দেয়া হয়েছে—ওয়ালেট, ক্রেডিট কার্ড, সিকিউরিটি পাস, টাকা—কিছুই নেই।

কনসুলেটে ওরা যারা ওকে চেনে, কনসাল তাদের কথা শুনবেন, নাকি নিজের চোখকে বিশ্বাস করবেন? সন্দেহ নেই, মাত্র তিন ঘণ্টা আগে এয়ারফোর্স ওয়ানে মাসুদ রানাকে নিজের চোখে উঠতে দেখেছেন তিনি। আরেকজন রানাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলে তাঁকে কি দোষ দেয়া যাবে? তিনি যদি পুলিস ডেকে রানাকে গ্রেফতার করতে বলেন, আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে কি?

দশ

রেস্টরুমে কেবিনে ঢুকে পারকিন দেখল, এখনও তাস পিটছে ওরা। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে গডলিম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'কি অবস্থা?' পকেট থেকে সিল্কের একটা রুমাল বের করে মুখ মুছতে শুরু করল সে।

আনন্দে ডগমগ করছে গডলিম্যানের চেহারা, সন্তুষ্টচিত্তে বলল, 'দারুণ! এভাবে কামাই হলে, চাকরি করতে হবে না। তুমি চলে যাওয়ায় কপাল খুলে গেছে আমার।'

'তাই?' ভুরু নাচাল পারকিন। 'দেখো তো, এটায় তোমার কপাল আরও একটু খোলে কিনা।' রুমালটা নিজের নাকের ওপর চেপে ধরে ওদের সব ক'জনার নাকে-মুখে গ্যাস স্প্রে করল সে। এক এক করে প্রত্যেকের অসাড় হাত থেকে পড়ে গেল তাস। ছোট টেবিলের ওপর মাথা দিয়ে পড়ল ওরা। পারকিন সময় মত ধরে না ফেললে কাত হয়ে পড়েই যাচ্ছিল ওটা।

গডলিম্যানের হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে নিল পারকিন, তার পা জুতো দিয়ে মাড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে বলল, 'স্বপ্ন দেখ্, শালা!'

এরপর, ফ্লাইট ডেক।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল অ্যান্থনি বলল, 'কমান্ডার স্ক্রীনে ঝাপসা ভাবটা বাড়ছে। বেশ মেঘ জমেছে সামনে। আপনি মনে করেন নেপলসের সাথে আমাদের যোগাযোগ করা দরকার?'

রাডারের দিকে তাকাল বিগ হার্ভে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর পাইলটকে নির্দেশ দিল নেপলসের কন্ট্রোল স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করার।

'নেপলস কন্ট্রোল, এয়ারফোর্স ওয়ান টু নেপলস কন্ট্রোল,' মাউথ পিসে বলে চলল পাইলট হল। যান্ত্রিক কণ্ঠে সাড়া দিল নেপলস কন্ট্রোল। পাইলট আবার বলল, 'নেপলস, দেয়ার'স আ হেভি রাডার রিটার্ন বিল্ডিং আপ অ্যাহেড।

রিকোয়েস্ট চেঞ্জ অভ রুট টু জেনেভা।'

পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখল নেপলস, তারপর জানাল, 'রজার, এয়ারফোর্স ওয়ান। চেঞ্জ টু আ হেডিং অভ টু-সেভেন-সিক্স। ডু ইউ কপি?'

ইতিবাচক উত্তর দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করল পাইলট।

বোলোনিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে বই-খাতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল মন্টালিমোর। সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র সে, নাম লিখিয়েছে একটা সন্ত্রাসবাদী দলে।

প্রায় ওই একই সময়ে, এথেন্স ইউনিভার্সিটির সমাজ বিজ্ঞান ক্লাসে, নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল লুসি ক্রিস্টিয়ানা। মধ্যাহ্ন বিরতির জন্যে অপেক্ষা করছে সে।

একটা প্লেনে চড়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করল মন্টালিমোর। স্থানীয় সন্ত্রাসবাদী সেল থেকে যে সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তার আগেই নেপলসে পৌঁছুল সে। লাইনে দাঁড়িয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছে, এই বাস তাকে শহরের বাইরে নিয়ে যাবে। লুসির কথা মনে পড়তে ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল, এই মুহূর্তে এথেন্সের ঈজিপ্ট স্কয়ারে ওর মত লুসিও সম্ভবত বাসের জন্যে লাইনে দাঁড়িয়েছে।

মাত্র দু'হপ্তা আগে সোফিয়ায় একটা সেমিনারে গিয়ে পরিচয় এবং প্রেম হয়েছে ওদের। দু'জনের কেউই জানে না এথেন্স আর বোলোনিয়া সন্ত্রাসবাদী সেল কার কাছ থেকে অর্ডার পায়। সেজন্যে মনে কোন খেদ নেই ওদের। যখন যেখানে বোমা ফেলতে বলা হয় তখন সেখানে বোমা ফেলেই আনন্দ তাদের। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের আদর্শ উপকরণ তারা। আদেশ পেলে অন্ধের মত পালন করে, কোন কৌতূহল প্রকাশ করে না বা প্রশ্ন তোলে না।

যে-কাজে খুন-খারাবি নেই, সেটা করতে তেমন ভাল লাগে না মন্টালিমোরের। মন একটু খারাপ করেই বাস থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় নামল সে। যদিও, ভাবল সে, গ্রুপ লীডার তাকে জানিয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটা—ক্যাপিটালিজমের একেবারে গোড়ায় আঘাত হানা হবে এর ফলে।

মেইন রোড থেকে অনেকটা দূরে একটা খাদ, পাহাড় প্রাচীরকে এড়িয়ে এই খাদের ওপর দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় এগিয়ে গেছে ইলেকট্রিক তার, পৌঁচেছে নেপলস কন্ট্রোল রাডার স্টেশনে। এথেন্স কন্ট্রোলের পাওয়ার সাপ্লাইও মেইন রোড থেকে দেখতে পাওয়া যায় না।

আরেকবার সময় পরীক্ষা করল মন্টালিমোর। সেকেন্ডের কাঁটা জিরো-আওয়ারে পৌঁছুবার জন্যে শেষ একপাক ঘুরছে।

একটা জাঙ্কশন বক্সের ঢাকনি খুলে ভেতরে লোহার গায়ে ছোট আকারের ম্যাগনেটিক টাইমিং ডিভাইসটা আটকে দিল সে। প্লাস্টিকের হাতল লাগানো প্লায়ার্স দিয়ে কেটে কেবল থেকে একজোড়া তার বের করে আনল, তারপর টাইমারের জোড়া টার্মিনালে ঢুকিয়ে দিল দুই তারের দুই মুখ। ক্লকের কাঁটা সেট করা হলো পঁয়ত্রিশ মিনিটে।

কয়েকশো মাইল দূরে, লুসি ক্রিস্টিয়ানাও হুবহু মন্টালিমোরের আচরণ অনুকরণ করল। এই একই কাজ নেপলসের দক্ষিণে মন্টালিমোরও করছে ভেবে ঠোঁটে হাসি ফুটল তার। তারা যে-যার টাইমারের বোতাম টিপল প্রায় একই সময়ে, মাত্র আধ সেকেন্ডের ব্যবধানে। ফ্লাইট ডেকে যাবার সময় রোজি কারভারের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ায় অবাক হলো পারকিন। 'কোন সমস্যা, রোজি?' জানতে চাইল সে।

মাথা নাড়ল রোজি, কালো চুল কাঁধ থেকে লাফিয়ে উঠে আবার ঝরে পড়ল কাঁধের ওপর। 'না, একটা কাজে এসেছিলাম।'

'কি ব্যাপার?'

'ফারুক···বাহরাইন শেখের নাতি,' বলল রোজি। 'ফ্লাইট ডেকে ঢুকে প্লেন চালানো দেখতে চায়। কর্নেল বিগ হার্ভে বললেন, কোন অসুবিধে নেই।'

'ও, এই ব্যাপার,' বলে, রোজিকে একরকম ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটাল পারকিন, হন হন করে এগোল ফ্লাইট ডেকের দরজার দিকে।

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে বলল রোজি, 'অদ্ভুত মানুষ তো!' চেহারা কালো হয়ে গেছে তার।

পিস্তলের হোলস্টারে হাত বুলিয়ে নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল পারকিন। পিছন ফিরে তাকাল একবার। রোজি চলে গেছে। নক করল সে। ভেতর থেকে পরিচয় জানতে চাওয়া হলো। নাম বলতেই ভেতর থেকে খুলে গেল দরজা।

ঠিক ওই একই সময়, নেপলস কন্ট্রোলার সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'ক্রাইস্ট অলমাইটি!' চোখ পিটপিট করে আবার স্ক্রীনে তাকাল সে। তারপর দুই তর্জনী ভাঁজ করে চোখ রগড়াল। না ভুল দেখছে না সে। নিভে গেছে রাডার স্ক্রীন।

'কি ব্যাপার, স্ক্রীনের কি হলো?' একজন অপারেটর চিৎকার করে জানতে চাইল।

'সব গেল কোথায়?' বিমূঢ় কণ্ঠে জানতে চাইল একজন সুপারভাইজার।

'সব বলতে আমরা, এথেন্স, আর এয়ারফোর্স ওয়ান,' গম্ভীর সুরে বলল কন্ট্রোলার। এখনও চোখ পিটপিট করছে সে।

'হটলাইন?' জানতে চাইল সুপারভাইজার।

'ডেড।'

'সর্বনাশ!'

পেন্টাগনের অপারেশন রুমে দাঁড়িয়ে নেপলসের কলটা নিজেই রিসিভ করলেন জেনারেল টমসন। অপরপ্রান্তের বক্তব্য শুনে তাঁর চেহারায় প্রথমে বিরক্তি, তারপর উদ্বেগ ফুটে উঠল। কিন্তু ঝাঁঝাল কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি, 'কি? হারিয়ে ফেলেছেন?' ঝট করে ওয়াল ম্যাপের দিকে তাকালেন তিনি! ম্যাপটা ইউনাকোর ম্যাপের চেয়ে ছোট, কিন্তু বোয়িঙের ট্রেসার এখনও শো করছে। 'কিভাবে হারিয়ে ফেললেন?' জানতে চাইলেন তিনি। 'ইনার্শিয়াল গাইডেন্স ট্র্যাকে আমরা তো ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার!'

'না, স্যার, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি,' নেপলস কন্ট্রোলার অস্থিরতা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, 'বলছিলাম, আমরা আমাদের সব রাডার হারিয়ে ফেলেছি। শুধু আমরা নই, এথেন্সও। যতদূর জানি, এয়ারফোর্স ওয়ান তার জায়গাতে ঠিক মতই আছে। তাছাড়া, জেনারেল, আপনি যখন বলছেন···মানে, আপনার মুখের কথা আমাদের জন্যে যথেষ্ট।'

ইঙ্গিতে একজন সহকারীকে ডাকলেন জেনারেল টমসন, একজন ফুল কর্নেল। ফিসফিস করে তাকে নির্দেশ দিলেন, 'কি ঘটছে ইউনাকোর সোহানা চৌধুরীকে জানাও।' মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে আছেন তিনি। 'তারপর এখানে এসে এরা কি বলে শোনো। এথেন্স আর নেপলসের মাথায় ঘোল ঢালব আমি।'

পারকিনকে ফ্লাইট ডেকে ঢুকতে দেখে মেজর হল জানতে চাইল, 'কি খবর, রানা?'

হলের মুখে রানার নাম শুনে ঘাড় ফেরাল বিগ হার্ভে। জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে বোধহয় একঘেয়ে লাগছিল?'

পারকিনের সাথে চোখাচোখি হতে হাসল লে. কর্নেল পল। ওদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে ইন্সট্রুমেন্ট দেখছে ফারুক।

'হ্যাঁ,' বলল পারকিন। 'ভাবলাম, তোমাদের সাথে একটু রসিকতা করলে মন্দ হয় না!' ফারুকের মাথায় হাত বুলাল সে। 'তুমি, খোকা এখানে কেন? এখন নিজের সীটে ফিরে যাও, পরে না হয় আবার এসো।'

হালকা, সহজ সুরে বলল পারকিন, কিন্তু তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল বিগ হার্ভে, ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, রানা? কিছু ঘটেছে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল পারকিন। ইতস্তত করতে লাগল ফারুক, কমান্ডারের চোখে চোখ রেখে মৌন আবেদন ফুটিয়ে তুলল চেহারায়। তার পিঠ চাপড়ে দিল বিগ হার্ভে। 'লক্ষ্মী ভাই আমার, মেজর যা বলছেন শোনো। তোমাকে আমি নিজে ডেকে পাঠাব আবার।' মন খারাপ করে ফ্লাইট ডেক থেকে বেরিয়ে গেল ফারুক।

দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বিগ হার্ভে। তারপর জানতে চাইল, 'কোথায় কি ঘটল আবার? আমরা জানি না, এমন কোন সমস্যা?'

'সমস্যা তো বটেই,' বলল নকল রানা। 'কিন্তু কার সমস্যা সেটাই হলো প্রশ্ন।'

'কার সমস্যা?'

মুচকি একটু হাসল পারকিন। 'আমার নয়।'

'মানে?'

'তোমাদের সমস্যা, বিগ হার্ভে।'

'কি রকম?'

'এই রকম,' বলে রিভলভার বের করে ফার্স্ট ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের ঘাড়ের ওপর মাজল চেপে ধরল পারকিন। 'তোমাদের সবাইকে বলছি,' কঠিন সুরে

বলল সে, 'পাথর হয়ে যাও। একদম!'

চেম্বারে ঢুকে রাশীদ সোনাইদি জানাল, জেনারেল টমসনের অপারেশন রূম থেকে এইমাত্র রিপোর্ট করা হয়েছে, নেপলস আর এথেন্সের রাডার কাজ করছে না।

সোহানার হাত থেকে কাপটা পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি সেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল সে। 'বলো কি!'

'ওরা বলছে, কমপ্লিট ব্ল্যাক আউট।'

ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে সোহানা। তার পিছনে সাবরিনা আর্চারকেও দেখা দেল। ইউনাকোর অপারেশন সেন্টারে ঢুকে প্রথমেই ম্যাপের দিকে তাকাল সোহানা। মেডিটেরেনিয়ানের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে সবুজ সাপ।

সাবরিনার পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল রাশীদ। 'জেনারেল টমসন দুশ্চিন্তা করতে বারণ করেছেন, ম্যাডাম,' বলল সে। 'কারণ তাঁর ট্রেসে এখনও দেখা যাচ্ছে এয়ারফোর্স ওয়ানকে। আমাদের ম্যাপেও তো রয়েছে ওটা। উনি বললেন, এটা নিশ্চয়ই স্থানীয় যান্ত্রিক গোলযোগ।'

রাশীদের চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সোহানা। 'একই সাথে দু'জায়গায় যান্ত্রিক গোলযোগ?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল সে। কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের সুর, সেটা রাশীদকে নাকি জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে, ঠিক বোঝা গেল না। 'এই রকম কোইন্সিডেন্স ঘটতে পারে? দুশ্চিন্তা করব না?' মুখের চেহারা লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে ওর।

সোহানার পাশে এসে দাঁড়াল সাবরিনা।

'না, আমরা দুশ্চিন্তা করছি না, রাশীদ,' আবার বলল সোহানা। 'কিন্তু জেনারেল টমসন নিজেকে যা খুশি তাই বলে বুঝ দিতে পারেন, আমরা তা পারি না। এথেন্স আর নেপলসের মধ্যে কয়েকশো মাইলের তফাৎ, একটা ইলেকট্রিক্যাল স্টর্ম দু'জায়গারই রাডার সিস্টেমকে অচল করে দিয়েছে, একই সাথে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

অনেক চেষ্টা করে একটা ঢোক গিলল রাশীদ সোনাইদি, তারপর সবিনয়ে জানতে চাইল, ম্যাডামের নির্দেশ কি। হাতের তালুতে হালকা ভঙ্গিতে ঘুসি ঠুকতে শুরু করল সোহানা, গভীর মনোনিবেশের ফলে ভাঁজ ফুটে উঠল ভুরুতে। 'এ কবির চৌধুরী না হয়েই যায় না।' বিড়বিড় করে বলল সে। 'কিন্তু তবু, কারও সাহায্য তাকে নিতে হয়েছে।'

'ম্যাডাম?' জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল রাশীদ।

'ভাল করে বুঝে নাও, রাশীদ,' উত্তরে বলল সোহানা, নিষ্কম্প একটা আঙুল তাক করল রাশীদের দিকে। 'নেপলস কমান্ডকে বলো, এক স্কোয়াড্রন ফাইটার রেডি চাই আমি। এটা তোমার প্রথম কাজ, এখুনি সারো...এখুনি বলতে আমি বোঝাতে চাইছি, এই মুহূর্তে।' ঘুরতে যাচ্ছিল রাশীদ, তাকে বাধা দিল

সোহানা। 'শোনো। বলবে, আমি ওদের কাছ থেকে কোন প্রশ্ন, কোন তর্ক আশা করি না—শুধু অ্যাকশন চাই।'

'ফাইটার পাইলটের জন্যে কোন নির্দেশ, ম্যাডাম?'

'এখুনি কোন ডাইরেক্ট অর্ডার নয়। স্ট্যান্ড বাই থাকতে বলো। বললেই যেন আকাশে উড়তে পারে। আমার রেড প্রায়োরিটি ব্যবহার করো, তাহলে ওরা বুঝবে, আমি সিরিয়াস।' এগিয়ে এসে একটা মনিটরের চেয়ারে বসল সোহানা।

চশমার পিছনে বারকয়েক চোখ পিটপিট করল রাশীদ সোনাইদি, তারপর দৃঢ়পায়ে এগোল ইউনাকোর মাস্টার কমপিউটরের দিকে।

ফ্লাইট ক্রুদের মনে হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করল আতঙ্কের পাগলা ঘোড়া, কিন্তু কমান্ডার বিগ হার্ভের ইস্পাত-কঠিন ভূমিকা তার লাগাম টেনে ধরল। 'এটা যদি তোমার ঠাট্টা হয়, মেজর,' ধীরে ধীরে পারকিনকে বলল সে। 'আমি তোমার ছাল ছাড়াব।'

'ঠাট্টা নয়, কর্নেল,' ঠাণ্ডা সুরে বলল পারকিন। 'কঠোর বাস্তব। আমি এয়ারফোর্স ওয়ানকে হাইজ্যাক করছি।'

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকল বিগ হার্ভে, কিন্তু ঠোঁটে হাসির কোন রেখা বা চোখে কৌতুকের কোন ভাব দেখল না। রিভলভারের কদাকার নাকটা এঞ্জিনিয়ারের কামানো ঘাড়ে চেপে আছে শুধু। 'তুমি…তুমি কারও কাছ থেকে টাকা খেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল সে, অবিশ্বাসে নরম শোনাল তার গলা।

'হ্যাঁ,' বলল পারকিন। 'কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। শুধু মনে রাখো, আমি একজন কোয়ালিফায়েড, অভিজ্ঞ পাইলট। এই প্লেনের সমস্ত অ্যালার্ম সিস্টেম আর বোতাম সম্পর্কে আমি জানি। ওগুলোর কোন একটার দিকে কেউ হাত বাড়াও, সার্জেন্ট কেভ ব্রাউনের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব আমি।'

ইস্পাত-কঠিন কমান্ডারের মুখে কথা সরল না।

'আমার হাতে এটা খেলনা নয়,' আবার বলল পারকিন। 'সফট কোনড় বুলেট, লো-ক্যালিবার, ডাম-ডাম ভেরিয়্যান্ট। এত কাছ থেকে ব্যবহার করলে, ফ্যাবরিকের কোন ক্ষতি হবে না—ব্রাউন ছাড়া আর কারও বা আর কিছুর এতটুকু ক্ষতি হবে না। ও মারা যাবে, হার্ভে। তারপর তোমার পালা। কাজেই, মেনে নাও।'

হতভম্ব ক্রুরা আরও একটা গলার আওয়াজ শুনতে পেল, বেরিয়ে এল পাইলটের হেডফোন থেকে। 'নেপলস কন্ট্রোল কলিং এয়ারফোর্স ওয়ান! নেপলস কন্ট্রোল কলিং এয়ারফোর্স ওয়ান! রিপোর্ট ইওর পজিশন! রিপোর্ট ইওর পজিশন! ডু ইউ রিড?'

'না,' অর্ডার করল পারকিন, হ্যাঁচকা টান দিয়ে পাইলটের মাথা থেকে হেড সেটটা খসিয়ে আনল সে, 'কোন উত্তর দেবে না কেউ। সবাইকে বলছি, প্লাগ

খুলে ফেলো।' একচুল নড়ল না কেউ, মুখও খুলল না। ব্রাউনের ঘাড়ে আরও জোরে রিভলভারের মাজল চেপে ধরল পারকিন। শান্তভাবে বলল, 'খোলো, প্লাগ খোলো। কেউ হিরো হবার চেষ্টা কোরো না, মারা পড়বে।'

পারকিনের চোখে আরও পাঁচ সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল কমান্ডারের দৃষ্টি। ঠাণ্ডা চোখে খুনের নেশা, পরিষ্কার দেখতে পেল সে। কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের হেডসেটের প্লাগ একটানে খুলে ফেলল। মৌনতা না ভেঙে ক্রুরাও সবাই অনুকরণ করল তাকে।

তিন ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট উড়ে এয়ারফোর্স ওয়ান দূরত্ব পাড়ি দিয়েছে উনিশশো পঞ্চাশ মাইল, এই সময় ফ্লাইট ডেকে ঢোকে পারকিন। ঠিক সেই মুহূর্তে কমান্ডার বিগ হার্ভে ক্রমশ পিছিয়ে পড়া, অস্পষ্ট হয়ে আসা ক্রিট দ্বীপ এবং সামনে মাথাচাড়া দিতে শুরু করা বহুদূরের গ্রীস উপকূলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল কিশোর ফারুকের।

এয়ারফোর্স ওয়ানের নতুন কোর্স কি হবে, জানিয়ে দিয়েছে পারকিন। সেটার ওপর চোখ বুলাবার সময় নেভিগেটর লে. কর্নেল পলের চেহারার যে অবস্থা হবার কথা, হলো তার উল্টোটা।

আতঙ্কে বিস্ফারিত হলো না চোখ, চেহারায় অবিশ্বাসের ভাব ফুটল না, কৌতুকের ক্ষীণ হাসি ঠোঁটে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'এই কোর্স ধরে কোথায় নিয়ে যেতে চাও আমাদের? আমার জানামতে নরক জায়গাটা ওপর দিকে, কিন্তু এ তো দেখছি, পৃথিবীতেই নেমে যাবার পরামর্শ। এবং কেনই বা, ফর দি লাভ অভ গড, আটাশ হাজার ফিট থেকে আড়াইশো ফিটে নেমে যেতে হবে আমাদেরকে? তাও আবার, এতটা নামতে দশ মিনিটের বেশি সময় নেয়া চলবে না। কেউ যেন আমার ওপর রাগ না করে–বিশ্বাস হচ্ছে না তো আমি কি করব!'

সামনের দিকে ঝুঁকে ব্রাউনের দু'চোখের মাঝখানে রিভলভারের মাজল তাক করল পারকিন। 'তোমার বাক-চাতুর্য শোনার ধৈর্য আমার নেই। যা বলেছি, করো। যা বলব সাথে সাথে করলে এই অস্বস্তি থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সবাই।' আবার সিধে হলো সে।

অশ্লীল একটা খিস্তি করে কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পাইলট হল। ঠিক এই সময়, নকল এয়ারফোর্স ওয়ানের পাইলট আর কো-পাইলট–মোজাম্বিক থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে এদেরকে–মিনিটে দু'হাজার নয়শো ফিট হারে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল।

'তোমার নতুন কোর্স রিপিট করো,' নির্দেশ এল পারকিনের কাছ থেকে।

পাইলট গুনগুন করে বলল, 'উই শ্যাল বি হেডিং থ্রী হানড্রেড ফিফটি ডিগ্রীজ, ডাইভিং টু টু হানড্রেড ফিফটি ফিট। ব্যাং আপ দি মিডল অভ দি স্টেইন্ট অভ ওট্রান্টো –আপনি যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, স্যার।'

কথাটা গায়ে না মেখে সার্কিট ব্রেকারের সারিগুলোর দিকে তাকাল

পারকিন। প্লেনের অয়্যারলেস আর নেভিগেশন এইড ওখান থেকে কন্ট্রোল করা হয়। 'খুলে ফেলো ওগুলো—সব কটা,' ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারকে নির্দেশ দিল সে।

অনুমতির জন্যে কমান্ডারের দিকে তাকাল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার।

কমান্ডারের ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে চেপে থাকল। কয়েক সেকেন্ড অস্বস্তিকর একটা নীরবতা। তারপর বিগ হার্ভে বলল, 'ওর হাতে রিভলভার আছে, যা বলছে করো।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল,' ঠোঁটের কোণ নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে একটু বেঁকে গেল পারকিনের, বলল, 'তোমার কমনসেন্সের সত্যি প্রশংসা করি আমি।'

যাকে এতদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে জেনে এসেছে বিগ হার্ভে, তার দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকাল সে। দু'চোখে উলঙ্গ ঘৃণা। কিন্তু কথাগুলো বলল সম্পূর্ণ শান্ত ভঙ্গিতে, ঠাণ্ডা সুরে, 'ওপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করি, যা করছ তা যেন জেনেশুনে করো। সমস্ত যোগাযোগ কেটে দেয়ায় রাইট ব্রাদারদের যুগে ফিরে গেছে এয়ারফোর্স ওয়ান। ওরাও ওদের প্রথম ফ্লাইটে পানির ওপর দিয়ে উড়ে যায়নি। প্লেন নিয়ে সাগরে ঝাঁপ দিতে বললেই পারতে!' কমান্ডারের দিকে রিভলভার তাক করল পারকিন, কিন্তু বিগ হার্ভের চোখের পাতা কাঁপল না। বলল, 'আমার কথা তুমি বোঝোনি, এ হতে পারে না। তুমিও একজন পাইলট, এখানে আমরা যারা আছি তাদের চেয়ে কোন অংশে কম যাও না। অথচ কিছুই বুঝতে চাইছ না। প্লেনটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদের চোখ থাকতে হবে তো! কানা করে রাখলে...' কাঁধ ঝাঁকাল সে। '...তুমি যেখানে যেতে চাইছ আমরা তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব না।'

'তাহলে...কি দরকার তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল পারকিন, টেকনিক্যাল ব্যাপারটা তার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। প্লেন চালাবার সহজ, সাদামাঠা নিয়মগুলো কবির চৌধুরীর তাগাদায় মুখস্থ করেছে সে, কিন্তু এই ধরনের প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা মোকাবিলা করার জন্যে ওইটুকু যথেষ্ট নয়।

'কি দরকার তা তোমার ভাল করেই জানা আছে!' ফেটে পড়ল বিগ হার্ভে। 'রেডিও আলটিমিটার চাই আমার, ওয়েদার রাডার চাই, আর ফ্লাইট সিস্টেম দাও আমাকে। তাহলে হয়তো কোনরকমে—আমি আবার বলছি, কোনরকমে—তোমার ইচ্ছেমত জায়গায় পৌঁছুতে পারব। যদিও ল্যান্ড করা সম্পূর্ণ আলাদা একটা সমস্যা...তুমি নিজেই জানো। যোগাযোগ ব্যবস্থায় তালা-চাবি দিয়ে রাখো, আপত্তি নেই—কিন্তু চোখ দাও আমাকে।'

কমান্ডার সত্যি কথা বলছে কিনা বোঝার জন্যে এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল পারকিন। সবাই ওর চোখে তাকিয়ে আছে, কারও চেহারায় কোন ভাব নেই। কিন্তু সবাই সচেতন, ওর হাতের রিভলভার প্রত্যেককে কাভার করছে। ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের হাত সার্কিট ব্রেকারের কাছে গিয়ে থেমে গেল, ওটাই লাইনারের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করবে—প্রায় সবগুলো। চালাকি করতে গেলে পারকিনের চোখে ধরা পড়ে যেতে হবে, তাই

সব কটা সার্কিট ব্রেকারের সুইচ অফ করে দিল সে। কিন্তু ভুল করল নার্ভাস দৃষ্টিতে বাল্কহেডের দিকে তাকিয়ে। মাত্র আধ সেকেন্ডের জন্যে সেদিকে দৃষ্টি পড়ল তার, কিন্তু পারকিনের চোখে ধরা পড়ে গেল চোরা-চাহনিটা। বাল্কহেডের গায়ে ফিট করা রয়েছে রহস্যময় একটা ধাতব বাক্স।

'ওটা কি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল পারকিন। 'কি আছে ওতে?'

'কোন্‌টা?' ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার বুঝেও না বোঝার ভান করল।

'বাল্কহেডের গায়ে, কি ওটা?' পারকিনের চেহারায় সন্দেহ, রাগ, উত্তেজনা।

'একটা বাক্স,' ধীরে ধীরে বলল এঞ্জিনিয়ার।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' খেঁকিয়ে উঠল পারকিন। 'কি আছে ওতে?'

ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার ভাবল, বলে, জানি না। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। সত্যি কথাই বলল, 'কিছু না, আরও সার্কিট ব্রেকার।'

'খোলো! কুইক!'

নিজের ব্যাগে হাত ভরে স্ক্রু-ড্রাইভার খুঁজতে শুরু করল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার।

'তুমি, কর্নেল,' বিগ হার্ভের দিকে তাকাল পারকিন, 'তোমার চোখ পেতে পারো, কিন্তু আর কোন অজুহাত না দেখিয়ে সী-লেভেলে নামাও প্লেন।'

সীট বেল্ট বাঁধার নির্দেশ দেবে একটা আলো, পাইলটকে সেটার বোতাম টিপতে বলল কমান্ডার। তারপর ঘুরিয়ে নিল প্লেন।

পাইলট জানাল, প্লেনকে নিচে নামাবার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করেছে সে। তার দিকেই মনোযোগ ছিল পারকিনের, এই সময় রহস্যময় বাক্সের ঢাকনি থেকে একটা স্ক্রু খুট করে পড়ে যেতে সেদিকে তাকাল সে। ঢাকনিটা তুলল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার, ভেতরে দেখা গেল অনেকগুলো সার্কিট ব্রেকার।

রিভলভার নেড়ে নির্দেশ দিল পারকিন, 'ওগুলো অফ করো!'

অসহায় চোখে কমান্ডারের দিকে তাকাল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু রিভলভারটা তার নাকের ডগায় নিয়ে এল পারকিন। 'ওদিকে নয়, এটার দিকে তাকাও—অফ করো!'

কাঁপা হাত বাড়িয়ে আদেশ পালন করল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার। সাথে সাথেই সোহানার ম্যাপ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সবুজ সাপ।

এগারো

চোখ রগড়াল সোহানা, তাকাল সাবরিনার দিকে। 'মাই গড, ওটা নেই!'

কিভাবে যেন এখনও সোহানার চোখে সবুজ সাপের ছাপ লেগে রয়েছে। চোখ বুজে গভীর মনোযোগ দিয়ে কি যেন স্মরণ করার বা দেখার চেষ্টা করল

ও। 'ওটা দিক বদল করছিল,' বিড় বিড় করে বলল ও। 'সবুজ আলো নিভে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে।' চোখ মেলল আবার। 'হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই–বোয়িং অবশ্যই ঘুরে যাচ্ছিল।' আবার ম্যাপের দিকে তাকাল ও, যেন আশা করছে আবার ফিরে আসবে সবুজ সাপ। 'সম্ভবত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ তৈরি করে ঘুরতে শুরু করেছিল এয়ারফোর্স ওয়ান।'

'আমি কনফার্ম করছি, ম্যাডাম,' কমপিউটর কনসোল থেকে ভেসে এল রাশীদ সোনাইদির গলা। 'আমারও মনে হলো কোর্স বদল করছিল এয়ারফোর্স ওয়ান। মেডিটেরেনিয়ান ধরে না গিয়ে ঘুরে গেল এড্রিয়াটিকের দিকে...'

'কিন্তু কেন?' বিড় বিড় করে উঠল সোহানা। 'আমরা ট্রেসই বা হারালাম কেন? এ-ও কি তাহলে যান্ত্রিক গোলযোগ?'

ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। কাছে ছিল সাবরিনা, ছোঁ দিয়ে ক্রাডল থেকে তুলে নিল রিসিভার। নিজের পরিচয় দিয়ে নিঃশব্দে অপরপ্রান্তের কথা শুনল সে, তারপর সোহানাকে বলল, 'জেনারেল টমসন, সোহানা। পেন্টাগনও ট্রেস হারিয়ে ফেলেছে।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সোহানা। 'জেনারেলকে বলো, পরে কথা বলব,' দ্রুত বলল ও। 'রাশীদ, ওই ফাইটারগুলো! কয়েক মিনিট আগে যে অর্ডার দিয়েছি, ওদেরকে সেটাই জানাও–এই মুহূর্তে টেক-অফ করতে হবে। এয়ারফোর্স ওয়ানের পথ অনুসরণ করবে ওরা।' কনসোলের দিকে মাথা নিচু করে আঙুল নেড়ে আড়ষ্টতা কাটাতে চেষ্টা করল রাশীদ।

'থামো,' চিৎকার করে বলল সাবরিনা।

ফিরল সোহানা, দেখল, একটা হাত তুলে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত দিচ্ছে সাবরিনা, পেন্টাগন অপারেশন সেন্টারের কথা শুনছে গভীর মনোযোগের সাথে। মাউথ পিসে হাত চাপা দিয়ে দ্রুত বলল সে, 'জেনারেল টমসন বলছেন, জিব্রালটার রাডার এইমাত্র রিপোর্ট করল, এয়ারফোর্স ওয়ান এখনও তার নির্দিষ্ট কোর্সে রয়েছে। রিপিট, এয়ারফোর্স ওয়ান এখনও তার নির্দিষ্ট কোর্সে রয়েছে। ওদের রাডারের নাগালে ওই আকারের আর কোন প্লেন নেই, বোয়িঙের আইডেনটিফিকেশন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই ওদের।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সোহানা। সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ উঁচু করল। 'রাশীদ, যা বলেছি করো। ফাইটার টেক-অফ করুক। জিব্রালটার রাডার কি বলল, পেন্টাগন কি বলল, ওদের কথায় আমি কান দিই না! মারাত্মক কিছু একটা ঘটছে এবং সেটা দুর্ঘটনা হতে পারে না। এ কবির চৌধুরী না হয়েই যায় না! আমি জানি, কবির চৌধুরী।'

হাত ইশারায় সোহানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সাবরিনা, টেলিফোনের রিসিভার বাড়িয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'জেনারেল টমসন।'

'এসব কি ঘটছে, সোহানা?' হেঁড়ে গলায় চিৎকার জুড়ে দিলেন জেনারেল। 'আমরা ট্রেস হারালাম, অথচ তারপরই জিব্রালটার রাডার বলছে,

বোয়িংকে ওরা বহাল তবিয়তে দেখতে পাচ্ছে। এসবের মানে কি, ফর গডস সেক?'

'মানে হলো, নেপলস কমান্ডের কাছ থেকে একটা ঈগল ফ্লাইট চেয়েছি আমি,' গম্ভীর সুরে বলল সোহানা। 'এর মানে হলো, আমি বিশ্বাস করেছি, আপনাদের প্রেসিডেন্টের প্লেন বিপদে পড়েছে, এবং সেটা প্রাকৃতিক কোন বিপদ নয়। এর মানে, ওপেক মন্ত্রী আর আমার দু'জন এজেন্টের প্রাণের ওপর আমি কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই।'

'কি···কি করেছ তুমি?' সগর্জনে জানতে চাইলেন জেনারেল।

'প্রথমবারই শুনেছেন আপনি, জেনারেল,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সোহানা।

পেন্টাগনের অপারেশন রূমে নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে থাকল। তারপর, সম্পূর্ণ শান্ত এবং সুস্থির কণ্ঠে জেনারেল টমসন বললেন, 'তুমি ঠিকই করেছ, সোহানা। কাজটা আমারই করা উচিত ছিল। কি খবর হলো, জানিও। এদিক থেকে আমি যদি কিছু জানতে পারি, তোমাকে টেলিফোন করব।'

'একটা কাজ আপনি এই মুহূর্তে করতে পারেন,' বলল সোহানা। 'এন্ডরু এয়ারবেসকে বলুন, এয়ারফোর্স ওয়ানের সাড়া নিয়ে জানতে চাক, সব ঠিক আছে কিনা। উত্তরে কোন অস্পষ্টতা বা এড়ানো ভাব থাকলে আমরা বুঝব, প্লেনে অঘটন ঘটে গেছে।'

'ঠিক আছে,' বলে রিসিভার রেখে দিলেন জেনারেল টমসন। হাঁক ছেড়ে একজন সহকারীকে ডাকলেন তিনি। ওদিকে আকাশের আরও ওপরে ওঠা অনেক আগেই শেষ করেছে নকল এয়ারফোর্স ওয়ান, আসল এয়ারফোর্স ওয়ানের নির্দিষ্ট কোর্স ধরে উড়ছে সে, জিব্রালটার রাডারকে বোকা বানাবার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে তার। স্পীড কমে প্রতি ঘণ্টায় দেড়শো মাইলে দাঁড়িয়েছে, এখন আবার ধীরে ধীরে ওপর থেকে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে প্লেনটা।

অবশেষে স্ট্র্যাটোলাইনারের সাড়া পেল এন্ডরু। 'তোমাদের ব্যাপারটা কি?' জানতে চাওয়া হলো। 'নেপলস আর এথেন্স বলছে, তোমাদেরকে হারিয়ে ফেলেছে ওরা। তোমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাও কাজ করছে না। ইনার্শিয়াল গাইডেন্স সিস্টেমও অকেজো হয়ে গেছে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'দু'দিকেই যান্ত্রিক গোলযোগ, আমার ধারণা,' এয়ারফোর্স ওয়ান থেকে বলল স্কিপার।

'তুমি কে কথা বলছ, প্যাট?' জিজ্ঞেস করল এন্ডরু।

'নয় তো কে?'

'কর্নেল আছে ওখানে?' আবার প্রশ্ন করল এন্ডরু।

উত্তর করল কো-পাইলট, 'কর্নেল বিগ হার্ভে বলছি। কি ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করেছ তোমরা? আমরা শিডিউল ধরে এগোচ্ছি, সময়মতই জেনেভায় পৌঁছব। মাসুদ রানা শুভেচ্ছা জানিয়েছে। ওর বোধহয় আজ রাতে ডিনার খাবার ডেট আছে এক সুন্দরীর সাথে—যতবার দেখা হয়েছে, আপনমনে হাসতে

দেখেছি ওকে।'

আরও নানা প্রসঙ্গ তুলল এভরু, কিন্তু সন্দেহ জাগার মত কিছু পেল না। সুখবরটা জেনারেল টমসনকে পৌঁছে দিল ওরা। জেনারেল সোহানাকে রিপোর্ট করলেন, সব ঠিক আছে।

কিন্তু ইতোমধ্যে আকাশে ডানা মেলে অনেকদূর চলে গেছে সোহানার ফাইটার স্কোয়াড্রন, ওগুলোকে এখন আর ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। যদিও সেরকম কোন ইচ্ছেও সোহানার নেই।

নিখুঁতভাবে হিসেব করা শিডিউল চেক করল নকল এয়ারফোর্স ওয়ানের স্কিপার, তারপর কো-পাইলটকে বলল, 'এবার আমাদের কেটে পড়ার সময় হয়েছে।' প্যারাস্যুটের স্ট্র্যাপ আটকে নিয়ে ইমার্জেন্সী এগজিটের দিকে এগোল ওরা। অটোপাইলটে চলছে প্লেন, উচ্চতা আর গতি অস্বাভাবিক কম থাকায় ফ্রেটারের স্লিপ-স্ট্রীম ওদের জন্যে কোন বিপদের কারণ হয়ে উঠবে না।

একটা কান রেডিও ডেস্কের দিকে খাড়া রাখল স্কিপার, এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠবে সিগন্যাল। সিগন্যালটা এল ওদের দু'মাইল নিচের মেডিটেরেনিয়ানে ভাসমান একটা জাহাজ থেকে। ইমার্জেন্সী এগজিট লেখা রয়েছে দরজার মাথায়, তার পাশেই ছোট একটা বাক্স। সেটার ঢাকনি খুলে একটা বোতামে চাপ দিল সে। অন্ধকার হয়ে গেল প্লেন। শূন্যে লাফ দিয়ে তুমুল বাতাসে পড়ল স্কিপার আর কো-পাইলট।

স্ট্র্যাটোলাইনারের স্টেটরুম থেকে বেরুতে যাবে রোজি, সীট-বেল্ট বাঁধার আলোক-সঙ্কেত জ্বলে উঠতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অনুভব করল, স্টারবোর্ডের দিকে কাত হয়ে গেল প্লেন। 'জেন্টলমেন,' বলল সে, তারপর অস্বস্তি দূর করার জন্যে খুক করে একটু কাশল, এবার শুরু করল আরও একটু গলা চড়িয়ে। ইতোমধ্যে মাথাগুলো ওর দিকে ঘুরতে শুরু করেছে, প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে বিদ্ধ করা হচ্ছে তাকে।

আলোক-সঙ্কেতটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে আবার শুরু করল রোজি, 'কমান্ডার অনুরোধ করেছেন, সীট-বেল্ট বেঁধে নিন, প্লীজ।'

ওয়াল ক্লকের দিকে রোজির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এনার্জি সেক্রেটারি ম্যালকম ফিলপট বললেন, 'গন্তব্যে পৌঁছুতে এখনও প্রায় হাজার মাইল বাকি, এত তাড়াতাড়ি সীটবেল্ট বাঁধতে হবে কেন?'

'বোধহয় আমাদেরকে একটু দোল খাওয়াবেন কমান্ডার,' রসিকতা করে বললেন লিবিয়ার তেলমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ ইবরাহিম আতাফী।

'সামান্য টার্বুলেন্স,' বলল রোজি।

বাহরাইন শেখ বললেন, 'কিন্তু আমরা যেন নিচের দিকে নামছি!'

'তাই,' দাদুকে সমর্থন করে বলল কিশোর ফারুক। 'সেকেন্ডে পঞ্চাশ ফিট বা কাছাকাছি হারে।'

তেরো বছরের একটা ছেলের মুখ থেকে বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ এবং এইরকম একটা তথ্য বেরিয়ে আসায় সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হলেন ম্যালকম ফিলপট। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। কিছু বলতে যাবেন, এই সময় নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ইরাকী তেল মন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আদনান দারজাল। তিনি বললেন, 'আমাদের খোকাবাবু ঠিকই বলছে। আমরা নিচে নামছি।'

আবার সবাই রোজির দিকে তাকাল। একটু লালচে হয়ে উঠল তার চেহারা। 'ঠিক আছে···খোঁজ নিয়ে দেখছি। সন্দেহ নেই, এটা কোন ব্যাপারই নয়। সামনে হয়তো ভারী মেঘ জমেছে, এড়িয়ে যেতে চাইছেন কমান্ডার। আপনারা কেউ বিচলিত হবেন না, প্লীজ।'

'না-না,' সহাস্যে রসিকতা করলেন বৃদ্ধ শেখ জাহিদ আল খালিদ। 'তুমি থাকতে আমাদের ভয় কি!'

কিন্তু তাঁর এই রসিকতায় সবার মুখে হাসি ফুটল না।

রোজির দিকে তাকাল ফারুক। বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন, এটা আবহাওয়ার জন্যে ঘটছে? সম্ভাবনা কম।'

'কেন? সম্ভাবনা কম কেন?' সকৌতুকে জানতে চাইলেন ম্যালকম ফিলপট। ছেলেটা তাঁর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে।

'আবহাওয়া খারাপ হলে এইরকম খাড়াভাবে ডাইভ দিত না প্লেন,' শান্ত, কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল ফারুক। 'এয়ার পকেট বা টার্বুলেন্সে পড়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমরা, সোজা কথায়, হু হু করে নেমে যাচ্ছি শুধু।'

চেয়ারের ওপর শিরদাঁড়া খাড়া করে বসলেন ম্যালকম ফিলপট। বললেন, 'শোনো, এয়ারম্যান। প্রেসিডেন্টের অবর্তমানে আমিই এখানে হোস্ট, এবং আমাদের খুদে বন্ধুর কথায় যুক্তি আছে বুঝতে পেরে আমি জোর দাবি জানাচ্ছি, কি ঘটছে তা আমাদেরকে জানানো হোক। আমরা কমান্ডারের নির্দেশ মত সীট-বেল্ট বাঁধছি, কিন্তু তুমিও বেরিয়ে গিয়ে ক্রুদের একজনকে ডেকে নিয়ে এসো—সে আমাদের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবে।'

আবার দরজার দিকে এগোল রোজি, কিন্তু বোয়িঙ হঠাৎ একটা তীব্র ঝাঁকি খাওয়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চেয়ার থেকে পড়েই যাচ্ছিলেন শেখ দারজাল, হাতল ধরে কোনরকমে এড়ালেন দুর্ঘটনা। টেবিল থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল একটা কাপ, সেটা ধরার জন্যে টেবিলের ওপর একরকম ঝাঁপিয়ে পড়লেন শেখ জাহিদ আর শেখ আতাফী। প্লেনের পিছন দিক থেকে ভেসে আসা একাধিক শব্দ শুনে রোজি বুঝল, গ্যালিতে কেটলি আর কাপ-পিরিচ ভেঙে চুরমার হচ্ছে। পাশ থেকে বমির আওয়াজ পেয়ে উদ্বেগের সাথে ঘাড় ফেরালেন শেখ জাহিদ। দেখলেন, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে ফারুক। নাতির দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি। তারপর মাথা তুলে একটা আঙুল নেড়ে কাছে ডাকলেন রোজিকে।

'ফারুকের ওষুধ, ইয়ং লেডি! কুইকলি!'

কাত হয়ে থাকা প্লেনের ভেতর হাঁটতে গিয়ে বারবার পড়ে যাবার উপক্রম করল রোজি। তবু গ্যালির দিকে ছুটল সে। সিরিঞ্জ আর ইনসুলিন ক্যাপসুল ওখানেই রেখে এসেছে ও।

পথে কারও সাথে দেখা হলো না রোজির। এর কারণ বুঝতে না পেরে তার উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল। গ্যালির দরজা খুলে ভেতরে পা ফেলতে যাবে, আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে এল ও। দরজার ঠিক ভেতরেই পড়ে রয়েছে পিটি ফবের আর হেলেন।

কালো, অশুভ একটা আকৃতির মত উড়ে চলেছে বোয়িংটা। ওটার দু'পাশে চলে এল সামনের দুটো ফাইটার। বাকিগুলো অনেক পিছনে রয়ে গেছে, সাহায্যের জন্যে ডাক পড়লে আসবে। ঈগল লীডার বোয়িংকে ডাকল, কিন্তু তার রেডিওর কোন সাড়া পেল না।

'এর মানেটা কি?' জানতে চাইল দ্বিতীয় ফাইটারের পাইলট। 'প্লেনের ভেতর কোথাও আলো নেই কেন? তোমার ওদিক থেকে কিছু দেখা যাচ্ছে, লীডার?'

'কিছুই না,' উত্তর করল লীডার। 'তুমি একটু নিচে নামো দেখি। যতটা সম্ভব আরও কাছে এসো। দেখো, কিছু দেখা যায় কিনা। সিগারেটের আগুন, দিয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি–কিছু একটা না দেখলে নেপলস কন্ট্রোল আর ইউনাকোকে বিশ্বাস করাব কিভাবে যে এটা সত্যি ভূত নয়?'

বোয়িঙের একেবারে কাছে চলে এল দ্বিতীয় ফাইটারের পাইলট, বিভিন্ন উচ্চতা থেকে ভেতরে তাকাতে চেষ্টা করল সে। তারপর রিপোর্ট করল, 'কিছু না। মস্ত বড় একটা ফাঁপা বেলুন। প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে, লীডার। গোটা প্লেন খালি–ক্রু, প্যাসেঞ্জার, আলো কিছু নেই।'

'কিন্তু, তা কি করে হয়!' স্কোয়াড্রন লীডার অবিশ্বাসের সাথে বলল, 'এটা সাধারণ কোন প্লেন নয়, এয়ারফোর্স ওয়ান। ক্রুরা আরোহীদের নিচে ফেলে দিয়ে নিজেরা সীটের নিচে বসে আত্মহত্যা করেছে, তুমি আমাকে এই ধরনের কিছু বিশ্বাস করতে বলো?' একটু থেমে আবার জানতে চাইল লীডার, 'ভাল করে দেখেছ তো? দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি কিছু?'

এক মিনিট পর দ্বিতীয় ফাইটারের পাইলট বলল, 'হ্যাঁ...' ইতস্তত করল সে, তারপর আবার বলল, '... মানে, একটা ব্যাপার ঠিক মিলছে না।'

'কি মিলছে না?' উত্তেজিত হয়ে উঠল স্কোয়াড্রন লীডার। 'বলো আমাকে!'

কমলা রঙের উজ্জ্বল আলো দেখা দিল দুই ফাইটার প্লেনের মাঝখানে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ কানে ঢোকার আগে শক ওয়েভের ধাক্কায় প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো ফাইটার দুটো। আগুন আর ধোঁয়া ঘিরে ধরতে শুরু করল ওগুলোকে। এক মুহূর্ত পর নরককুণ্ড থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ওরা–একটা ডান দিক থেকে, আরেকটা বাঁ দিক থেকে। তারপর আবার দ্রুত একটা বৃত্ত রচনা করে জ্বলন্ত বোয়িঙের দিকে ফিরে আসতে শুরু করল। সাগরের দিকে

নেমে যাচ্ছে বোয়িং। তাকে একেবারে সাগরের পিঠ পর্যন্ত অনুসরণ করল পাইলট দু'জন। আতঙ্কিত লীডার কাঁপা গলায় রিপোর্ট করল নেপলস কন্ট্রোলকে।

নেপলস কন্ট্রোল আঁতকে উঠল। জানতে চাইল, 'গুলি?'

'না!' চিৎকার করে জবাব দিল ঈগল ফ্লাইটের লীডার। 'গুলি খাবে কোত্থেকে! গুলি খায়নি! স্রেফ...বিস্ফোরিত হলো। আমাদের একেবারে চোখের সামনে, নাকের ডগায়। মিসাইল হলে দেখতে পেতাম না আমরা? নিশ্চয়ই বোমা। খালি প্লেনের ভেতর বোমা...নিশ্চয়ই তাই!'

'খালি?' জানতে চাইল নেপলস।

'পজিটিভ। খালি আর অন্ধকার। ভেতরে কোন আলো ছিল না।'

'এবং কোন সন্দেহ নেই, ওটা এয়ারফোর্স ওয়ান?'

'পজিটিভ।'

'কোন ভুল নেই?'

'পজিটিভ।'

'না।'

নেপলস কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল, 'কে বলল কথাটা?'

'ঈগল টু,' দ্বিতীয় ফাইটারের পাইলট নিজের পরিচয় দিল।

'কি বলতে চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল নেপলস কন্ট্রোলার।

'বলতে চাইছি, আমি মনে করি, ওটা এয়ারফোর্স ওয়ান ছিল না।'

এবার নিস্তব্ধতা ভাঙতে রাজি হলো না নেপলস কন্ট্রোল।

ঈগল টু থেকে পাইলট বলল, 'প্রথমে কয়েকটা তথ্য দিন আমাকে। এয়ারফোর্স ওয়ানের দরজা, মেইন হ্যাচ বলা হয় যেটাকে, কি রকম দেখতে?'

'দরজা কি রকম দেখতে মানে?' হতভম্ব হয়ে জানতে চাইল নেপলস কন্ট্রোল। 'নিশ্চয়ই আর সব বোয়িঙের দরজা দেখতে যেমন হয় সেই রকমই হবে। কেন?'

'ডাইমেনশন, ধরুন, চার ফিট?'

সাড়া দিল না নেপলস কন্ট্রোল। একটু পর বলল, 'অপেক্ষা করো।' আরও একটু পর জানানো হলো, 'আমাদের সামনে এখন বোয়িঙের স্পেসিফিকেশন রয়েছে। ওটা একটা স্বাভাবিক আকারের হ্যাচ, সাধারণ লোকজন আসা-যাওয়া করতে পারবে, এইভাবে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্ন কেন?'

'কারণ, এই বোয়িঙের দরজা সাত ফিট চওড়া। খুব বেশি, তাই আমার চোখে পড়েছিল।'

'তার মানে ওটা ছিল একটা...'

'তাহলে ওটা কখনোই এয়ারফোর্স ওয়ান হতে পারে না!' বিজয়ীর সুরে বলল ঈগল-টু-পাইলট।

'...আমারও তাই ধারণা, স্যার,' নিচু গলায় বলল সোহানা। এইমাত্র নেপলস কন্ট্রোলের সাথে কথা শেষ করেছে ও। এখন কথা বলছে মেজর জেনারেল

রাহাত খানের সাথে। 'জ্বী, স্যার।...আমি জানি কে আছে এসবের পিছনে...ঠিক আছে, স্যার।...জ্বী, স্যার।...না...হ্যাঁ। জ্বী।'

ঝড়ের বেগে চেম্বারে ঢুকল সাবরিনা। 'সত্যি? জেনারেল টমসন বললেন, এয়ারফোর্স ওয়ানকে নাকি বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে? সত্যি?'

শান্ত নিরুদ্বিগ্ন চোখে সাবরিনার দিকে তাকাল সোহানা। 'হ্যাঁ, কিন্তু জেনারেল টমসনকে জানিয়ে দাও আসল নয়, ওটা নকল এয়ারফোর্স ওয়ান। আসলটা হারিয়ে গেছে। গায়েব হয়ে গেছে বেমালুম।'

***

নকল রানা-২

· প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪

এক

দুর্গম এলাকা, চারদিকে বহু দূর পর্যন্ত কোন লোকালয় নেই। পাহাড় গিরিখাদ আর উপত্যকা ঘেরা এই পরিত্যক্ত রানওয়ের দু'পাশে ঘন ঝোপ-ঝাড় জন্মেছে, বন-মোরগ আর শিয়ালের আস্তানা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিধ্বস্ত দালান-কোঠার মাঝখানে আজও দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা হেলে পড়া পিলার, দু'দশটা মাথা ভাঙা পাঁচিল আর দেয়াল, রাতের তারা জ্বলা আকাশের গায়ে বেঢপ কিম্ভূতকিমাকার ফ্রেমের মত লাগছে ওগুলোকে। যুগোস্লাভিয়ার মাটিতে এয়ারস্ট্রিপটা তৈরি করা হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, জার্মানদের প্রয়োজনে। জায়গাটা অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের তীরে, সাইবেনিক আর জাদারের মাঝখানে। এয়ারস্ট্রিপ সহ চারদিকের বেশ বড় একটা এলাকা বর্তমানে মস্কো-পন্থী একটা গোপন রাজনৈতিক দলের দখলে। বেশ ক'বছর আগে কে.জি.বি.-র সাহায্যে বিদ্রোহী একটা গ্রুপ এই দল তৈরি করেছে, মস্কোই এই দলের নীতি নির্ধারণ করে দেয়, দলটা চলেও কে.জি.বি.-র টাকা আর বুদ্ধিতে। কয়েকশো গেরিলা যোদ্ধা রয়েছে এই দলে, সবাই সোভিয়েট সামরিক অফিসারদের কাছ থেকে ট্রেনিং পেয়েছে।

গভীর একটা খাদের কিনারায় এসে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে রানওয়ে। শীতের শেষে বরফ গলতে শুরু করলে এই খাদ হয়ে ওঠে খরস্রোতা পাহাড়ী নদী। রানওয়ের ডান পাশে, খাদের কিনারা থেকে বেশি দূরে নয়, কংক্রিটের তৈরি একটা বাঙ্কার, ভেতর থেকে মাথা তুলে আছে দু'জন গেরিলা।

ফাটল, চিড়, ছোট-বড় গর্ত বুকে নিয়ে পড়ে আছে রানওয়ে, সবটুকু এখন আর ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ব্যবহার-উপযোগী রানওয়ের শেষ মাথায়, খাদের কিনারায়, পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে নিচু পাঁচিল, যদিও ধেয়ে আসা একটা জেট প্লেনকে ঠেকাবার সাধ্য এই পাঁচিলের হবে না।

রানওয়ের দু'ধারেই, এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত, কয়েক হাত পর পর বসানো হয়েছে বড় আকারের মাটির প্রদীপ, শেষ প্রান্তে নিচু পাঁচিলের ওপর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে আরও প্রায় একশোটা। বাতাসে নাচছে, পত পত আওয়াজ করছে শিখাগুলো। কিন্তু এত তোড়জোর আর আয়োজন সত্ত্বেও, এই এয়ারস্ট্রিপের ডিজাইন যে সাতশো সাত বোয়িং ল্যান্ড করার কথা মনে রেখে তৈরি করা হয়নি, সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

ছোট একটা বাঙ্কারের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে কবির চৌধুরী, সামনেই নিচু কংক্রিটের পাঁচিল। তার পরনে বাদামী রঙের স্যুট, হাতে ওয়াকিং স্টিক, চোখে অদ্ভুতদর্শন একজোড়া চশমা। পাঁচিলের ওদিকে অপেক্ষা করছে চল্লিশ-

বিয়াল্লিশ জন গেরিলা, পরনে কালচে সবুজ আর সবুজাভ হলুদ রঙের ছোপ দেয়া কাপড়ের তৈরি ইউনিফর্ম, সবাই সশস্ত্র। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তাদেরকে পজিশন নিতে বলল কবির চৌধুরী।

বাঙ্কার থেকে উঠে রানওয়ের ওপর চলে এল সে। এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করে গেরিলারা কে কোথায় পজিশন নিয়েছে নিজের চোখে দেখল সব। তারপর রিস্টওয়াচ তুলল নাকের সামনে। সাথে সাথে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটল কপালে। আকাশে মুখ তুলে খুঁজতে লাগল—কোথায় এয়ারফোর্স ওয়ান!

অস্থিরভাবে রানওয়ের ওপর পায়চারি শুরু করল কবির চৌধুরী।

তার এবারকার এই অপারেশনের প্ল্যানিঙে কিছু খুঁত রয়ে গেছে, জানে সে। জেলখানায় বন্দী ছিল বলে সব কাজ সময় মত সারতে পারেনি, ফলে হাত মেলাতে হয়েছে মস্কোর সাথে। কে.জি.বি. তাকে কাজ চালাবার মত একটা রানওয়ে আর সশস্ত্র লোকজন দিয়ে সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু তাদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না সে। তার এই অপারেশন সফল হলে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মান ধুলোয় লুটাবে, সেই সাথে ওপেকের সাথে তেল চুক্তি হবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে, এসব খুব ভালভাবে বুঝেছে বলেই তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে মস্কো। কিন্তু সে জানে, ব্যাপারটা যদি কেঁচে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সাহায্য করা তো দূরের কথা, চোখ উল্টে নিতে একটুও বাধবে না কে.জি.বি-র। কাজেই, নিজেকে সাবধান করে দিয়েছে কবির চৌধুরী, সতর্ক থাকতে হবে তাকে।

একটা কথা মনে পড়ে যেতে মুচকি একটু হাসল সে। হাত যে তারও একেবারে খালি, তা নয়। অন্তত একটা অস্ত্র তার কাছে রয়েছে। কে.জি.বি. অ্যাবাউট টার্ন করতে যাচ্ছে বুঝতে পারলে সে-ও গুমোর ফাঁস করে দেবে, দুনিয়ার লোককে জানিয়ে দেবে এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাক করে ওপেক মন্ত্রী আর মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারিকে জিম্মি রাখার তার এই অপারেশনে সহযোগী ছিল সোভিয়েট রাশিয়া। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি আর সুনাম নষ্ট করার মস্কোর কুমতলব সাথে সাথে বুমেরাং হয়ে দেখা দেবে, বেরিয়ে পড়বে রাশিয়ার আসল চেহারা, দুনিয়ার লোক ছি ছি করবে।

ক্ষীণ, কিন্তু ভরাট একটা আওয়াজ বাধা দিল চিন্তায়, মুখ তুলে আবার আকাশের দিকে তাকাল কবির চৌধুরী। ধীরে ধীরে আত্মতৃপ্তির উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মুখে। আসছে। আসছে এয়ারফোর্স ওয়ান! শাবাশ পারকিন, শাব্বাশ!

রানওয়ে থেকে সরে এসে হাতের ছড়ি দিয়ে মাটির ওপর একটা মানচিত্র আঁকল কবির চৌধুরী! নিখুঁত হলো না, কিন্তু যে-কেউ দেখলেই চিনতে পারবে—যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র। 'কেমন মজা!' ম্যাপটাকে উদ্দেশ্য করে ব্যঙ্গের হাসি হাসল সে। 'আমাকে ঠকাবার এই হলো উচিত সাজা! ভায়া প্রেসিডেন্ট, কিছু মনে কোরো না, তোমাকে আমি একটু বাঁদর নাচ নাচাব!'

এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে, সেটাকে ছাপিয়ে উঠল কবির চৌধুরীর অট্টহাসি।

*

এয়ারফোর্স ওয়ানের ফ্লাইট ডেকে থম থম করছে পরিবেশ।

বোয়িঙের ভেতর পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করছে কোডি পারকিন অর্থাৎ নকল মাসুদ রানা। চীফ স্টুয়ার্ড, একজন স্টুয়ার্ডেস, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট গডলিম্যান এবং কয়েকজন এঞ্জিনিয়ারকে অ্যারোসল গ্যাস স্প্রে করে অজ্ঞান করেছে সে। আরোহীদের কাউকে ঘাঁটায়নি, কারণ জানে, তারা কেউ ওর কাজে বাদ সাধতে আসবে না। তাদের সাথে স্টেট রুমে রয়েছে আরও একজন স্টুয়ার্ডেস, রোজি। তাকেও গোণার মধ্যে ধরেনি সে। সমস্যা দেখা দিতে পারত ফ্লাইট ডেকের লোকজনদের নিয়ে, কিন্তু তাদের মনে যথেষ্ট ভয় ঢোকাতে পেরেছে সে। তার হাতে রিভলভার আর চোখে খুনের নেশা দেখে সাবধান হয়ে গেছে সবাই। ইতিমধ্যে বোয়িঙের কোর্স বদলাতে বাধ্য করেছে সে। নাক ঘুরিয়ে নতুন কোর্সে প্লেন চালাচ্ছে কমান্ডার বিগ হার্ভে।

গন্তব্য জানিয়ে রানওয়ের বর্ণনা দিচ্ছিল পারকিন, তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে চড়া গলায় জানতে চাইল কর্নেল বিগ হার্ভে, 'পরিষ্কার করে বলো। লম্বায় কতটা?'

'পাঁচ হাজার ফিট,' বলল নকল রানা। 'কিছু কম হতে পারে।'

'হোয়াট!'

'জেটের জন্যেই তৈরি করা হয়েছিল এই রানওয়ে, তবে বড় ধরনের জেটের জন্যে নয়।'

'এ অসম্ভব, রানা,' প্রতিবাদের সুরে বলল কমান্ডার।

'আমি তোমার সাথে তর্ক করব না,' বলল পারকিন। 'বলব অসম্ভবকে সম্ভব করো! তোমরা এখানে সবাই মার্কিন বিমান বাহিনীর সেরা লোকজন রয়েছ, অসম্ভবকে সম্ভব করার ট্রেনিং পেয়েছ—কাজে লাগাও সেটা। ও, হ্যাঁ, রানওয়ের শেষ মাথায় একটা খাদ আছে— কাজেই সাবধান!'

'খাদ!'

'বেশ গভীর,' বলল পারকিন।

'জেসাস ক্রাইস্ট!'

মুচকে হাসল পারকিন। 'তারচেয়ে বরং আল্লা-খোদার নাম নাও, ফাঁড়া কেটেও যেতে পারে।'

নেভিগেটর লে. কর্নেল অ্যান্থনি পল জানাল, পোর্ট সাইডে মনে হচ্ছে একটা দ্বীপ এগিয়ে আসছে।

অকারণ ঝাঁঝের সাথে পাইলট প্যাট্রিক হল্ বলল, 'তুমি নেভিগেটর, আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছ কেন? কি ওটা?'

কবি কবি চেহারার পাইলটকে সাধারণত রাগতে বা উত্তেজিত হতে দেখা যায় না। কিন্তু এখনকার কথা আলাদা। এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাক হয়ে যাচ্ছে অথচ কারও কিছু করার নেই, মেজাজ তো বিগড়ে থাকবেই। তাছাড়া, ওদের প্রায় সবারই কমবেশি ঘনিষ্ঠতা রয়েছে মাসুদ রানার সাথে, এতদিন রানাকে ওরা পরম বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, সৎ এবং আদর্শবাদী মানুষ হিসেবে জেনে

এসেছে—আজ সেই লোক হঠাৎ করে এই রকম বেঈমানী করে বসলে কার মেজাজই বা ঠিক থাকে? রানার এই আচরণ বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু নিজেদের চোখকে তো আর ওরা অবিশ্বাস করতে পারে না।

শান্তভাবে ব্যাখ্যা করল লে. কর্নেল পল, বোয়িং যদি নতুন কোর্সে ঠিক থাকে, ওটা তাহলে ভিজ দ্বীপ। তারপর জানতে চাইল, 'তোমরা কেউ আর কোন দ্বীপ দেখতে পাচ্ছ?'

'কোন্ দিকে?'

'স্টারবোর্ডের দিকে।'

অন্ধকারে তাকিয়ে চোখ জ্বালার চেষ্টা করল পাইলট। ডান দিকে অস্পষ্ট দুটো আকৃতি ঠাহর করতে পারল সে। রিপোর্ট করল নেভিগেটরকে।

'চেনা গেছে,' বলল লে. কর্নেল। 'প্রথমটা হভার, দ্বিতীয়টা ব্রাক। যতক্ষণ না মেইনল্যান্ডের মাটি চোখে পড়ে, সোজা নাক বরাবর চালিয়ে যাও।'

গুরু গম্ভীর আওয়াজ বেরিয়ে এল কমান্ডারের গলা থেকে, 'ধন্যবাদ।'

খুক করে একটু কেশে নিজের উপস্থিতিটা ওদেরকে স্মরণ করিয়ে দিল পারকিন। তার দিকে না ফিরে, ভারী গলায় জানতে চাইল বিগ হার্ভে, 'এয়ারস্ট্রিপ সম্পর্কে আরও তথ্য চাই আমার, রানা।'

'রানওয়েটা মাটির প্রদীপ দিয়ে চিহ্নিত করা আছে…'

ধীরে ধীরে পারকিনের দিকে ফিরল কমান্ডার, মুখ ঝুলে পড়েছে। 'কি? মাটির প্রদীপ?'

'হ্যাঁ। কুয়াশায় খুব কাজ দেয় ওগুলো।'

'কুয়াশা!' অবাক দেখাল পাইলটকে। 'কোথায় কুয়াশা!'

'নেই, কিন্তু থাকতে পারত,' জবাব দিল পারকিন। 'এদিকের আবহাওয়া ঘন ঘন চেহারা বদলায়।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কমান্ডার বলল, 'বলে যাও।'

দেঁতো হাসি হেসে অভয় দিল পারকিন, দুঃসংবাদের এখানেই ইতি। বলল, 'কিছু আধুনিক ইকুইপমেন্টও আছে ওখানে। একটা ট্র্যান্সপন্ডার আছে, তোমাদের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে অপারেট হয়, কাজেই এয়ারস্ট্রিপের পজিশন পিনপয়েন্ট করতে কোন অসুবিধে হবে না। আরও রয়েছে একটা ভি-এইচ-এফ রেডিও, ব্যাটারিতে চলে— মাটির আকার-আকৃতি কোথায় কি রকম জানাবার জন্যে সেটা ওরা ব্যবহার করবে।'

'তার মানে ইংরেজি জানে ওরা,' বিদ্রূপের সুরে বলল কমান্ডার বিগ হার্ভে। 'আমি তো ভেবেছিলাম ওরা বোধহয় পাথর যুগের লোক হবে, আকার-ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করবে।'

'ওদের মধ্যে একজন অন্তত আছেন যিনি পাথর যুগের ওই ভাষাটাও জানেন,' বলল পারকিন।

পাইলট বলল, 'আমরা বোধহয় গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছি। ফ্রিকোয়েন্সির ব্যাপারে শিওর হওয়ার জন্যে ভি-এইচ-এফ রেডিও অন করা যাবে?'

'কেন যাবে না,' বলল পারকিন। 'তবে টিউন করব আমি নিজে।'

খালি হাত দিয়ে হেডসেটটা কানের সাথে চেপে ধরে একশো আঠারো দশমিক এক পয়েন্ট ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্ট করল পারকিন, তারপর যোগাযোগ করল ডেলটা বেসের সাথে। ডেলটা এয়ারস্ট্রিপ, ডেলটা বেস—এগুলো কবির চৌধুরীর দেয়া নাম। বিগ হার্ভের হাতে কমিউনিকেটর ধরিয়ে দিল নকল রানা। বিশুদ্ধ উচ্চারণে অত্যন্ত মার্জিত ভঙ্গিতে ইংরেজিতে কথা বলল এক ভদ্রলোক, বোয়িং ল্যান্ড করাবার জন্যে যা-কিছু জানা দরকার তার সবই বিস্তারিত জানতে পারল বিগ হার্ভে। রানওয়ে হেডিং, এয়ারোড্রোম লেভেলে অ্যাটমসফেরিক প্রেশার, বাতাসের মুখ আর গতি—সব। 'তোমাদের স্ক্রীনে ট্র্যান্সপন্ডার ব্লিপ দেখে এয়ারফিল্ডের সঠিক পজিশন জানতে পারবে,' সব শেষে বলল কবির চৌধুরী। 'তখন আবার যোগাযোগ কোরো।'

'ঠিক আছে,' বলে পারকিনের হাতে হেডফোন ফিরিয়ে দিল বিগ হার্ভে। ধন্যবাদ জানিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল পারকিন। কমান্ডারের দিকে ফিরল সে, জানতে চাইল, 'খুশি?'

জবাব না দিয়ে পাইলটের দিকে ফিরল কমান্ডার। 'আমরা খুব ধীরে, নিচু দিয়ে এগোব। স্ক্রীনে ব্লিপ দেখা গেলে কন্ট্রোলের দায়িত্ব নেব আমি, একশো দশ নটে নামিয়ে আনব স্পীড। তারপর আলো যদি দেখা যায়, উপকূল রেখা পেরোনো যাবে।'

আড়াইশো ফিট থেকে নিচে নামাল না বোয়িং, নাক বরাবর আরও বিশ মাইল এগোল। তারপর ওয়েদার স্ক্রীনে ফুটল সবুজ ফোঁটা।

'তোমার বন্ধুদের বলো, ওদেরকে আমরা চাক্ষুষ করছি,' পারকিনকে বলল কমান্ডার, নিজের অজ্ঞাতেই নকল রানাকে বোয়িঙের একজন বলে মনে করছে সে।

খবর পাঠাল পারকিন। এবারও তার দিকে না ফিরে বিগ হার্ভে বলল, 'এখনকার কাজ কি রকম জটিল, ভালই জানা আছে তোমার—কাজেই, দয়া করে, দশ-পনেরো মিনিটের জন্যে তুমি যদি চোখের সামনে থেকে দূর হতে, আমরা সবাই স্বস্তি বোধ করতাম।'

প্লেন বাঁক নিতে শুরু করায় বিগ হার্ভের সীটের পিঠে হাত রেখে তাল সামলাল পারকিন, রিভলভারের মাজল কমান্ডারের চুল স্পর্শ করল। 'তুমি বেশি কথা বলছ, হার্ভে,' বলল সে। 'তোমরা যদি না পারো, আমি নিজে ল্যান্ড করাব বোয়িং।'

'কিভাবে পারো, সেটা দেখতে ইচ্ছে হয়।'

'পারব তাতে কোন সন্দেহ নেই, তুমিও জানো,' সহাস্যে বলল পারকিন। 'কিন্তু সেটা দেখার সুযোগ তোমার বা আর কারও হবে না।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল সে, 'তার আগে তোমরা সবাই মারা যাবে।'

ফ্লাইট ডেকের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল, সেই সাথে সবাই যেন যে-যার কাজে আরও বেশি করে মনোযোগী হয়ে উঠল। শব্দের হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে মেসেজটা ওদের মগজে ঠিকমত ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে পারকিন, তার কথা যে

শুধু কথার কথা নয় এটুকু পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে ওরা।

বাহরাইনী শেখ, শেখ জাহিদ আল খালিদের কিশোর নাতি ফারুক ডায়াবেটিসের রোগী। তার ওষুধ আনার জন্যে গ্যালিতে ঢুকতে যাবে রোজি, দরজা খুলেই দেখতে পেল সামনে পড়ে রয়েছে চীফ স্টুয়ার্ড মাস্টার সার্জেন্ট পিটি ফবের আর স্টুয়ার্ডেস হেলেন। আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে এল সে। নিজের অজান্তেই গলা থেকে চিৎকার বেরিয়ে আসছিল, মুখে হাত চাপা দিয়ে আটকে দিল সেটাকে। তারপর সাবধানে এগোল সে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের প্যাসেজে তাকাল একবার। কাউকে দেখল না, তারমানে কারও সাহায্য পাবার আশা নেই। দোর-গোড়ায় হাঁটু গেড়ে বসল সে। এক এক করে দু'জনকে পরীক্ষা করে দেখল, বেঁচে আছে। কিন্তু বুঝল, জ্ঞান ফিরতে দেরি হবে ওদের।

এদের এই অবস্থার জন্যে দায়ী কে? কোন কারণ ছাড়া দু'জন মানুষ একই সাথে জ্ঞান হারাতে পারে না। ব্যাপারটা কি? চীফ সিকিউরিটি অফিসার মাসুদ রানার কথা মনে পড়ল। কোথায় সে? কি ঘটছে প্লেনের ভেতর? এই মুহূর্তে তার করণীয় কি? তারপর মনে পড়ল, ফারুক অসুস্থ, তার ওষুধ নেবার জন্যে স্টেটরূম থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। অচেতন দেহ দুটোকে টপকে ভেতরে ঢুকল রোজি।

কয়েক সেকেন্ড পর ওষুধের বাক্স হাতে নিয়ে গ্যালি থেকে বেরিয়ে এল সে। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত করল, কিন্তু দেখল, ওদের জ্ঞান ফেরার এখনও কোন লক্ষণ নেই। ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিল ও। প্লেন এখনও গোত্তা খেয়ে নেমে যাচ্ছে, হাতের কাছে দেয়াল, ফার্নিচার যা পেল ধরে তাল সামলাতে সামলাতে স্টেটরূমে ফিরে এল। সৌদী আরবের তেল মন্ত্রী ড. শেখ মোহাম্মদ ওয়াহাব সীট বেল্ট খুলে পঙ্গু শেখ জাহিদ আল খালিদ আর তাঁর নাতি ফারুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। রোজি তাল হারিয়ে পড়ে যাবার উপক্রম করতেই তাকে ধরার জন্যে বিরাট একটা লাফ দিলেন তিনি। টেবিলের ওপর আছাড় খেলো রোজি, তবে সেটা থেকে কার্পেটের ওপর পড়ার আগেই ড. ওয়াহাব তাকে ধরে ফেললেন। কার্পেটের ওপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন, তারপর ড. ওয়াহাব টের পেলেন, প্লেন এখন আর সামনের দিকে ঝুঁকে নেই। রোজিকে ছেড়ে দিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। সৌদী আরবের ঢোলা জাতীয় পোশাকে প্রকাণ্ড শ্বেত ভল্লুকের মত লাগছে তাঁকে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সিধে হলো রোজি।

'আমরা তাহলে এখন আর গোত্তা খাচ্ছি না,' বললেন লিবিয়ার তেল মন্ত্রী ইবরাহিম আতাফী। সুদর্শন চেহারায় স্মিত হাসি লেগে আছে। কাঁচাপাকা মাথার চুল ঠিক-ঠাক করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গোঁফ জোড়ায় একবার চাড়া দিলেন। ইরাকী তেল মন্ত্রী, শেখ মোহাম্মদ আদনান দারজাল, যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া কিছু মেনে নিতে রাজি নন। সামনের চকচকে টেবিলের ওপর একটা

কাপ রাখলেন তিনি। ঠক-ঠক করে একটু কাঁপল সেটা, কিন্তু নিজের জায়গা থেকে সরল না।

'হ্যাঁ,' রায় দিলেন তিনি, 'ঠিক আছে। নিচে নামা থেমেছে।'

তাড়াতাড়ি শেখ জাহিদ আল খালিদের সামনে এসে কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল রোজি। ফারুকের শরীর থেকে শেখ সাহেবের হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, 'চিন্তা করবেন না, প্লীজ, এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।' ফারুকের দিকে মনোযোগ দিল ও। প্রায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হয়েছে ছেলেটার। তার সীট-বেল্ট খুলে দিল ও। গ্রে রঙের স্যুট পরে রয়েছে ফারুক, ট্রাউজারের চেইন টেনে কোমর থেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনল সেটা। শেখ জাহিদ তাঁর হুইলচেয়ারের হাতল ধরলেন এক হাতে, অপর হাত দিয়ে ফারুকের পা দুটো টেনে নিলেন নিজের কোলের ওপর—পুরোপুরি লম্বা হলো শরীরটা। এবার ফারুকের আন্ডারপ্যান্ট ধরে সেটাকেও কোমর থেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনল রোজি। টান টান নিতম্বের চামড়া দু'আঙুল দিয়ে ধরে মাংসের ভেতর এক ডোজ ইনসুলিন ইনজেক্ট করল সে।

প্রায় সাথে সাথেই ঘোরের মধ্যে প্রলাপ বকা থেমে গেল ফারুকের, ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল নিঃশ্বাস। সিল্কের রুমাল দিয়ে তার কপালের ঘাম আলতোভাবে মুছে দিয়ে বিড়বিড় করে শেখ জাহিদ বললেন, 'ঘুমাও, আমার লক্ষ্মী-সোনা, আমার মাণিক-ধন!'

স্টেটরুমের ভেতর এতক্ষণ সবাই উদ্বিগ্ন ছিল, ফারুক সুস্থ হয়ে উঠেছে দেখে আবার সবাই স্বস্তির সাথে যে-যার সীটে নড়েচড়ে বসল। ওপেক মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন আবার। সবার মনেই প্রশ্ন, ব্যাপার কি, প্লেন হঠাৎ বাঁকই বা নিল কেন, তারপর হঠাৎ করে অমন নিচের দিকেই বা নামতে শুরু করেছিল কেন?

সৌজন্যের খাতিরে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন ড. ওয়াহাব, ফারুককে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে দৃষ্টিতে রাগ আর অভিযোগ নিয়ে এবার তাকালেন ম্যালকম ফিলপটের দিকে। বললেন, 'মিনিস্টার, বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এই বিপদ আর অস্বস্তির কারণ আমাদেরকে জানাবেন বলে আপনি কথা দিয়েছিলেন। সেটা আপনি যদি ভুলে গিয়ে থাকেন, অন্যায় করেছেন। এখন আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাই, হিজ একসেলেন্সি শেখ জাহিদের নাতি এখনও অসুস্থ বোধ করছে, প্লেন মাতলামি শুরু করায় তার যে কষ্ট হলো সেজন্যে আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মনে করি, সেই সাথে আপনার কাছ থেকে প্লেনের এই দুর্মতি সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওনা হয়েছে আমাদের।'

মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারি সবিনয় ব্যস্ততার সাথে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার শুরু করলেন ড. ওয়াহাব। জাতিসংঘে সৌদী আরবের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে অনেকদিন ছিলেন ভদ্রলোক, তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা সম্পর্কে উপস্থিত সবাই কম- বেশি পরিচিত। 'আমি শুধু সৌদী রাজতন্ত্র এবং সরকারের তরফ থেকে কথা বলতে পারি—এবং

সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর এবং ব্যাখ্যা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে, যদি না এই মুহূর্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিকতা ফিরে পায় এবং যদি না আপনার ব্যাখ্যা আমাদেরকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে পারে। আর, তেল আলোচনার পরিণতি সম্পর্কে, যা ঘটে গেল এরপর, আমি আর মুখ ফুটে কিছু বলতে চাই না—আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, আপনার কল্পনাশক্তির ওপর ছেড়ে দিলাম ব্যাপারটা, মি. ফিলপট।'

মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারি ম্যালকম ফিলপটের প্রাণবন্ত, পৌরুষদীপ্ত চেহারা নিষ্প্রাণ পাথর হয়ে গেল, মৌনব্রত অবলম্বন করলেন তিনি। কিন্তু নিস্তব্ধতা ধীরে ধীরে অসহ্য হয়ে উঠলে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মন্থর ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে তিনি বললেন, 'আপনাদের সবার কাছে আমি ক্ষমা-প্রার্থী। কিন্তু আপনারা যেখানে আমিও সেখানে—আপনাদের চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না। তবে, এখন আমি জানতে চেষ্টা করব…'

নিজের সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ফিলপট। সেই সাথে রোজির সাথে তাঁর চোখাচোখি হলো। রোজির দৃষ্টিতে বিপদ সঙ্কেত দেখতে পেয়ে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলেন তিনি।

আর সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে শুধু এনার্জি সেক্রেটারিকে সাবধান করতে চেয়েছিল রোজি, কিন্তু ওদের দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় শেখ জাহিদ আল খালিদের চোখে ধরা পড়ে গেল। মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ফিলপট দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমার সাথে এসো, ইয়ং লেডি।' দ্রুত স্টেটরুম থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

'সামনে আলো,' অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভাঙল পাইলট।

'কোস্টাল লাইট হতে পারে,' সাবধান করে দিয়ে বলল লে. কর্নেল পল। 'মাটির দিকে এগোচ্ছি আমরা, কতরকম আলো দেখতে পাব।'

'ফ্ল্যাপস্,' নির্দেশ দিল কমান্ডার।

সেন্টার কনসোলে একটা লিভার রয়েছে, বাঁ হাত বাড়িয়ে সেটা অপারেট করল পাইলট। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের ডান দিকে পজিশন ইন্ডিকেটর, তাতে চোখ রেখে পাইলটের সমস্ত আচরণ লক্ষ্য করছে শুধু কমান্ডার আর নেভিগেটর নয়, কোর্ডি পারকিন্‌ও।

স্পীড কমছে, কিন্তু আরও কমাবার জন্যে তাগাদা দিল কমান্ডার। একটু পর ল্যান্ডিং গিয়্যার নামাতে বলল সে। যেন কোন বোধ নেই, রোবটের মত নির্দেশ পালন করে যাচ্ছে পাইলট। ভারী একটা আওয়াজ এল প্লেনের নিচে থেকে, বোঝা গেল ল্যান্ডিং গিয়্যার নেমেছে। আন্ডারক্যারেজে তালা পড়ার শব্দের সাথে পায়ের তলার মেঝে একটু কেঁপে গেল, জুতো পরা পায়ে সেটা পরিষ্কার অনুভব করল পারকিন। পাইলটের দিকে অপারেটিং লিভারের ওপরে জ্বলে উঠল তিনটে আলো।

ফ্লাইট সিস্টেম এখনও কন্ট্রোল করছে প্লেন, কিন্তু বোয়িঙের আচরণে

এখন কিছুটা অস্থিরতার ভাব দেখা গেল। গতি একেবারে মন্থর করে আনলে সব প্লেনই এই রকম ঝাঁকি খায়।

স্টেটরুমের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে রোজির একটা হাত চেপে ধরলেন ম্যালকম ফিলপট। 'কি ঘটছে আমাকে বলবে, এয়ারম্যান? কিছুই জানো না তুমি, এ-কথা শুনতে চাই না। নিশ্চয়ই জানো...'

কুঁচকে উঠল রোজির চেহারা। 'আপনি আমাকে ব্যথা দিচ্ছেন, স্যার!' বলে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ডলতে শুরু করল সে। 'যা জানি বলছি, কিন্তু এই ঘটনার কোন ব্যাখ্যা আমার জানা নেই।'

পিছনের গ্যালিতে কি দেখেছে রোজি, তার বর্ণনা শুনতে শুনতে হতভম্ব হয়ে পড়লেন এনার্জি সেক্রেটারি। কিছু বলতে চাইলেন তিনি, কিন্তু শব্দগুলো বেরিয়ে আসতে রাজি হলো না।

'আপনি যদি, স্যার, আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমাদেরকে হাইজ্যাক করা হয়েছে কিনা,' নিচু গলায় বলল রোজি, 'আমি বলব—হ্যাঁ। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।'

হতভম্ব ভাবটা কেটে গিয়ে এনার্জি সেক্রেটারির চেহারায় রাগ ফুটে উঠছে।

'যা কিছু ঘটছে স্যার, ঘটছে ফ্লাইট ডেক থেকে,' আবার বলল রোজি। 'আমার ধারণা, ভেতর থেকে ফ্লাইট ডেকের দরজায় তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। তবে, এখানে সেখানে উঁকি দিয়ে দেখলে আরও কিছু প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে, যা দেখে আমরা বুঝতে পারব সত্যি আমাদের একটা বিপদ হয়েছে। আসুন, স্যার।'

পথ দেখিয়ে ম্যালকম ফিলপটকে রেস্টরুম কেবিনের সামনে নিয়ে এল রোজি। দরজা ভিড়ানো রয়েছে, কিন্তু ঠেলা দিতে খুলল না, ভেতরে কিসের সাথে যেন ঠেকছে। রোজির সাথে এনার্জি সেক্রেটারিও দরজার গায়ে চাপ দিলেন। কেবিনের কার্পেটে পড়ে থাকা একজন এঞ্জিনিয়ারের অচেতন শরীর গড়িয়ে গিয়ে থামল টেবিলের পায়ার কাছে। গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠল রোজির চেহারা।

'এই ভয়ই করেছিলাম আমি,' চারজন অচেতন লোক, তাদের মধ্যে একজনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল সে।

'কে ও?' জানতে চাইলেন ফিলপট।

'ব্যাসিল গডলিম্যান। সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। এই দেখুন, হোলস্টার খালি, রিভলভার নিয়ে গেছে।'

'এসবের অর্থ?'

'পরিষ্কার,' বলল রোজি। 'বোঝাই যাচ্ছে, আমাদের সিকিউরিটি চীফ মাসুদ রানা ওখানে আছে,' ইঙ্গিতে প্লেনের নাকের দিকটা দেখাল সে। 'ফ্লাইট ডেকে আর সবার সাথে তাকেও বন্দী করা হয়েছে। আমাদের সাহায্য করবে, তেমন কেউ নেই আর।'

'কেন, তুমি?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন ফিলপট। 'আমার বিশ্বাস, তুমি

সাধারণ একজন স্টুয়ার্ডেস নও।'
'তা নই,' বলল রোজি। 'এবং আমি হাইজ্যাকারের সাথে হাতও মেলাইনি। কিন্তু, আমার কাছে কোন ফায়ার আর্মস নেই। কাজেই আমি কোন সাহায্যে লাগছি না।'
পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে আরও কিছুটা সময় নিলেন এনার্জি সেক্রেটারি। রোজির মনে হলো, ভদ্রলোক একটু যেন ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু তারপরই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়। বললেন, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি!'
'স্যার!'
'বোয়িং হাইজ্যাক হয়েছে শুনেই লেজ গুটিয়ে গর্তে লুকাব, আমি সে-লোক নই,' ভারী গলায় বললেন ফিলপট। 'কে আমাদেরকে হাইজ্যাক করেছে জানতে চাই আমি। জানতে চাই, কেন। জানতে চাই, কোথায় আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পথ ছাড়ো!'
'এক সেকেন্ড, স্যার,' রাজ্যের উদ্বেগ ফুটে উঠল রোজির চোখে-মুখে। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা একান্ত…'
স্থির দৃষ্টিতে রোজির চোখে তাকালেন এনার্জি সেক্রেটারি। 'তুমি ব্যাপারটা বুঝছ না, এয়ারম্যান। এক অর্থে, এটা আমার প্লেন। আমার দায়িত্ব। দায়িত্বে অবহেলা করেছি এই দুর্নাম কেউ আমাকে দিতে পারেনি—আজও পারবে না।' বলে ঝড়ের বেগে রেস্টরুম কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।
ফ্লাইট ডেকের সামনে চলে এসেছেন, তাঁর কনুইয়ের কাছে রয়েছে রোজি। হাত তুলে দরজায় টোকা দিতে যাবেন, এই সময় তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। আওয়াজটা পিছন থেকে এল।
'হাত নামান,' বজ্রকণ্ঠে আদেশ করল।
ঘাড় ফেরালেন ফিলপট। দেখলেন, রোজির ব্লেজারের দিকে রিভলভার তাক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আহমেদ কায়াম। দু'পা পিছিয়ে গেল সে, রিভলভার নেড়ে তার পিছু নেবার মৌন নির্দেশ দিল ওদেরকে। নিঃশব্দে রোজির দিকে তাকালেন ফিলপট, কিন্তু কথা বললেন না। রোজির দেখাদেখি তিনিও অনুসরণ করলেন কায়ামকে। স্টেটরুমের দরজার কাছে এসে ওদের দু'জনের পিছনে সরে গেল কায়াম। দরজা খুলে প্রথমে রোজিকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন ফিলপট। নিজে ঢুকতে যাবেন, পিছন থেকে তাঁর পিঠে কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিল আহমেদ কায়াম। কয়েকটা হোঁচট খেয়ে স্টেটরুমের মাঝখানে চলে এলেন তিনি, একটা টেবিল ধরে শেষ রক্ষার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না—আছাড় খেলেন কার্পেটের ওপর। মাথাটা গিয়ে পড়ল বাহরাইনী শেখের হুইলচেয়ারের একটা চাকার গায়ে।
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন সবাই, কারও মুখে কথা সরল না। তারপর বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠলেন শেখ জাহিদ আল খালিদ, 'কায়াম!' তাঁর চোখ জোড়া থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, এরই মধ্যে হাঁপাতে শুরু করেছেন তিনি, নিঃশ্বাসের সাথে ফুলে ফুলে উঠছে নাকের ফুটো।

'এটা আপনার বাহরাইন নয়,' দোরগোড়া থেকে জবাব দিল আহমেদ কায়াম। 'আপনি এখানকার শাসনকর্তাও নন। চোখ গরম করে কথা না বললেই ভাল করবেন।'

আত্মীয় এবং প্রাইভেট সেক্রেটারি আহমেদ কায়ামের দিকে তাকিয়ে থাকলেন বাহরাইনী শেখ। চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল সমস্ত রাগ, ঝুলে পড়ল মুখ, চোখে ফুটে উঠল নগ্ন অবিশ্বাস। 'আমরা কজন মিলে এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাক করেছি,' আবার বলল কায়াম, 'আগেই বুঝেছেন, প্লেন ঘুরিয়ে নেয়া হয়েছে। জেনেভায় নয়, আমাদের নিজেদের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বোয়িংকে।' রিভলভার ঘুরিয়ে সবাইকে একবার করে নিশানার মধ্যে নিয়ে এল সে। 'যে-যার প্রাণের স্বার্থে চুপচাপ বসে থাকুন। কেউ কোন রকম চালাকি করার চেষ্টা করবেন না।'

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সবাই এত তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠবেন সেটা আশা করা যায় না, কিন্তু ঘটল তাই। মনের ভেতর কার কি ঘটছে বলা কঠিন, কিন্তু চেহারা দেখে মনে হলো ওপেক মন্ত্রীরা শান্ত হয়ে উঠেছেন, চোখে-মুখে উদ্বেগের কোন ছাপ তো নেই-ই, বরং কৌতুক এবং কৌতূহলের ভাব ফুটে উঠেছে। বাহরাইনী শেখও দ্রুত সামলে নিয়েছেন নিজেকে। তাঁকে শান্ত কিন্তু গম্ভীর দেখাল।

'তোমাদের নিজেদের জায়গা—কোথায় সেটা?' জানতে চাইলেন লিবীয় তেল মন্ত্রী সুদর্শন ইবরাহিম আতাফী। 'আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাবার পর কি ঘটবে?'

'সময় হোক, জানতে পারবেন,' বলল কায়াম। লিবীয় তেল মন্ত্রীর কপাল লক্ষ্য করে রিভলভার তুলল সে, কিন্তু মন্ত্রীর নির্বিকার চেহারায় কোন রকম ভাবান্তর ঘটল না। 'এখন আপনারা সবাই আমার বন্দী, কেউ সীট ছেড়ে উঠবেন না। কারও সীট-বেল্ট যেন খোলা না দেখি।'

ধীরে সুস্থে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন ম্যালকম ফিলপট। রীতিমত হাঁপাচ্ছেন। ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধ ডলতে ডলতে তাকালেন কায়ামের দিকে। 'এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাদের,' শান্ত, নিচু গলায় কিন্তু শাসানির সুরে বললেন তিনি। 'এটা প্রেসিডেন্টের প্লেন, যদি ভেবে থাকো এটাকে নিয়ে পালাতে পারবে…'

'প্লেনটা কার,' তাঁকে বাধা দিয়ে বলল কায়াম, 'তা আমরা জানি। সেজন্যেই তো এটাকে হাইজ্যাক করা হচ্ছে। আপনি ভাবছেন আমরা পালাতে পারব না, ওখানেই ভুল করছেন। পারব মা মানে কি? প্লেন চুরি করে আমরা তো এরই মধ্যে পালিয়ে এসেছি। আপনারা প্লেনে যারা রয়েছেন তাদের কারও সাধ্য নেই আমাদেরকে বাধা দেন। আর ওয়াশিংটনে যারা রয়েছে তারা কেউ জানেই না এখানে আসলে কি ঘটছে। আর যদি জানত, বিশ্বাস করত না।'

'বিশ্বাস করত না কেন?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইলেন বাহরাইনী শেখ।

'কারণ, তাদের ধারণা, আপনারা সবাই মারা গেছেন।'

রক্তশূন্য চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রোজি, শেখ আদনানদার-জালের সীটের পিঠ দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে সে। আহমেদ কায়াম তার দিকে ফিরে বলল, 'স্টুয়ার্ডেস হিসেবে তোমাকে আর দায়িত্ব পালন করতে হবে না। গোয়েন্দাগিরি ফলাবার শখটাকেও গলা টিপে মারো। আমার দিকে মুখ করে বসো একটা সীটে, সীট-বেল্ট যেন খোলা না দেখি।'

নির্দেশ পালন করল রোজি। দ্রুত চিন্তা করছে। সোহানা চৌধুরী যা ভয় করেছিল, তাই ঘটে গেছে—মাঝ-আকাশে হামলা চালানো হয়েছে এয়ারফোর্স ওয়ানের ওপর। ইউনাকোর ডেপুটি ডিরেক্টরের কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার, 'তেমন কিছু যদি ঘটে, কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না। যা করার একার চেষ্টায় করতে হবে তোমাকে...'

বিগ হার্ভে ঘামছে—জানে, পাইলট হলের চোখে ধরা পড়ে গেছে ব্যাপারটা। কন্ট্রোলের ওপর হাত আর পা মরা সাপের মত ফেলে রাখতে হয়েছে বলে সাংঘাতিক অস্বস্তি বোধ করছে কমান্ডার। এই মুহূর্তে প্লেন আসলে কমপিউটরই চালাচ্ছে, কমপিউটর ব্রেন থেকে পাঠানো স্পন্দন অনুভব করা ছাড়া করণীয় কিছু নেই তার। বারবার এয়ারস্পীড ইন্ডিকেটরের দিকে তাকাল সে, একশো দশ নটে স্থির হয়ে আছে কাঁটা।

'আর বোধহয় মাইল তিনেক,' বলল হল। 'কিছু দেখছ?'

'কই?' জবাব দিল বিগ হার্ভে। আরও কি যেন বলল সে, কিন্তু পারকিনের গলার আওয়াজে চাপা পড়ে গেল সেটা।

'ওই, ওই দেখা যায়,' চিৎকার করে বলল পারকিন, খালি হাতটা লম্বা করে দিল সামনের দিকে। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সবার দৃষ্টি। মেঘলা আকাশের নিচে, খুব বেশি দূরে নয়, আবছা আলো দেখতে পেল ওরা।

'অলটিমিটার সেটিং,' দ্রুত বলল বিগ হার্ভে।

'ওয়ান-জিরো-নাইন,' জবাব এল পারকিনের কাছ থেকে। 'উইন্ড, থ্রী-সেভেন-ওহ্ ডিগ্রীজ অ্যাট ওয়ান-সিক্স।'

'একেবারে নাকের ডগায়,' বলল কমান্ডার। 'ঠিক আছে, কন্ট্রোল এখন আমার হাতে।' কথা শেষ হয়নি, তার বাঁ দিকের কন্ট্রোল কলামের সুইচ অফ করে অটোমেটিক সিস্টেম বাতিল করে দিল সে। চঞ্চলমতি, এলোমেলো খানিকটা বাতাসের মধ্যে গিয়ে পড়ল প্লেন, লেজ থেকে নাক পর্যন্ত কেঁপে উঠল। স্টারবোর্ড ডানা হঠাৎ করে কাত হয়ে পড়ল, সাথে সাথে দক্ষ হাতে সেটাকে সিধে করল বিগ হার্ভে। রানওয়ে দেখা গেল না, কিন্তু আলোর দু'সারি ছোট ছোট ফোঁটা দেখে বোঝা গেল, ওগুলো মাটির প্রদীপ, মাঝখানে রানওয়ে। প্লেন ল্যান্ড করাবার প্রস্তুতি নিল কমান্ডার।

লম্বা একটা পথ ধরে বিপজ্জনক মন্থর গতিতে নেমে যাওয়া। দু'সারি প্রদীপের মাঝখানে লম্বা একটা কালো গহ্বর। এয়ারফোর্স ওয়ানের নিজস্ব ল্যান্ডিং লাইট জ্বলে উঠল। জোড়া আলোক রশ্মিকে অনুসরণ করল একশো টন ওজনের বোয়িং। এয়ারফোর্স ওয়ান এখন ছুঁড়ে দেয়া ঢিলের মত, তাকে আর

ফেরাবার কোন উপায় নেই। প্রকাণ্ড সিলভার এয়ারলাইনার ঝাঁপিয়ে পড়ল রানওয়ের ওপর, কংক্রিটের সাথে টায়ারের সংঘর্ষে তীক্ষ্ণ, গগন বিদারী আওয়াজ উঠল। স্টিয়ারিং কলাম আঁকড়ে ধরেছে কমান্ডার, আঙুলের মাথা সাদা হয়ে গেছে। সমস্ত জ্ঞান আর কৌশল খাটিয়ে বোয়িংটাকে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে।

'রিভার্স থ্রাস্ট!' চিৎকার করল সে। নির্দেশ পালন করল পাইলট। ছিয়াত্তর হাজার পাউন্ড ওজনের প্রচণ্ড ধাক্কাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে লাইনারের গতি মন্থর করার কাজে লাগানো হলো, সেই সাথে জেটের গম্ভীর গর্জন বাড়তে বাড়তে বিকট হয়ে উঠল।

প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খাবার সাথে সাথে নাটকীয়ভাবে কমে যাচ্ছে প্লেনের গতি, সেই সাথে বোয়িঙের ভেতর যেন তুমুল ঝড় বইতে শুরু করল। স্টেট রুমের আরোহীরা সীট থেকে ছুটে যেতে চাইল সামনের দিকে, কিন্তু সীট-বেল্ট থাকায় মুখ থুবড়ে কার্পেটের ওপর পড়ল না কেউ। তৈজসপত্র, ব্যক্তিগত টুকিটাকি জিনিস, ডকুমেন্ট ভরা কেস আর ব্যাগ—সবার যেন পাখা গজিয়েছে, টেবিল থেকে উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল বাল্কহেডের গায়ে।

বাইরে, বাঙ্কারের কিনার থেকে মাথাটা নিচে নামিয়ে নিল কবীর চৌধুরী, দু'সেকেন্ড পর মাথার ওপর দিয়ে স্যাাৎ করে বেরিয়ে গেল এয়ারফোর্স ওয়ানের একটা ডানা।

রানওয়ের শেষ মাথায় ভিড় করে থাকা প্রদীপের শিখাগুলো কাঁপছে, দ্রুত কাছে চলে আসছে সেগুলো। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কমান্ডার। তারপর, হঠাৎ, প্লেনের নাকের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল আগুনের কাঁপা কাঁপা শিখাগুলো—সামনে কিছু নেই, শুধু গাঢ় অন্ধকার।

হাতের কাছে অটল যা কিছু পেয়েছে তাই আঁকড়ে ধরে রেখেছে বিগ হার্ভে, হল্ আর পারকিন। থেমে যাবার আগের মুহূর্তে দ্রুত ডান দিকে ঘুরে গেল প্লেন, টায়ারগুলো থেকে হু-হু করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। খাদ যেখানে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে, তার কাছাকাছি গিয়ে থামল বোয়িং, পোর্ট সাইডের ডানা ঝুলছে খাদের ওপর।

শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভের ডগা বুলিয়ে পাইলট বলল, 'মস্ত একটা ফাঁড়া কাটল!'

'কাট এঞ্জিন,' আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে বলল কমান্ডার। হাতের কয়েকটা ঝাপটা দিয়ে সুইচগুলো অফ করল পাইলট।

বাঙ্কারের ওপর মাথা তুলে আপনমনে হাসল কবির চৌধুরী। জনান্তিকে বলল, 'জানতাম! ইমার্জেন্সীর সময় ইউ.এস. এয়ারফোর্সের জুড়ি নেই!'

দুই

দুটো এয়ারফোর্স ওয়ান? বিস্ময় প্রকাশ করল জেনারেল টমসন। তা কি করে হয়?

হয়, ব্যাখ্যা করে তাকে বুঝিয়ে দিল সোহানা চৌধুরী। একটাকে হাইজ্যাক করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়া হয়েছে, তার জায়গায় অপরটাকে পাঠানো হয়েছে, রাডার যাতে আবার বোয়িং সাতশো সাতের খোঁজ পায়। অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়ায় আসল এয়ারফোর্স ওয়ানকে কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে ফেলবে রাডার, কিন্তু খানিক পর আবার একই আকৃতির একটা বোয়িং ধরা পড়বে স্ক্রীনে—সঠিক উচ্চতায়, নির্ধারিত কোর্সে উড়তে দেখা যাবে সেটাকে।

'তারপর?'

'তারপর কি ঘটেছে, তাও অনুমান করা কঠিন কিছু নয়,' বলল সোহানা। 'সময় আর সুযোগ মত নকল এয়ারফোর্স ওয়ানের ক্রুরা প্যারাস্যুট নিয়ে লাফ দিয়েছে শূন্যে। সম্ভবত আগেই সিগন্যাল পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সাগরে অপেক্ষা করছিল একটা জাহাজ, পানি থেকে জাহাজীরা তুলে নিয়েছে ক্রুদের। এরপর মাঝ আকাশে বিস্ফোরিত হয় নকল এয়ারফোর্স ওয়ান। প্লেনটাকে টাইম বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার কারণ, পেন্টাগন আর ইউনাকো-কে বিমূঢ়, হতচকিত করে তোলা—এই সুযোগে আসল বোয়িঙকে নিয়ে নিরাপদ কোথাও পালাবে হাইজ্যাকাররা।

'সেই নিরাপদ জায়গাটা কোথায় হতে পারে?' হেঁড়ে গলায় জানতে চাইলেন জেনারেল।

'ইনার্শিয়াল গাইডেন্স সিস্টেম ট্রেস থেকে গায়েব হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে এয়ারফোর্স ওয়ান যেদিকে বাঁক নিচ্ছিল, তা থেকে মনে হয়, গ্রীস অথবা যুগোশ্লাভিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওটাকে।'

'আরও কাছাকাছি কোথাও হতে পারে না?' নানাভাবে প্রশ্ন করে ব্যাপারটা সম্পর্কে সোহানার ধ্যান-ধারণা কি জেনে নিতে চেষ্টা করছেন পেন্টাগন জেনারেল। ইউনাকোর চলতি মেয়াদের ডেপুটি ডিরেক্টর মেয়ে এবং অল্প-বয়েসী হলে কি হবে, বেশ কয়েকটা প্রজেক্টে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে সে, অর্জন করেছে সংশ্লিষ্ট সবার বিশ্বাস আর আস্থা। ব্যক্তিগতভাবে জেনারেল টমসন সোহানাকে স্নেহ করেন, ওর বুদ্ধিমত্তার ওপর অনেকখানি নির্ভরও করেন।

'আপনি যদি আন্দাজ করতে বলেন,' জবাব দিল সোহানা, 'আমি বলব, যুগোশ্লাভিয়া। এর পেছনে যদি কবির চৌধুরী থেকে থাকে, এবং তাকে কেউ যদি সাহায্য করে থাকে, তাহলে ওদের জন্যে যুগোশ্লাভিয়াই হবে আদর্শ জায়গা। কারণ, গ্রীসে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অপারেট করতে পারবে না কবির

চৌধুরী। তার সাহায্যদাতা বলে যাকে আমি সন্দেহ করছি, তার পক্ষেও গ্রীসে নির্বিঘ্নে কাজ করা সম্ভব নয়।'

'কাকে তুমি সন্দেহ করছ?'

'কে. জি. বি.।'

তথ্যটা হজম করার চেষ্টা করলেন জেনারেল টমসন, কিন্তু অখাদ্য মনে হওয়ায় আগ্নেয়গিরির লাভার মত গলা থেকে বের করে দেবার একটা ঝোঁক চাপল। আর কেউ নয়, ইউন্যাকোর ডেপুটি ডিরেক্টরের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য, কাজেই গলার কাছে উঠে এলেও ঢোক গিলে আবার সেটাকে নিচের দিকে নামিয়ে দিলেন তিনি। অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে কবির চৌধুরীর কীর্তিকলাপের চমকপ্রদ একটা ফিরিস্তি দিতে শুরু করল সোহানা। এই রগচটা, প্রতিশোধপরায়ণ, বিদ্রোহী বিজ্ঞানসাধক সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন জেনারেল টমসন, কিন্তু সোহানা থামতে তাঁর মনে হলো, তাঁর জানার মধ্যে অসম্পূর্ণতা ছিল। সোহানার যুক্তির সারবত্তা মেনে নিয়ে ওর সাথে তিনিও একমত হলেন, হ্যাঁ, এই হাইজ্যাকের পিছনে কবির চৌধুরী না থেকেই পারে না। সেই সাথে, সোহানার এই ধারণাও সঙ্গত যে কবির চৌধুরীকে সাহায্য করছে সোভিয়েত রাশিয়া।

সবশেষে তিনি কর্কশ সুরে বললেন, 'তার মানে, সোহানা, আমাদের জন্যে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠল।'

'হ্যাঁ,' সমর্থন করে বলল সোহানা। 'যুগোশ্লাভিয়ার মাটিতে পা ফেলার যো নেই যুক্তরাষ্ট্রের। গ্রীসে আপনাদের উপস্থিতি হয়তো মানিয়ে নেয়া সম্ভব, কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ায় অসম্ভব। তার মানে, জেনারেল, কেসটা আমাদের—মানে, ইউনাকোর।'

ছোট্ট করে হুঁ বললেন জেনারেল, কিন্তু আওয়াজটা গমগম করে উঠল। গম্ভীর সুরে মন্তব্য করলেন, 'দৌড় প্রতিযোগিতায় এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র লাইনের বাইরে পড়ে গেছে, এবং প্রতিপক্ষ এরই মধ্যে ইউনাকোকে পিছনে ফেলে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।'

'কি রকম?' জানতে চাইল সোহানা।

'জাতিসংঘের সর্বশেষ ভিডিও টেপটা দেখোনি তুমি?' তিক্ত হাসলেন জেনারেল টমসন। 'এয়ারফোর্স ওয়ানের নিখোঁজ হওয়াটাকে হাইজ্যাক ধরে নিয়ে জরুরী বিতর্ক অধিবেশন বসেছে। যুক্তরাষ্ট্র আর ইউনাকোকে অপদস্থ করার এই সুযোগ চুটিয়ে কাজে লাগাচ্ছে রাশিয়া। ব্যক্তিগতভাবে তোমাকেও ওরা ছেড়ে কথা বলেনি।'

চাকরিদাতার ওপর একটা চোখ রাখতে ভুলে গেছে বলে নিজেকে তিরস্কার করল সোহানা। রাশীদ সোনাইদিকে ডেকে বলল, 'ভিডিওতে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি দেখতে চাই।'

বিতর্কে অংশগ্রহণ করছে ইরাক, বাহরাইন, ইরান সহ ওপেকভুক্ত সবগুলো রাষ্ট্র, তাদের সাথে যোগ দিয়েছে রাশিয়া এবং তাদের সমর্থক আরও কয়েকটা কমিউনিস্ট দেশ। এরা সবাই প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রকে ধোলাই দিল,

তারপর ইউনাকোর ছাল ছাড়াবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নিমন্ত্রিত মেহমানদের নিরাপত্তা বিধানে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আর ইউনাকোর বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই ধরনের জঘন্য এবং ভয়ঙ্কর একটা ক্রাইম কেন তারা ঘটতে দিল।

'আমাদের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকদের জীবন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা আমরা বরদাস্ত করতে পারি না,' সগর্জনে বলল লিবীয় প্রতিনিধি। 'মাত্র পাঁচ ঘণ্টার একটা প্লেন-জার্নির নিরাপত্তা যারা বিধান করতে পারে না সেই অক্ষম, নির্লজ্জ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতন যে ঘনিয়ে এসেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।'

'এমন কি পশ্চিমা জগতের সাম্রাজ্যবাদী ডাকুরাও ইসলামের খিদমতগারদের বিরুদ্ধে এর আগে এ ধরনের নিষ্ঠুর, কদর্য ষড়যন্ত্র পাকাতে সাহসী হয়নি,' ঝড় তুলল ইরানী প্রতিনিধি। 'আজ আত্মজিজ্ঞাসার সময় হয়েছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার পা-চাটা কুকুরের দল কেন আমাদেরকে তাদের পায়ের ধুলোর চেয়েও অধম বলে মনে করে? আসুন, মুসলিম ভায়েরা, ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচু করে আমরা জেহাদ ঘোষণা করি...'

টিভি মনিটরের সামনে বসে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সোহানা, জানে, আরও খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে ইউনাকোর জন্যে।

'...আর যুক্তরাষ্ট্রের এই চামচা, ইউনাকো, জাতিসংঘের গায়ে এটা একটা দুষ্ট ক্ষত ছাড়া কিছুই নয়,' প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল ইরাকী প্রতিনিধি।

সোভিয়েত রাশিয়া বলল, '...অথচ ভুললে চলবে না যে মহল বিশেষের স্বার্থরক্ষাকারী এই ইউনাকো আমাদেরই টাকায় চলে। কথা ছিল, ইউনাকোর প্রধান কাজ হবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এবং অপরাধ দমন করা। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে, ওয়াশিংটনের খিদমত করাই এর ব্রত হয়ে উঠেছে। এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাক প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই, এটা একটা গোপন ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই হতে পারে না। এই হাইজ্যাকের মূল উদ্যোক্তা সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্র নিজেই, ওপেক মন্ত্রীদের জিম্মি করে তাদেরকে দিয়ে সুবিধেমত একটা তেল চুক্তিতে সই করিয়ে নেয়াই হয়তো উদ্দেশ্য। ইউনাকো এই অপরাধ সম্পর্কে সব জেনেশুনেও মুখ খোলেনি, সেজন্যে আমরা চলতি মেয়াদের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তাকে বরখাস্ত এবং শাস্তিদানের দাবি জানাই। আমাদের বিশ্বাস, এই ভদ্রমহিলা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে মোটা টাকার ঘুষ পেয়েছেন, তা না হলে...'

সুইচের দিকে হাত বাড়াল সোহানা, টিভির পর্দা থেকে ছবি অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে দেখল রাশিয়ান প্রতিনিধি সামনের টেবিলের ওপর ঘুসি তুলেছেন।

গেরিলারা ট্রাক্টর দিয়ে একটা প্রশস্ত কিন্তু জরাজীর্ণ হ্যাঙ্গারের ভেতর টেনে নিয়ে এল এয়ারফোর্স ওয়ানকে। একটা ক্রেনের সাহায্যে শুধু মেইন হ্যাচ অর্থাৎ দরজা ছাড়া বোয়িঙের প্রতিটি ইঞ্চি ঢেকে দেয়া হলো তারপুলিন দিয়ে।

চাকা লাগানো একটা সিঁড়ি চালিয়ে নিয়ে আসা হলো দরজার সামনে, দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল আহমেদ কায়াম। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কবির চৌধুরী, দস্তানা পরা হাতে রূপালি রঙের ছড়ি, ভাব-গম্ভীর চেহারা। তাকে ঘিরে রয়েছে একদল গেরিলা, সবার হাতে একটা করে সাব-মেশিনগান। বিজয়ীর উজ্জ্বল হাসি নিয়ে তরতর করে নেমে এল আহমেদ কায়াম, হাতের রিভলভারটা কাউবয়দের মত অনবরত ঘোরাচ্ছে। কথা বলল না কবির চৌধুরী, তবে খালি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে কায়ামের কাঁধে রাখল। কাজের প্রশংসা এবং স্বীকৃতি জানানো হলো বুঝতে পেরে আনন্দে বিগলিত হলো কায়াম।

এরপর একদল গেরিলা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল, তারা প্লেনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাবার পাঁচ মিনিট পর জিম্মি আর ক্রুদের প্রথম দলটাকে দেখা গেল সিঁড়ির মাথায়। সবার আগে দেখা গেল বাহরাইনী শেখকে, তাঁর হুইলচেয়ারটা ধরাধরি করে নামিয়ে আনল গেরিলারা। তাঁর পিছু পিছু এলেন অন্যান্য ওপেক মন্ত্রীরা। তাঁদের পিছনে রয়েছেন মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারি ম্যালকম ফিলপট। সবশেষে ইউনাকোর রোজি কারভার।

সবিস্ময়ে লক্ষ করল রোজি, তার পিছনে যারা রয়েছে, তাদের মধ্যে সিকিউরিটি চীফ নেই। বুকের ভেতর লাফ দিয়ে উঠল একটা আশা— এখনও হয়তো হাইজ্যাকারদের হাতে ধরা পড়েনি মাসুদ রানা, সুযোগের অপেক্ষায় আছে, সময় হয়েছে বলে মনে হলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘায়েল করবে শত্রুদের, বন্দীদের সবাইকে মুক্ত করবে। নিজের ব্যাপারে তার ধারণা হলো, পরনে এয়ারফোর্স ওয়ানের ইউনিফর্ম থাকায় কেউ তার আসল পরিচয় জানতে পারবে না। কিন্তু তার ধারণা ভুল।

ম্যালকম ফিলপটকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করল রোজি। তাই দেখে কবির চৌধুরীর চেহারা থেকে ভাব গাম্ভীর্যের খোলসটা খসে পড়ল, ঠোঁটে ফুটে উঠল সকৌতুক হাসি। 'আরে-আরে, মুখ লুকাবার চেষ্টা করছ, কে তুমি? আমার আড়াই মিলিয়ন ডলার রোজিনা?' বলল সে। 'এয়ারফোর্স ওয়ানে তুমি থাকবে, এ আমি আশা করিনি! মতলবটা কি বলো তো? পেট্রো-ডলার মালিকদের সাথে তুমি কেন?'

কবির চৌধুরীর চোখে পড়ে যাওয়ায় মনে মনে হতাশ হলেও, আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠল রোজি। এনার্জি সেক্রেটারির পেছন থেকে তাঁর পাশে, কবির চৌধুরীর সামনে এসে দাঁড়াল সে। বলল, 'আবার তাহলে দেখা হলো আমাদের। তা কেমন আছেন, মি. কবির চৌধুরী?'

'দুনিয়ার সেরা হীরে চোর,' মেনিলথিনের দিকে একবার তাকিয়ে বলল কবির চৌধুরী। 'অসাধারণ এক প্রতিভা। হীরে আছে জানলে বাঘের ঘরে হানা দিতেও ভয় পায় না।'

আর কেউ ধরতে না পারলেও রোজি ঠিকই ধরতে পারল, বাঘ বলতে নিজেকে বোঝাতে চাইল কবির চৌধুরী। তার শেষ কথাটার মধ্যে অভিযোগ এবং প্রশংসা, দুই-ই আছে। অভিযোগ এইজন্যে যে, কবীর চৌধুরীর ফ্রান্সের

একটা আস্তানায় হানা দিয়ে আড়াই মিলিয়ন ডলার মূল্যের হীরে নিয়ে পালিয়েছিল রোজি।

একটা সুইস ব্যাংকের ভল্টে হীরে আছে, দাম হবে পাঁচ মিলিয়ন ডলার, খবরটা রোজিকে কবির চৌধুরীই জানিয়েছিল। হীরে চোর হিসেবে রোজির খ্যাতি তখন আকাশচুম্বি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তার ঠিকানা জোগাড় করেছিল কবির চৌধুরী। ব্যাংকের ভল্টটা কোথায়, সিকিউরিটি সিস্টেমের বিবরণ ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছিল সে-ই। তার প্রস্তাব ছিল, কাজটা একার চেষ্টায় করতে হবে রোজিকে, কিন্তু বখরা হবে আধাআধি। প্রস্তাব মেনে নেয় রোজি। কাজটাও নির্বিঘ্নে সমাধা করে। কথা দিয়ে কথা না রাখলে বেঈমানী হয়ে যাবে, তাই কবির চৌধুরীকে তার প্রাপ্য হিসেবে হীরের অর্ধেক ভাগ দিয়ে দেয় সে। রোজির নৈপুণ্য এবং সততা দেখে মুগ্ধ হয় কবির চৌধুরী, রোজিকে প্রস্তাব দেয়, তুমি আমার সাথে হাত মেলাও। কিন্তু রোজি তাতে রাজি হয় না। এরপর দু'দিন ও কাটেনি, রোজি চিন্তা করল, আমার পেশা হীরে চুরি করা, হীরে যার কাছেই থাক, সেটা চুরি করা আমার ধর্ম, এখন যদি আমি কবির চৌধুরীর হীরে চুরি করি তার মধ্যে বেঈমানী বা অন্যায় কিছু থাকতে পারে না। যেই ভাবা সেই কাজ। পরদিনই কবির চৌধুরীর স্যাতোয় হানা দিল রোজি, বখরা হিসেবে তারই দেয়া হীরেগুলো নিয়ে কেটে পড়ল। সেই থেকে রোজিকে অনেক খোঁজ করেছে কবির চৌধুরী, রোজি তাকে ছায়া মাড়াবারও সুযোগ দেয়নি। কিন্তু আজ ঘটনাচক্রে একেবারে বাঘের মুখে পড়ে গেল ও। কবির চৌধুরীর সাথে রোজির এই সম্পর্কের কথা জানা নেই সোহানার, জানা থাকলে এই কাজে সে ওকে হয়তো পাঠাত না।

চেহারায় কোন উদ্বেগ নেই রোজির, কিন্তু বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। বলল, 'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ।'

'তোমাকে পেলাম ভালই হলো,' বলল কবির চৌধুরী। 'আমার আড়াই মিলিয়ন ডলারের একটা সুরাহা হবে। কিন্তু এয়ারফোর্স ওয়ানে তুমি কেন? এর মধ্যে কি যেন একটা রহস্য আছে বলে মনে হচ্ছে?' সন্দিহান দেখাল তাকে।

কবির চৌধুরীকে দেবার মত একটা উত্তর খুঁজছে রোজি, আহমেদ কায়াম বলে উঠল, 'রহস্যটা কি, আমি জানি, স্যার। এই মেয়ে ইউনাকোর একজন এজেন্ট।'

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল রোজির।

'আচ্ছা!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল কবির চৌধুরীর চেহারা। 'তাই তো বলি! এখন তাহলে বোঝা গেল, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা সোহানা চৌধুরী আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল, এয়ারফোর্স ওয়ানের ওপর হামলা হতে পারে! খুবই স্বাভাবিক। কার শিষ্যা দেখতে হবে তো! ঠিক আছে, আহমেদ, আমার এই আড়াই মিলিয়ন ডলারকে আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম। একে নিয়ে যা খুশি করতে পারো তুমি, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে

হবে তোমাকে—খুব যেন কষ্ট পায় ও।'

কবির চৌধুরীর কথা শেষ হতেই খপ্ করে রোজির হাত ধরে নিজের দিকে টানল আহমেদ। অন্য হাতটা দিয়ে কষে এক চড় লাগাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রোজি। এখন সময় নয়, এই অপমানের প্রতিশোধ বেঁচে থাকলে পরে নেয়া যাবে। শয়তানদের আস্তানা কোথায় জানতে হবে তাকে, সম্ভব হলে ইউনাকোর ডেপুটি ডিরেক্টরকে খবর পাঠাতে হবে। তাছাড়া, ওদের সাথে অসুস্থ একটা কিশোর রয়েছে, তার দেখাশোনা করতে হবে ওকেই।

'আমাদের মধ্যে একজনকে দেখছি না,' বলল কবির চৌধুরী। 'সে-ও কি কারও পিছনে আড়াল নিয়েছে? লজ্জা ভাঙেনি তারও?'

'নাচতে নেমে ঘোমটা দেব, আমি সে-লোক নই, মি. কবির চৌধুরী,' প্লেনের দোরগোড়া থেকে বলল কোডি পারকিন।

'এই যে, মেজর মাসুদ রানা, এসো-এসো,' সহাস্যে বলল কবির চৌধুরী। 'আমার আন্তরিক প্রীতি আর ভালবাসা অর্জন করেছ তুমি। আমি তোমার প্রশংসা করি।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে নকল রানা, সবার দৃষ্টি অনুসরণ করছে তাকে। তার হাতে এখনও ধরা রয়েছে রিভলভারটা।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে কয়েক সেকেন্ড রোজির মুখ থেকে কথা সরল না, তারপর চিৎকার করে বলল, 'এ অসম্ভব! আপনি, মাসুদ রানা, অন্তত আপনি বেঈমানী করতে পারেন না!'

'পেরেছে,' বলল কবির চৌধুরী। 'সত্যি কথা বলতে কি, রানা সহযোগিতা না করলে এই কাজ আমরা কিভাবে ম্যানেজ করতাম জানি না!'

ইউ এস কনসাল রিচার্ড অ্যাশফোর্ডের বয়স হবে পঞ্চান্ন, কিন্তু চেহারা থেকে তারুণ্য এবং মন থেকে শখ-সাধ এখনও লোপাট হয়নি। ভদ্রলোক বিপত্নীক, বোধহয় সেজন্যেই তাঁর বন্ধুদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা বেশি। তিনজন সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে ডিনারে বসতে যাচ্ছিলেন তিনি, এই সময় কনসুলেটের গেটের কাছে হৈ-হল্লা আওয়াজ শুনে নিজেই বেরিয়ে এলেন ঝুল-বারান্দায়। প্রাইভেট সেক্রেটারি, তাঁর নিজেরই মেয়ে, বয়-ফ্রেন্ডের সাথে কোন রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে গেছে।

গেটের দু'পাশে দুটো নিচু পিলারের ওপর বেলুন আকৃতির শেড পরানো একজোড়া উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। কনসুলেটের দু'জন সশস্ত্র গার্ড একজন লোকের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে আরবীয় পোশাক, কিন্তু ভেতরে শার্টটা ইউনাইটেড স্টেটস এয়ারফোর্সের। একটু অদ্ভুত লাগল। মনে মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এসে গেল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তাঁর মনে হলো, লোকটাকে তিনি চেনেন, এর আগেও কোথাও দেখেছেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করলেন তিনি, লোকটা বোধহয় কোথাও থেকে মারপিট করে এসেছে, মুখের এখানে সেখানে জখমের চিহ্ন এবং রক্ত লেগে রয়েছে। গার্ডের হাতে রাইফেল এবং হোলস্টারে রিভলভার রয়েছে,

কিন্তু লোকটা সে-সব তোয়াক্কা না করে একরকম গায়ের জোরেই ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। কিন্তু গার্ড দু'জন পথ ছাড়তে নারাজ। দূর থেকে ওদের কারও কথা শুনতে পেলেন না অ্যাশফোর্ড, কিন্তু বুঝলেন, রক্তাক্ত লোকটা বিপদে পড়েই এখানে এসেছে, এবং সম্ভবত তাঁর সাথেই দেখা করতে চায়। গার্ডদের একজনের নাম ধরে ডাকলেন তিনি, জানতে চাইলেন, 'ব্যাপার কি?'

গেটের কাছ থেকে ঝুল-বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল একজন গার্ড। বলল, 'বলছে, ও নাকি এয়ারফোর্স ওয়ানের সিকিউরিটি চীফ, কিন্তু কোন কাগজ-পত্র দেখাতে পারছে না। আপনার সাথে দেখা করতে চায়।'

মাসুদ রানা? বিস্মিত হলেন অ্যাশফোর্ড। এতক্ষণে বুঝতে পারলেন, চেনা চেনা লাগছিল কেন। কিন্তু এই লোক নিজেকে এয়ারফোর্স ওয়ানের সিকিউরিটি চীফ বলে দাবি করে কিভাবে? ঘণ্টাকয়েক আগে নিজের চোখে তিনি মাসুদ রানাকে এয়ারফোর্স ওয়ানে উঠতে দেখেছেন।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন কনসাল। গার্ডকে বললেন, 'ওকে ভেতরে নিয়ে এসে হলঘরে বসাও। আমি কথা বলব।' অতিথিদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাদেরকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন তিনি, তারপর নেমে এলেন নিচে। নামার সময় পুলিসে খবর দেবার কথা মনে পড়ল তাঁর, কিন্তু কি ভেবে সিদ্ধান্ত নিলেন, লোকটার কথা আগে শোনা যাক, তারপর দেখা যাবে। একজনের চেহারা নকল করে খোদ মার্কিন কনসালের সাথে দেখা করতে চায় যে-লোক নিশ্চয়ই শোনার উপযুক্ত কোন কথা আছে তার।

হলঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল রানা, রিচার্ড অ্যাশফোর্ডকে দেখেই এগিয়ে এল।

হাত বাড়িয়ে একটা সোফা দেখালেন কনসাল। 'বসুন।'

বসল না রানা। বলল, 'আমি মাসুদ রানা, রানা ইনভেস্টিগেশনের চীফ। এয়ারফোর্স ওয়ানের সিকিউরিটি চীফ হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমাকে...'

'আস্তে-ধীরে,' বললেন রিচার্ড অ্যাশফোর্ড। গার্ডকে উদ্দেশ করে একটা আঙুল নাড়লেন তিনি, বোঝাতে চাইলেন, হলঘর ছেড়ে কোথাও তাকে যেতে হবে না। তারপর এগিয়ে গিয়ে বসলেন একটা সোফায়। 'আপনি কে আমি জানি না, কিন্তু এয়ারফোর্স ওয়ানের সিকিউরিটি চীফ মি. মাসুদ রানাকে ঘণ্টাকয়েক আগে আমি নিজের চোখে বোয়িঙে চড়তে দেখেছি,' বললেন তিনি।

'আপনার দেখার মধ্যে কোন ভুল নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু যাকে দেখেছেন সে নকল মাসুদ রানা।'

'আপনি দাবি করছেন, আসল মাসুদ রানা সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? কিন্তু কে আসল, কে নকল, আমি বুঝব কিভাবে?'

'আমিই যে আসল, সেটা প্রমাণ করার অনেক রাস্তা বেরিয়ে যাবে,' বলল রানা। 'কিন্তু তার আগে কি ঘটেছে সেটা শুনুন।'

'বেশ। কিন্তু সংক্ষেপে।'

এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাক হয়েছে, শুনে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল কনসালের। এই হাইজ্যাকের পিছনে কে আছে, কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে বোয়িংকে ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু আভাস দিল রানা। তারপর নিজের কথা বলল, কিভাবে কিডন্যাপ করা হয় তাকে, কিভাবে মুক্ত হয়ে পালিয়ে আসে। তারপর জানাল, এই মুহূর্তে ওর সাহায্য দরকার।

কিন্তু এত সহজে চিঁড়ে ভিজল না। কনসালের একই কথা, আপনি যে আসল মাসুদ রানা তার প্রমাণ কি? এই নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে। কয়েকজনের নাম বলল রানা। কনসাল জানালেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে ওরা চাকরি করত বটে, কিন্তু বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেছে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল রানার, গরম হয়ে উঠল ও।

মিনিট পাঁচেক পর মুখ খুললেন কনসাল। হলঘরে আমার পর আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, এর মধ্যে মুহূর্তের জন্যেও উত্তেজিত হননি তিনি। ভাবলেশহীন চেহারা, যেন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করছে না। এই নির্লিপ্ত ভাবটাই খেপিয়ে তুলেছে রানাকে। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'নিজেকে আপনি আমার জায়গায় কল্পনা করুন। তারপর দশ-পাঁচটা নয়, মাত্র একটা কারণ দিন, কেন আপনাকে আমি বিশ্বাস করব। পরনে নোংরা ছেঁড়া স্থানীয় কাপড়, শুধু শার্টটা ইউ এস এ-এফ-এর, হাত আর মুখ থেকে রক্ত ঝরছে, গার্ডদের বাধা তোয়াক্কা না করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। আপনি একটা গল্প শোনালেন, এমন এক লোক বলে দাবি করলেন নিজেকে, যাকে আমি নিজের চোখে এয়ারফোর্স ওয়ানে চড়তে দেখেছি।'

কনসালের কথা রানা শুনছে কিনা বলা মুশকিল, হলঘরের কার্পেটের ওপর অস্থির ভাবে পায়চারি করছে ও।

বলে চলেছেন কনসাল, 'আমি আপনার গল্প বিশ্বাস করতে অস্বীকার করায় আপনি আমাকে অপমান করলেন, হুমকি দিয়ে বললেন ইউনাকোর ডেপুটি ডিরেক্টরকে এবং পেন্টাগনের অপারেশন রুমে টেলিফোন করবেন। তারপর আমি যখন পুলিস ডাকতে চাইলাম, আপনি খেপে উঠলেন। একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে দিন আমাকে···দয়া করে আর কাছে আসবেন না, প্লীজ···এখনও আমি পুলিস ডাকিনি, কারণ, আপনার গল্প এতই অবিশ্বাস্য যে ভাবছি এর মধ্যে নিশ্চয়ই সত্যের দু'একটা কণা থাকতে পারে।'

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে চরকির মত আধ পাক ঘুরে কনসালের মুখোমুখি হলো রানা। 'আরও একজনের কথা মনে পড়েছে, এখানে চাকরি করে। শিলা···'

রানার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কনসাল জানতে চাইলেন, 'শিলা অ্যাশফোর্ড। তাকে আপনি চেনেন?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, পরমুহূর্তে ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল, 'তাকেও কি অন্য কোথাও বদলি করা হয়েছে?'

'না,' শান্ত স্বরে বললেন কনসাল। 'শিলা আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি, এবং মেয়ে। শিলার সাথে আপনার পরিচয়···মানে কি ধরনের পরিচয় আছে?'

'ঘনিষ্ঠ,' বলল রানা। 'ওর সাথে কয়েকটা পাহাড়ে চড়েছি আমি। ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। শিলা কি আপনার...'

'একমাত্র মেয়ে, কিন্তু এই মুহূর্তে নেই এখানে,' বলে গার্ডের দিকে তাকালেন কনসাল। 'দেখো তো, রোজ গার্ডেনে ওকে পাওয়া যায় কিনা।'

এরপর ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল। রেস্তোরাঁয় পাওয়া গেল শিলাকে, মেয়ের সাথে নিজে কথা বললেন কনসাল। সমস্যাটা কি ধরনের তা ব্যাখ্যা করে মেয়েকে তিনি উপদেশ দিলেন, এই লোক নিজেকে মাসুদ রানা বলে দাবি করছে, তাকে তোমার পরীক্ষা করতে হবে। ডিনার-সঙ্গীকে যদি ছেড়ে আসতে আপত্তি থাকে, টেলিফোনেই পরীক্ষা নিতে পারে সে। কিন্তু শিলা জানাল, কতক্ষণই বা লাগবে, সে নিজেই কনসুলেটে ফিরছে—কারণ, টেলিফোনে পরীক্ষা নেয়াটা অপমানজনক হয়ে যাবে, লোকটা যদি সত্যিই মাসুদ রানা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলল, পাহাড় থেকে পড়ে একবার মারাই যাচ্ছিল সে, এই মাসুদ রানাই নিজের প্রাণ বিপন্ন করে বাঁচিয়েছিল তাকে।

দশ মিনিট পর হলঘরে ঢুকল শিলা অ্যাশফোর্ড। সুন্দরী, তা বলা চলে না। চেহারায় পুরুষালি ভাবটা বেশি। বুক যতটা প্রশস্ত ততটা উন্নত নয়। লম্বায় রানার চেয়ে খুব বেশি হলে ইঞ্চি তিনেক ছোট হবে, হাঁটার সময় মাথা উঁচু করে রাখে। রানাকে দেখে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সম্ভাষণের জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে, নিঃশব্দে এগিয়ে এসে বসল বাপের পাশের সোফায়।

'আমাকে চিনতে পারছ?' জানতে চাইল রানা।

'মাসুদ রানার চেহারার সাথে তোমার কোন অমিল, কই, চোখে পড়ছে না,' সতর্কতার সাথে, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল শিলা। 'কিন্তু তুমি নকল কিনা বুঝতে হলে শুধু আমরা দু'জন জানি এই রকম কোন ঘটনার কথা বলতে হবে তোমাকে।'

মাত্র এক মিনিট কথা বলল রানা, একটা হাত তুলে ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বাপের দিকে ফিরল শিলা, 'ড্যাডি, কোন সন্দেহ নেই, ও মাসুদ রানা। দু'একটা ঘটনার কথা যা বলল, আসল রানা ছাড়া আর কারও তা জানার কথা নয়। হাই, রানা?'

'হাই,' বলে কনসালের দিকে ফিরল রানা, শিলাকে এখন আর ওর কোন প্রয়োজন নেই। 'মি. অ্যাশফোর্ড, এবার তাহলে আমরা কাজের কথা শুরু করতে পারি, কি বলেন? এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাক হয়েছে, জিম্মিদেরকে বোধহয় মেরে ফেলা হবে। ওদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হলে একটা সেকেন্ডও নষ্ট করা চলবে না।'

পরবর্তী আধ ঘণ্টা অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হলো রানাকে। মনে মনে প্রচণ্ড রাগে আর অস্থিরতায় উন্মাদ হয়ে থাকল ও, কিন্তু কনসালের সাথে নতুন করে ঝগড়া বাধাল না। ভদ্রলোক প্রথমে যোগাযোগ করলেন আঙ্কারা আর লন্ডনের মার্কিন দূতাবাসের সাথে। তারপর কথা বললেন এন্ড্রু এয়ারফোর্স বেসের সাথে। সবশেষে ফোন করলেন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে, নিজের ছোট

ভাইয়ের কাছে। রানো যদি বদ্ধ উন্মাদ বা নকল হয়, তাহলে তাঁর ক্যারিয়ারের বারোটা বাজতে পারে, তা যাতে না বাজে সে-ব্যবস্থাই করে রাখলেন তিনি। নিজের দিকটা গুছিয়ে নিয়ে হাত দিলেন রানার কাজে, ফোন করলেন ইউনাকোয়। অপরপ্রান্তে ফোন ধরল রাশীদ সোনাইদি। সব শুনে তাঁর কথা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে বসল রাশীদ। অগত্যা যার সমস্যা তাকে সামনের দিকে ঠেলে দিলেন তিনি, অর্থাৎ ফোনের রিসিভারটা ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে। অত্যন্ত হিসেবী মানুষ, যে-ক'টা ফোন হয়েছে সংখ্যা এবং মেয়াদ সহ সব একটা কাগজে নোট করলেন, বিল পাঠিয়ে টাকাটা আদায় করে নেবেন ইউনাকোর কাছ থেকে।

সময় নষ্ট করার কোন সুযোগই রাশীদ সোনাইদিকে দিল না রানা, নির্দেশের সুরে ফোনের রিসিভারটা সোহানাকে দিতে বলল ও। ওজর-আপত্তি তোলার চেষ্টা করল রাশীদ, কিন্তু রানার ধমক খেয়ে সে আর কথা বাড়াল না। অবশেষে সোহানার সাথে যোগাযোগ হলো রানার। কিন্তু এরই মধ্যে, মার্কিন কনসুলেটে ঢোকার পর, মূল্যবান নব্বইটি মিনিট পেরিয়ে গেছে।

ও যে আসল মাসুদ রানা, সোহানার কাছেও সেটা প্রমাণ করতে হলো, তবে মাত্র পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই সম্ভব হলো সেটা। এরপর পরস্পরের মধ্যে তথ্য দেয়া-নেয়া শুরু হলো। হাইজ্যাক ঘটনার সাথে কবির চৌধুরী জড়িত, নিশ্চিতভাবে জানত না রানা, কিন্তু সোহানাকে দু'জন লোকের নাম বলতে পারল ও—মেনিলথিন আর আহমেদ কায়াম। এই ঘটনার সাথে যুগোশ্লাভিয়া জড়িত, রানার কাছ থেকে সেটাও জানল সোহানা। রানাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, সোহানা জানত না। তবে রানাকে সে রাডার অকেজো হবার ঘটনা আর এয়ারফোর্স ওয়ানের ইনার্শিয়াল গাইডেন্স ট্র্যাক অদৃশ্য হবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারল। সব শেষে রানা জানল, আকাশে থাকতেই বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে নকল এয়ারফোর্স ওয়ানকে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল সোহানা। তার আগে তিনটে ব্যাপারে রানার সাথে সম্পূর্ণ একমত হলো সে। এক, নকল রানা সহ এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাক হয়েছে। দুই, এই দুষ্কর্মের হোতা কবির চৌধুরী। তিন, কি কারণে তা এখনও জানা না গেলেও, বোয়িংটাকে কবির চৌধুরী যুগোশ্লাভিয়ায় নিয়ে গেছে—কিন্তু ব্যক্তিগত চেষ্টায় যুগোশ্লাভিয়া থেকে কোন ধরনের সাহায্য কবির চৌধুরীর পাবার কথা নয়, কাজেই নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায়, তাকে অন্য কেউ সাহায্য করেছে—সম্ভবত কে. জি. বি.।

'কিন্তু,' বলল সোহানা, 'হুট করে যুগোশ্লাভিয়ায় আমরা যেতে পারি না। নাক আমরা গলাব, কিন্তু খুব সাবধানে। যুগোশ্লাভিয়া বা কমিউনিস্ট দেশগুলো সাংঘাতিক স্পর্শকাতর। যদি ইঙ্গিত দিই, তোমরা হয়তো জানো না, কিন্তু তোমাদের কিছু লোক অমুক ঘটনার সাথে জড়িত, অমনি ইউনাকোকে শত্রু বলে মনে করে বসবে—অথচ ওরাও এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য।'

'তাহলে?'

'যুগোশ্লাভিয়ায় নয়, আমরা যাব ইটালি—রোমে। জানোই তো,

ইউরোপের দি বেস্ট স্টেজিং পোস্ট বলতে রোমকেই বোঝায়। ওখান থেকেই শুরু করব আমরা।'

'কিন্তু রোমে গিয়ে করবটা কি?'

'চোখ-কান খোলা রাখলে, আমার বিশ্বাস,' বলল সোহানা, 'ওই জার্মান লোকটার খোঁজ পেয়ে যাব আমরা। কি যেন নাম বললে? মেনিলখিন। ওই আমাদেরকে এয়ারফোর্স ওয়ানের কাছে নিয়ে যাবে।'

'সেটা যুগোশ্লাভিয়াতে,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'ততক্ষণে দু'একটা ঘুঁটি নেড়ে আর তদবির করে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে ফেলব,' বলল সোহানা, যুগোশ্লাভিয়া সরকার নিজে থেকেই সাহায্য করার প্রস্তাব দেবে—আমরা যাতে ছোট্ট একটা ইউনাকো ফোর্স নিয়ে ওদের মাটিতে পা ফেলতে পারি।'

'আমরা মানে কি তুমি আর আমি?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা। একটু বিরতি, তারপর আবার শোনা গেল ওর কণ্ঠস্বর, 'ও, হ্যাঁ, আরও একজন—প্লেনেই আছে সে। রোজি কারভার।'

অপরপ্রান্ত থেকে পাঁচ সেকেন্ড কোন সাড়া পেল না সোহানা। তারপর রানা জানতে চাইল, 'রোজি যে ইউনাকোর এজেন্ট, কই, আমাকে তো জানানো হয়নি!'

'এখন হলো,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল সোহানা।

ট্রফিরূমের দেয়াল আর দরজার ফ্রেম পাথরের তৈরি। দরজার ডান দিকে একটা দেয়াল-পর্দা ঝুলছে, ছ'ফিট নেমে এসে মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে সেটা। পর্দার গায়ে ম্লান খয়েরী, সবুজ আর নীল রঙ দিয়ে আঁকা হয়েছে একটা শিকারের দৃশ্য—কয়েকজন শিকারী বুনো একটা শূকরকে খুঁচিয়ে মারছে। এটা একটা অসম যুদ্ধ, তবে বর্শার সাথে তুলনা করার মত দাঁত রয়েছে শূকরের। দেয়াল পর্দার পাশেই একটা তৈলচিত্র, এটাও ছ'ফিট নেমে এসে মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে। এতে যে দৃশ্যটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এমন কতই দেখা যায়। ছোট উপত্যকায় কোণঠাসা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটা মরদ হরিণ। তার সামনে হিংস্র একদল কুকুর, তাদেরকে পিছন থেকে উৎসাহ দিচ্ছে একদল ঘোড়সওয়ার শিকারী—রক্ত লোলুপ বিকৃত চেহারা। একা শুধু হরিণটাই একটু যা আত্মমর্যাদা বজায় রেখেছে, তার বিশাল দুই ধূসর রঙা চোখে ভয় নয়, ফুটে উঠেছে বিমূঢ়তা।

তৈলচিত্র থেকে চোখ গিয়ে পড়ে সাদা দেয়ালের গায়ে ঝুলে থাকা মস্ত একটা মাথার ওপর, রয়্যাল বা ইমপেরিয়াল হরিণের এই মাথা কামরার প্রতিটি অংশ এবং আসবাবসহ গোটা পরিবেশটাকে প্রভাবিত করছে। ল্যাম্পলাইটের আলো লেগে দেয়ালের গায়ে বাঁকা শিং আর তার শাখাগুলোর ছায়া পড়েছে, একটু একটু কাঁপছে সেগুলো। নিষ্ঠুরতা আর আকস্মিক মৃত্যুর চিহ্ন হিসেবে দেয়ালের গায়ে আরও অনেক জিনিস ঝুলছে—ছোট হরিণ, ঈগল, শূকর, চিতাবাঘ, বাজপাখি, পেঁচা, শিয়াল আর পোষা হাউন্ডের মাথা। তারপর,

দু'পাশে খানিকটা করে ফাঁকা দেয়াল নিয়ে মাঝখানে রয়েছে একটা র‍্যাক, তাতে নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র শোভা পাচ্ছে, সবগুলো অকেজো।

আসবাবগুলো মোটা কাঠের, কিন্তু আরামদায়ক। জানালায় লোহার গ্রিল, তার ওপর আবার ক্রস-বার লাগানো হয়েছে। দুটো লণ্ঠন জ্বলছে, তাই আলোর সাথে অন্ধকারও বাসা বেঁধে আছে ঘরের ভেতর—দুটোই জ্যান্ত, নড়াচড়া করছে।

কবির চৌধুরীর বন্দীরা সবাই উপস্থিত এখানে। তাদের হতাশা এবং আতঙ্কের সাথে এই কামরার পরিবেশ অদ্ভুতভাবে মিলে গেছে। এয়ারফোর্স ওয়ানের ফ্লাইট ডেকের ক্রুরা একজন বাদে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে, একেবারে নিচু গলায়। যদিও, কিভাবে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বা সবাই মিলে বাধা দেয়ার একটা চেষ্টা করা যায় কিনা, এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না ওরা কেউ। শুকনো রুমাল দিয়ে ভিজে চোখ মুছছে স্টুয়ার্ডেস হেলেন, একটা হাত ধরে তাকে অভয় এবং সান্ত্বনা দিচ্ছে চীফ স্টুয়ার্ড মাস্টার সার্জেন্ট পিটি ফবের। এঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে একটু দূরে, কার্পেটের ওপর বসে একটা টেবিলের পায়ায় পিঠ ঠেকিয়ে রেখেছে গডলিম্যান, রানা বেঈমানী করায় রাগে ফুঁসছে সে। কোথায় রয়েছে ওরা তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিল এয়ারফোর্স ওয়ানের কমান্ডার কিগ হার্ভে। এয়ারস্ট্রিপটা যুগোশ্লাভিয়ার কোথায়, জানা আছে ওদের। কিন্তু এই দুর্গে ওদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে চোখ বাঁধা অবস্থায়। ধনকুবের ওপেক মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র শেখ মোহাম্মদ ইবরাহিম আতাফী একের পর এক চুরুট ধরিয়ে চলেছেন, কিন্তু মনে মনে সেটা অনুমোদন করছেন না ড. ওয়াহাব। তাঁরা দু'জন নিজেদের মধ্যে কবির চৌধুরীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করছেন। শেখ মোহাম্মদ আদনান দারজালের কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে অনবরত কথা বলছেন এনার্জি সেক্রেটারি ম্যালকম ফিলপট, কিন্তু শেখ সাহেব তাঁর কথা শুনছেন বলে মনে হলো না। কিশোর ফারুককে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে রোজি, এই মুহূর্তে অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই তার। শুধু একজন, তৈলচিত্রের মরদ হরিণের মত, চেহারায় গাম্ভীর্য এবং সতর্কতা নিয়ে প্রতিপক্ষের দুর্বলতা খুঁজছেন, কামরার প্রতিটি অংশে তীক্ষ্ণ নজর বুলাচ্ছেন। তিনি বাহরাইনী শেখ। বৃদ্ধ এবং পঙ্গু হলে কি হবে, বাইরে থেকে কোন সাহায্য এসে পৌঁছুবার আগেই এখান থেকে কোন উপায়ে নিজেদের মুক্ত করা যায় কিনা ভাবছেন তিনি।

হ্যাঙ্গারের সামনে এসে দাঁড়াল মিনিবাস। জানালার কাঁচে মোটা কাগজ সাঁটা হয়েছে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল সশস্ত্র গেরিলারা, কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা জিম্মিদেরকে ইঙ্গিতে এগিয়ে আসতে বলল তাদের একজন। লাইন দিয়ে বাসে উঠল সবাই। গেরিলারা ওদের প্রত্যেকের হাত পিছমোড়া করে বাঁধল, তারপর পট্টি লাগাল চোখে।

হাতে রুপালী রঙের ছড়ি নিয়ে সব দেখল কবির চৌধুরী। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই, তার প্ল্যান মতই এগোচ্ছে কাজ, আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল

চেহারায়। জিম্মিদের চোখ বাঁধা শেষ হতে ঘুরে দাঁড়াল সে, কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে উঠে বসল নিজের গাড়িতে। ড্রাইভিং সীটে বসে আছে একজন গেরিলা, গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

মিনিবাসও রওনা হলো। উপকূলীয় শহর জাদার থেকে মেইন রোড ধরে ম্যাসিনিকা পর্যন্ত এল ওরা, বাঁক নিয়ে আরেক রাস্তা ধরে ছুটল কিনিন-এর দিকে। প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে ডাইনারিক আল্পস, পথ ধরে মিনিবাসও ওপর দিকে উঠতে শুরু করল। চোখে পট্টি থাকায় জিম্মিরা কেউ দেখতে পেল না, যতই এগোচ্ছে ওরা চাঁদের আলোয় ততই দুর্গম দেখাচ্ছে চারদিক। আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে পাহাড়ী এলাকার অনেক ওপরে এবং গভীরে চলে এল বাস, এরপর আরও বাজে পথ ধরে পৌঁছুল সমতল একটা এলাকায়। পথের একধারে পাথরের নিচু, চওড়া পাঁচিল। অপর ধারটা একটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে আছে। পাহাড়ের একটা পাশ ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গেছে, অনেক দূর পর্যন্ত, তারপর বিশাল একটা সমতল এলাকা। দেখে মনে হয়, পাহাড়শ্রেণীর পাঁজর থেকে পাথর তুলে নিয়ে গামলা আকৃতির প্রকাণ্ড একটা স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছে। এই প্রকাণ্ড গর্তের ভেতরই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে উইনডিশরায়েজ দুর্গ।

দিনের বেলা দেখার মত হয়ে ওঠে দৃশ্যটা, এঁকেবেঁকে এগিয়েছে রাস্তা, বারবার বাঁক নিয়েছে, রাস্তার শেষ অংশটা পেরিয়ে এলেই হঠাৎ করে চোখে পড়ে দুর্গ, পাহাড়ের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, তুষার-মানবের মুখে এক স্তূপ কয়লার মত। সরু রাস্তাটা চওড়া হয়ে চৌকো আকৃতি পেয়েছে, এখানে কার-পার্ক। জিম্মিদের সামনে, খাদের ওপর ঝুলছে একটা ড্রব্রিজ। এই সেতু পেরিয়ে যাওয়া যায় একটা করিডর আর এন্ট্রান্স হলে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খিলান আকৃতির প্রকাণ্ড দোর-গোড়া এবং এক জোড়া দরজা পেরোতে হবে। এই মুহূর্তে বন্ধ সেগুলো। দুর্গটা সরু, কিন্তু বেশ লম্বা, পাহাড়ের গায়ের সাথে তাল বজায় রেখে ধনুকের মত বেঁকে গেছে।

পাহাড়ের গা থেকে শুরু হয়ে আকাশ-ছোঁয়া হয়ে উঠেছে পাঁচিলগুলো, মাথায় এসে ঠেকেছে স্লেট পাথরের ছাদ। বন-জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের গা দুর্গকে ছাড়িয়ে আরও অনেক ওপরে উঠে গেছে, মাঝখানে মুখ ব্যাদান করে আছে বিশাল একটা গুহা, ভেতর দিকে ঢুকে গিয়ে পাহাড়ের হৃৎপিণ্ড ছুঁয়েছে সেটা। স্লেটের ছাদ উঠে গেছে পিরামিড আকৃতির গম্বুজের মত, তার নিচে পাথর-পাঁচিলের গায়ে সারি সারি অন্ধকার জানালা।

সাগরের পিঠ থেকে পনেরোশো ফিট ওপরে এই দুর্গ। কবির চৌধুরীর জিম্মিদেরকে ড্রব্রিজ পার করিয়ে ভেতরের একটা উঠানে নিয়ে আসা হলো, এখানে জোড়া কামান পাহারা দিচ্ছে আরও একটা পাথুরে প্রবেশ পথকে। হুকুম পেয়ে গেরিলারা জিম্মিদের হাতের বাঁধন আর চোখের পট্টি খুলে দিল, তারপর পথ দেখিয়ে সবাইকে নিয়ে আসা হলো ট্রফিরূমে। যারা অচেতন ছিল তাদের জ্ঞান ফিরেছে, কারও সাহায্য ছাড়াই সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল তারা। বাহরাইন শেখকে হুইলচেয়ার সহ তুলে নিয়ে ওপরতলায় উঠল ইউ এস

এয়ারফোর্সের দু'জন তাগড়া চেহারার ক্রু। ট্রফিরুমের সামনে সবার আগে পৌঁচেছে কবির চৌধুরী, হাতে লম্বা একটা চাবি নিয়ে অপেক্ষা করছে সে।

'রেডিওরুমে যাও তুমি,' আহমেদ কায়ামকে নির্দেশ দিল সে। 'মেনিলথিন যোগাযোগ না করা পর্যন্ত ওখান থেকে বেরুবে না। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই রওনা হয়ে গেছে সে। মেহমানদের সাথে কিছুক্ষণ আছি আমি, একটু আদর-আপ্যায়ন করি। কিন্তু মনে থাকে যেন, ওর খবর পেলে সাথে সাথে জানাতে হবে আমাকে।'

'জ্বে-আজ্ঞে!' প্রভু-ভক্ত কুকুরের মত একছুটে বিদায় হলো কায়াম। তালার ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাল কবির চৌধুরী, ক্লিক শব্দে খুলে গেল সেটা। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন গেরিলা, হাতে সাব-মেশিনগান।

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল কবির চৌধুরী। ট্রফিরুমে ঢুকল জিম্মিরা। সবশেষে পিছনে গেরিলাদের নিয়ে ভেতরে ঢুকল কবির চৌধুরী। ঘরের ভেতর মৃদু গুঞ্জন জেগেছিল, তাকে ঢুকতে দেখে নেমে এল ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতা।

সবার দিকে একবার করে তাকাল কবির চৌধুরী। কিন্তু কোন কথা বলল না। অগত্যা নিস্তব্ধতা ভাঙলেন এনার্জি সেক্রেটারি ম্যালকম ফিলপট। তিক্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি, হাইজ্যাকার ভদ্রলোক কি তাঁর শর্ত ইত্যাদি স্থির করতে পেরেছেন? তাঁকে আশ্বাস দিয়ে কবির চৌধুরী সহাস্যে বলল, কি শর্ত দেয়া হবে সেটা হাইজ্যাক করার আগেই স্থির করা আছে। এয়ারফোর্স ওয়ানের কমান্ডার বিগ হার্ভে জানতে চাইল, কবির চৌধুরী তাদেরকে কতক্ষণ জিম্মি হিসেবে আটকে রাখতে চায়? চেহারায় সারল্য ফুটিয়ে তুলে চৌধুরী উত্তর করল, 'দাবির টাকা পাবার পর তোমাদেরকে আমি আর এক সেকেন্ডও আটকে রাখব না, বিলিভ মি!'

'যাক,' সশব্দে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন ড. ওয়াহাব, 'বোঝা গেল, অর্থই এই অনর্থের মূল!'

'স্বভাবতই,' হাতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল কবির চৌধুরী। 'আপনাদের মেদবহুল কদাকার চেহারা দেখার জন্যে এত কাঠ-খড় পোড়াইনি আমি।'

'তা,' থেমে থেমে, নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করলেন বাহরাইনী শেখ, 'খোশ-গল্পর শুরুতেই আপনার পরিচয়টা যদি জানতে পারতাম, কৃতার্থ বোধ করতাম আমরা।'

'এক-একজনের কাছে এক-একভাবে পরিচিত আমি,' বলল কবির চৌধুরী। 'কিন্তু আমার আসল পরিচয় মাত্র একটা—আমি একজন বৈজ্ঞানিক।'

'তাই?' ব্যঙ্গ মেশানো কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করলেন বাহরাইনী শেখ। 'কিন্তু আমাদের জানা মতে, বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেন। হাইজ্যাক বা কিডন্যাপ করেন বলে তো কখনও শুনিনি।'

'কবির চৌধুরীর গবেষণা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখে না এমন লোক যদি থেকে থাকে, আমি তাকে গণ্ডমূর্খ বলব। গবেষণার জন্যে আমার আরও টাকা

দরকার, কিন্তু চাইলেই কেউ ও-জিনিস দেয় না। তাই নিজস্ব পদ্ধতিতে ওটা জোগাড় করতে হয়…'

'আমার একটা প্রশ্ন ছিল,' বললেন ড. ওয়াহাব। কবির চৌধুরী কথা থামিয়ে তাকাল তাঁর দিকে। 'আমি জানতে চাই, তোমার এই অন্যায় কাজের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক কতটুকু?'

'হ্যাঁ,' বললেন বাহরাইনী শেখ, 'আমারও এই একই প্রশ্ন। কোন্ ব্লকের লোক তুমি, কার পদ লেহন করে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাও?'

অন্য সময় হলে খেপে উঠত কবির চৌধুরী, অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিষ্ঠুর কোন উপায় বেছে নিত। কিন্তু এই মুহূর্তে আনন্দে ভরাট হয়ে আছে তার মন, ঠাণ্ডা মাথায় চোখা যুক্তি ব্যবহার করে পাল্টা অপমান করার প্রয়াস পেল সে। বলল, 'রাজনীতি নোংরা জিনিস, কাজেই ওসবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আপনারা, বাহরাইনের শেখ আর ওপেক মন্ত্রীদের বলছি, আপনারা চলতি দুনিয়ার সবচেয়ে নোংরা পলিটিশিয়ান। আপনারা গরীব দেশগুলোর স্বার্থ পায়ে ঠেলে তেলের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন, ফলে সারা দুনিয়ায় জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে আকাশে চড়ছে। শুধু আরব আর মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরা ধনী, কিন্তু দুনিয়ার বেশিরভাগ মুসলমান বসবাস করে এই দু'জায়গার বাইরে—তার মানে মুসলমান হয়ে মুসলমানের পেটে লাথি মারছেন আপনারা। পাপ-পুণ্যের কথা বাদ দিলেও, আপনাদের মত অর্থ-পিশাচ আর কেউ আছে? তবে, এই আমি কবির চৌধুরী বলছি, আপনাদের এই সুদিন আর খুব বেশি দিন নয়। যে তেল নিয়ে এত লম্ফঝম্প আর বাবুগিরি-ফুটানি, বিনা পয়সায় দিলেও ও-জিনিস কেউ নিতে চাইবে না। বিকল্প জ্বালানি নিয়ে আমার গবেষণা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে, সফল আমি হবই…' হঠাৎ থেমে গেল সে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি আমরা। ড. ওয়াহাব জানতে চেয়েছেন, রাজনীতির সাথে আমার সম্পর্ক আছে কিনা। আমার উত্তর, না।'

'তুমি শুধু টাকাই চাও?' জানতে চাইলেন শেখ মো. আদনান দারজাল। 'সাথে আর কিছু না?'

তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না কবির চৌধুরী।

'বেশ, টাকা চাও তুমি,' বললেন ফিলপট। 'কিন্তু কি রকম টাকা? কোন দেশের টাকা?'

মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারির দিকে একটু অবাক চোখে তাকাল কবির চৌধুরী, তারপর বলল, 'মন্দ নয়, আপনি ওদের সবার হয়ে আমার সাথে কথা বলতে পারেন। ওদেরকে উদার হবার জন্যে বোঝাতে হতে পারে, সে-দায়িত্বটা আপনিই পালন করুন। আগে টাকার অঙ্কটা বলি। পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চাই আমার।'

কষ্ট করে একটা ঢোক গিললেন ফিলপট, তারপর জিভের ডগা দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। 'নগদ?'

'না,' রোজির দিকে তাকাল কবির চৌধুরী। 'ওই পরিমাণ টাকার কাট

ডায়মন্ড। হীরে জিনিসটা দেখতে ভারি সুন্দর, কি বলো, রোজি?'

একজন বাহরাইনী পুলিস কর্মকর্তাকে মার্কিন কনসুলেটে ডেকে পাঠানো হলো। রানাকে কোথা থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, জড়িতদের চেহারার বর্ণনা, ইত্যাদি সবিস্তারে তাকে জানালেন রিচার্ড অ্যাশফোর্ড। ঠাণ্ডা দেশে যাবে রানা, ওর কাপড়চোপড় যোগান দেয়ার দায়িত্বটা পুলিস অফিসারই উপযাচক হয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিল। ফোন করে ওয়াশিংটন থেকে রাশীদ সোনাইদি জানাল, একটা জেট এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে গালফ আইল্যান্ডের উদ্দেশে, রানাকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দেবে রোমে। জেটের ভেতর একটা হ্যাভারস্যাক পাঠানো হয়েছে, তাতে আছে রানার জন্যে পাসপোর্ট, পরিচয়-পত্র, টাকা। আর অস্ত্রশস্ত্র আছে রানা, রোজি এবং সিক্রেট এজেন্ট গডলিম্যানের জন্যে। ফিল্ড গ্লাস, কমিউনিকেটর ইত্যাদিও পাওয়া যাবে ওতে। রাত পোহাবার আগেই বাহরাইনে পৌঁছে যাবে জেট।

শূন্য-তিন-শূন্য-শূন্য ঘণ্টায় ডিনার পার্টি বাতিল করে দিয়ে মহিলা অতিথিদের বিদায় জানালেন মার্কিন কনসাল। এবং শূন্য-তিন-তিন-শূন্য ঘণ্টায় বাহরাইনী পুলিস কর্মকর্তা ফোন করে রানাকে জানাল, 'মেনিলখিন দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে, স্যার।'

'কোথায় গেছে?'

'প্রথম যাত্রা-বিরতি এথেন্সে,' জানাল অফিসার। 'তারপর জাগরেব।'

কিন্তু সোহানার সাথে আলোচনা করার সুযোগ হলো না রানার। ইউ এন সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে জরুরী মিটিঙে বসেছে সোহানা, তার সাথে যোগাযোগ করার কোন পথ খোলা নেই। অগত্যা জেটে উঠে রওনা হয়ে গেল রানা।

ইউনাকো থেকে রানার জন্যে নতুন নির্দেশ এল আরও দশ মিনিট পরে। নির্দেশে বলা হলো, রোমে নয়, প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে যুগোশ্লাভিয়ায় যেতে হবে রানাকে। ওখানে পৌঁছে মেনিলখিনের জন্যে ওত পেতে অপেক্ষা করতে হবে।

জিম্মিদের সাথে আবার দেখা করল কবির চৌধুরী। এবার সশস্ত্র বডিগার্ড ছাড়াও সাথে তিনজন লোক রয়েছে। তেপায়া, বড় একটা ইলেকট্রিক ব্যাটারি আর পোলারয়েড ক্যামেরা নিয়ে এল ওরা। 'ভাবলাম, আপনাদের ছবি তোলা যেতে পারে,' বলল কবির চৌধুরী। 'এই রকম ভুঁড়ি সর্বস্ব, নির্বোধ, সুখী মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলাম, কিছু স্মৃতিচিহ্ন থাকা দরকার বলে মনে করি।'

প্রস্তুতি নেয়া শেষ হলো. ফ্লাডলাইটের চোখ ধাঁধানো আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল ট্রফিরুম। জিম্মিদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে দেয়ালের দিকে পিছন ফিরিয়ে দাঁড় করানো হলো। দেয়াল থেকে আগেই নামিয়ে ফেলা হয়েছে ট্রফি, ছবি, ফার্নিচার—এসব দেখে কেউ যাতে এই দুর্গ বা এলাকার অবস্থান সম্পর্কে কোন সূত্র না পেয়ে যায়। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, নির্দেশ দিয়ে

জিম্মিদেরকে পোজ নেয়াল কবির চৌধুরী। সামনের সারিতে থাকলেন ওপেক মন্ত্রীরা আর এনার্জি সেক্রেটারি, পিছনের সারিতে থাকল এয়ারফোর্স ওয়ানের ক্রুরা। আহমেদ কায়ামকে নির্দেশ দেবার আগে জিম্মিদের সবার চেহারা খুঁটিয়ে দেখে নিল কবির চৌধুরী। চোখ বা আঙুল দিয়ে কেউ কোন অবাঞ্ছিত সঙ্কেত দিতে পারে। সেক্ষেত্রে বাতিল করতে হবে ফটো। তবে, অতটা সাহস কারও হবে বলে মনে হলো না।

দ্রুত কয়েকটা ছবি তুলল আহমেদ। সেগুলো থেকে চারটে বেছে নিল কবির চৌধুরী। নির্দেশ দিয়ে বলল, লোক মারফত এগুলো এই মুহূর্তে পাঠিয়ে দিতে হবে ট্রি স্টয় আর ডাবরোভনিকে। 'সকালের কাগজে এগুলো ছাপা হতেই হবে,' বলল সে। 'ফটোর সাথে টাকার দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন থাকতে হবে। আর, ভুলো না, অ্যাসোশিয়েটেড প্রেস এজেন্সিতেও এক কপি পৌঁছানো চাই। আমি চাই, খবরটা যুক্তরাষ্ট্রেও ছড়িয়ে পড়ুক। হাজার হোক, ওদেরই তো প্লেন।'

পাইলট হলের কানে কানে কি যেন বলল কমান্ডার বিগ হার্ভে। সেদিকে কান দিয়েছিল কবির চৌধুরী, ধীরে ধীরে সহানুভূতির একটা হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। 'আমার যদি শুনতে ভুল না হয়ে থাকে, কর্নেল,' বলল সে, 'আপনি বলতে চাইছেন, এয়ারফোর্স ওয়ান কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করা স্যাটেলাইট সেন্সিং-ডিভাইসের পক্ষে তেমন কোন সমস্যা নয়। ঠিক?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা দোলাল বিগ হার্ভে।

'আপনাকে নিরাশ করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত,' বলল কবির চৌধুরী। 'প্লেনটাকে তারপুলিন দিয়ে ঢাকার পরপরই এঞ্জিনগুলোর ওপর বরফ চাপা দেয়া হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওগুলো। কাজেই, বোয়িং কোথায় আছে, স্যাটেলাইটের সেন্সিং ডিভাইসের পক্ষেও সেটা জানা আর সম্ভব নয়।' সবার দিকে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিল সে, তারপর আবার বলল, 'রাত কাটাবার জন্যে আপনাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে আহমেদ, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা বিছানা পাবেন এই প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারছি না। আহমেদ?'

ট্রফিরূম থেকে সবাইকে বের করার সময় বাধা পেল আহমেদ। কিশোর ফারুকের কাছ থেকে রোজিকে সরাতে চায় সে, কিন্তু পরস্পরের কাছ থেকে সরতে রাজি নয় ওরা। রোজিকে তার নিজের জন্যে দরকার, অসুস্থ ছেলেটার কি হবে না হবে সে-ব্যাপারে মাথা ঘামাতে রাজি নয় সে।

'ও অসুস্থ,' আবেদনের সুরে কবির চৌধুরীকে বলল রোজি, 'প্লীজ, ওর কাছে থাকতে দিন আমাকে। ও তো কোন অন্যায় করেনি, জিম্মিদের তালিকায় ওর নামও নেই…'

রোজিকে সমর্থন করে বাহরাইনী শেখ জানালেন, ফারুক যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে, একমাত্র রোজির পক্ষেই তার চিকিৎসা করা সম্ভব। আহমেদ কায়ামকে নিরাশ করে দিয়ে রোজির আবেদন মঞ্জুর করল কবির চৌধুরী।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলার একটা কামরায় উঠে এল রোজি আর ফারুক।

ঘরের চেহারা দেখে বোঝা গেল, তাড়াহুড়ো করে বসবাসযোগ্য করা হয়েছে এটাকে। দুটো বিছানা রয়েছে, একটা টেবিল আর একটা ওয়াশ বেসিন। সৌভাগ্যই বলতে হবে, বাথরুমটা সংলগ্ন। সবচেয়ে বিরক্তিকর, ঘরের একদিকের দেয়াল, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত, চেরা। ফাঁকটা বেশ চওড়াও, ছাদের বাড়তি কিনারা বাইরে থেকে রোদ-বৃষ্টি-বাতাস ঠেকাবার কাজ করছে। পুরোটা ফাঁকে সম্প্রতি কাঁচ লাগানো হয়েছে, কিন্তু বোঝা যায়, কামরাটা লুক-আউট পজিশন হিসেবে ব্যবহার করা হত—সেন্ট্রিরুম ছিল। দু'জনেরই বেশ ঠাণ্ডা লাগছে, তা থেকে ওদের ধারণা হলো, কামরাটা অনেক উঁচুতে—ওই লম্বা ভেন্টিলেটরে চোখ রাখলে দুর্গের ভেতর বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে। সেলের ভেতর কোন আলোর ব্যবস্থা নেই, কাজেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কাপড়চোপড় ছাড়তে পারল ওরা। বিছানায় উঠে শুয়েছে রোজি, এই সময় একটা এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। নিচের উঠান থেকে আসছে, মোটরসাইকেলের শব্দ। স্টার্ট নিল।

বিবস্ত্র শরীরে বিছানার চাদর জড়িয়ে নিয়ে লম্বা ফাঁকের সামনে এসে দাঁড়াল রোজি। পাশে এসে দাঁড়াল ফারুক। ঘড় ঘড় একটা আওয়াজ শুনল ওরা। ওদের বাঁ দিকের কোথাও থেকে এল শব্দটা। ফিসফিস করে ফারুক বলল, 'বোধ হয় ড্রব্রিজ…'

'হ্যাঁ,' ঠাণ্ডায় কাঁপতে শুরু করে বলল রোজি। সগর্জনে ছুটে গেল মোটরসাইকেল আরোহী, তার হেডলাইটের আলো আঁকাবাঁকা রাস্তার ওপর প্রায় মাইলখানেক পর্যন্ত দেখতে পেল ওরা।

'ওটা একটা হোন্ডা,' বলল রোজি। যে-কোন গাড়ি এবং মোটর-বাইক সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে তার। চালাতেও জানে।

একমত হয়ে মাথা দোলাল ফারুক। 'হোন্ডামেটিক ফোর-হানড্রেড।'

ঘাড় ফিরিয়ে ফারুকের দিকে তাকাল রোজি, অন্ধকারে ফারুকের চেহারা ভাল ঠাহর করতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানলে কিভাবে?'

হাসল না ফারুক। আপনি লক্ষ করেননি, গিয়ার না বদলে দুশো গজ এগোল লোকটা। হোন্ডামেটিক ফোর-হানড্রেডের মজা হলো: ঘণ্টায় পঞ্চান্ন মাইল স্পীড না ওঠা পর্যন্ত গিয়ার বদলাতে হয় না।'

চোখ বিস্ফারিত করে রোজি বলল, 'আমার জানা ছিল না।'

'সেটাই স্বাভাবিক,' মন্তব্য করল ফারুক। 'মেয়েদের এসব খুঁটিনাটি জানার কথা নয়।'

ঠোঁট টিপে হাসল রোজি। 'ঠিক আছে, মাস্টার সবজান্তা…'

বাধা দিল ফারুক, বলল, 'সবাই আমাকে ছোট ভাবে, কিন্তু আসলে আমি বড় হয়ে গেছি—বয়সের তুলনায় বোধহয় একটু আগেই।'

'তাই?' হাসি চাপল রোজি।

'আমি যে বড় হয়েছি, তার প্রমাণও দিতে পারি,' শান্ত, গম্ভীর সুরে বলল ফারুক। 'যেমন ধরুন, কোন্‌টা উচিত আর কোন্‌টা অনুচিত, আমি ধরতে পারি।'

'কি রকম?'

'অন্ধকারেও সব জিনিস ঢাকা পড়ে না,' বলল ফারুক। 'আপনার গায়ের চাদর একটা কাঁধ থেকে খসে পড়েছে। আপনার সাথে আমি রয়েছি, সেটা আপনার মনে রাখা উচিত ছিল।' বলে এক লাফে বিছানায় গিয়ে উঠল ফারুক, চাদর টেনে মুখ ঢাকল।

খসে পড়া চাদরটা তুলে বুক এবং কাঁধ ঢাকল রোজি। অস্বস্তি বোধটুকু তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠতে পারল সে, কৌতুক বোধ করল। কিন্তু নাম ধরে ফারুককে ডাকতে গিয়ে শুনতে পেল, ছেলেটা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

খুব সকালে জাগরেব এয়ারপোর্টে নামল জেট। ইউনাকোর ডিপ্লোম্যাটিক টিকেট লাগানো থাকায় ব্যাগ আর হ্যাভারস্যাক চেক করা হলো না, কাস্টমস অফিসারদের সন্দিহান দৃষ্টি উপেক্ষা করে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে একটা ছোট কিন্তু শক্তিশালী পোলস্কি ফিয়াট ভাড়া করল ও। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে, ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সময় এসে পৌঁছুল মেনিলথিনের ফ্লাইট।

ফিয়াটের পিছনের সীটে মাথা নিচু করে বসে থাকল রানা, জানালার কোণে চোখ রেখে দেখল, এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে হন-হন করে বেরিয়ে আসছে প্রকাণ্ডদেহী মেনিলথিন।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে দাঁড়াল মেনিলথিন, এদিক ওদিক তাকাল। রাস্তার ওপর থেকে তার নাম ধরে ডাকল কে যেন, 'মি. মেনিলথিন!'

রানা এবং মেনিলথিন দু'জনেই তাকাল সেদিকে। কালো একটা মার্সিডিজ দেখতে পেল ওরা, সুইস নাম্বার প্লেট লাগানো। মেনিলথিনের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠেছে দেখে একগাল হাসল ডাক্তার ডিয়েটর ও কোচের শোফার। রাস্তা পেরিয়ে এসে মার্সিডিজে চড়ল মেনিলথিন, গাড়ি ছেড়ে দিল শোফার।

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে মার্সিডিজকে অনুসরণ করল রানা। মেনিলথিনের সাথে বোঝাপড়া বাকি আছে ওর, কিন্তু তার আগে কবির চৌধুরীর সাথে হিসেব-নিকেশ সারতে হবে। ওকে তার কাছেই নিয়ে যাচ্ছে মেনিলথিন—রানার অন্তত তাই ধারণা।

তিন

এম-টুয়েলভ-এ ধরে দক্ষিণ দিকে ছুটল মার্সিডিজ। রাস্তার ধারে রোড-সাইন দেখে বোঝা গেল, সামনে বুসেভিক, লেকেনিক আর জাজিনা। প্রায় ফাঁকা রাস্তা, ওদের চোখে ধরা না পড়ার জন্যে অনেকটা পিছনে থাকতে হলো রানাকে। উনিশ মাইলের মত এগিয়ে এসে ডানদিকে বাঁক নিয়ে গোরা-র দিকে

ছুটল মার্সিডিজ। তারপর আবার বাঁক নিয়ে পৌঁছুল ছোট একটা প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে।

ঘাস মোড়া একটা মাঠ, মাঝখানে পনেরোশো ফিটের রানওয়ে। জরাজীর্ণ হ্যাঙ্গারের বাইরে রাশিয়ার তৈরি নিঃসঙ্গ হেলিকপ্টার কামোভ দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'কপ্টারের কন্ট্রা-রোটেটিং ব্লেড এরইমধ্যে টেক-অফের জন্য ঘুরতে শুরু করেছে, মার্সিডিজ নিয়ে সেটার কাছাকাছি, ঘাসের ওপর থামল শোফার। রোটরের নিচে দিয়ে মেনিলথিনকে ছুটতে দেখল রানা। 'কপ্টারে চড়ে বসল সে। দরজা বন্ধ হয়নি তখনও, এঞ্জিনের আওয়াজ বেড়ে গেল। পরমুহূর্তে আকাশে উঠতে শুরু করল হেলিকপ্টার।

হতাশ হলো রানা, তিরস্কার করল নিজেকে। এ-ধরনের কিছু ঘটতে পারে, আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল ওর, সেক্ষেত্রে কোথাও থেকে সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করে রাখতে পারত। নিজের বোকামির জন্যে জিম্মিদের কাছে পৌঁছুবার একমাত্র সূত্রটা চোখের সামনে থেকে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, কিছু করার নেই তার। বাতিল লোহা-লক্কড় পাহাড় হয়ে আছে একধারে, তার পিছনে ফিয়াট পার্ক করল ও। স্যাৎ করে বেরিয়ে গেল মার্সিডিজ, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল এয়ারফিল্ডের বাইরে। প্রায় একই সময়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল হেলিকপ্টার। ফিয়াটের ভেতর মন খারাপ করে বসে থাকল রানা। জানে কোন লাভ নেই, তবু হ্যাঙ্গারের ভেতরটা একবার দেখা দরকার। ফিয়াট নিয়েই রানওয়েতে উঠে এল ও। হ্যাঙ্গারের সামনে থামার কোন ইচ্ছে নেই। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ভেতরটা দেখে নিলেই হবে।

হ্যাঙ্গারের সামনে এসেই ব্রেক করতে হলো ওকে। একটা নয়, ভেতরে কয়েকটা হালকা প্লেন দেখতে পেয়েছে ও। গাড়ি থেকে নেমেই ভেতরে ঢুকল না রানা। রানওয়ে ফাঁকা, দু'পাশের মাঠও ফাঁকা...নিশ্চয়ই হ্যাঙ্গারের ভেতর লোকজন আছে। কিন্তু ফিয়াটের আওয়াজ কি তাদের কানে ঢোকেনি? হয়তো আড়ালে কোথাও বসে তাস পিটছে, মশগুল হয়ে আছে খেলায়। সাবধানে, চারদিক নজর রেখে হ্যাঙ্গারের ভেতর ঢুকল ও। কোথায় ওরা?

'কেউ আছ এখানে?'

সাড়া নেই। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্লেনগুলোর দিকে এগোল ও। জোড়া এঞ্জিনের একটা সেসনা, পুরানো একটা পাইপার ট্রাইপেসার, একটা ইটালিয়ান মারচেটি আর কয়েকটা যুগোশ্লাভ ইউটিভিএ। এর আগে চালায়নি বটে, কিন্তু টেকনিকাল জার্নালে নিয়মিত চোখ বুলায় বলে এই প্লেন সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানা আছে ওর। কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে আটভার। হেলিকপ্টারের মত আকাশে দাঁড়িয়ে পড়ে না বটে, কিন্তু গতি একেবারে মন্থর করা যায়। অল্প খানিকটা জায়গা পেলেই উঠতে বা নামতে পারে। বাঁক নিতে পারে দ্রুত। চোয়ালে আঙুল ঘষল রানা, চুয়িংগামের একটা স্টিক মুখে পুরে ভাবল, ঘণ্টায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মাইল, তারমানে কামোভের চেয়ে বেশি স্পীড। আরেকটা কথা মনে পড়ল ওর, হেলিকপ্টারের চেয়ে অন্তত সাতশো ফিট ওপরে উঠতে পারে আটভা। নার্ভাস হাসি ফুটে উঠল মুখে, ভাবল, এবার

দেখা যাক দয়া করে কেউ চাবি রেখে গেছে কি না।

সামনের সারির প্রথম প্লেনটাকে বেছে নিল রানা। চাবি পাবে বলে আশা করেনি, পেয়ে বিশ্বাসই হলো না কিছুক্ষণ। কয়েকবার চোখ পিটপিট করল, ছুঁয়ে দেখল, হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। তাড়াতাড়ি ফিয়াটের কাছে ফিরে এল ও, হ্যাভারস্যাক বের করে লক্ করল দরজা। ওখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাল আবার একবার। কোথাও কেউ নেই। আটভার কাছে ফিরে এল ও। থো করে ফেলে দিল চুয়িংগাম। উঠে বসল ককপিটে। টেক-অফের জন্যে প্রস্তুতি নেবার সময় জানালার নিচে রাখল শরীর, হঠাৎ কেউ যদি এসেও পড়ে ওকে দেখতে পাবে না।

মাস্টার-সুইচ চেক করল রানা, ফুয়েল ইন্ডিকেটর দেখে জানল, ট্যাঙ্ক ভর্তি জ্বালানি রয়েছে প্লেনে। ইলেকট্রিকাল সিস্টেমও নিখুঁত কাজ করছে। স্টিক আর রাডার পেডাল নাড়াচাড়া করল, কন্ট্রোল লক করা নেই। স্টার্ট-কন্ট্রোল অপারেট করতে শুরু করল ও।

প্রথমবারেই স্টার্ট নিল এঞ্জিন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। এখন ওকে কেউ দেখলেও কিছু এসে যায় না। সাবধানের মার নেই, রিভলভারটা বের করে কোলের ওপর রেখে দিয়েছে। কিন্তু মিছেই ভয় পাচ্ছে ও, এয়ারফিল্ডের যতদূর দৃষ্টি চলে কোথাও কারও ছায়া পর্যন্ত নেই। প্লেনের নাক ঘুরিয়ে নিয়ে হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এল ও। দেড়শো গজ পেরিয়ে আসতে না আসতে ইন্ডিকেটরে স্পীড দেখা গেল পঁয়তাল্লিশ নট। সাবলীল ভঙ্গিতে টেক-অফ করল আটভা, ওপর দিকে উঠে যেতে শুরু করল অনায়াস ভঙ্গিতে, খাড়াভাবে খুদে এয়ারফিল্ডের পেরিমিটার পেরোবার সময় অলটিমিটারে দেখা গেল, এরই মধ্যে দুশো ফিট ওপরে উঠে এসেছে প্লেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল রানা, তারপর মেনিলথিনের পিছনে ছুটল দক্ষিণ দিকে। হ্যাঙ্গারের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় জানালা দিয়ে নিচে তাকাল, কিন্তু কোথাও দেখল না কাউকে। আর কারও কথা না হয় বাদই দেয়া গেল, রেসিডেন্ট মেকানিক গেল কোথায়? এতগুলো প্লেন, অথচ পাহারার কোন ব্যবস্থা নেই, এ হয় নাকি? তারপর বিদ্যুৎ চমকের মত একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল মনে—যেভাবে হোক মেকানিককে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে কবির চৌধুরী, মেনিলথিন যাতে নির্বিঘ্নে টেক-অফ করতে পারে।

মেনিলথিনকে কিভাবে আবার পাওয়া যায়, তাই নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করল রানা। কামোভের কোর্স ছিল আন্দাজ একশো নব্বুই ডিগ্রী, সেই একই কোর্স ধরল আটভা। চারদিকটা আরও বড় করে দেখতে পাবার জন্যে চার হাজার ফিট ওপরে উঠে এল রানা। ওর নিচের দুটো দিকই তীক্ষ্ণ চোখে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও—আকাশ এবং মাটির প্রতিটি ইঞ্চি। রোদ ঝলমলে, সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ী ঢাল আর মনোহর উত্থান-পতন দেখেও দেখল না ও। মানুষের তৈরি কিছু দেখতে পায় কিনা, সেদিকে চোখ রাখল। গোটা হেলিকপ্টার দেখতে পাবে, তেমন আশা করে না ও। রোদ লেগে ঝিক করে উঠতে পারে রোটর ব্লেড, উজ্জ্বল নীল আকাশের গায়ে ছোট পোকার মত

একটা কালো বিন্দু চোখে পড়ে যেতে পারে। দুই ঢালের মাঝখানে, সবুজ জঙ্গলের ডগা ছুঁয়ে গুটি গুটি এগোবে একটা ফড়িং। আটভার নিচে দিয়ে ধীরে একটা রাস্তা, একটা নদী আর একটা রেললাইন পিছিয়ে গেল। সহজে চড়া যায় এই রকম একটা পাহাড়ের ভাঁজে গড়ে উঠেছে ছোট একটা শহর, সেটাকে বাঁ দিকে রেখে এগোল রানা। কুকুরের কানের মত নরম একটা চার্ট পেল ও, শহরটাকে গ্লিনা বলে চিনতে পারল। চার্টের ওপর ঝুঁকে পড়ল ও, দেখল, পরবর্তী শহর টোপুসকো—ডানদিকে।

স্টারবোর্ডের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা, শহরটাকে খুঁজছে। ওই দেখা যায় কামোভ, এত নিচ দিয়ে উড়ছে যে প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল মাটির ওপর ওটা একটা গাড়ি।

রানাকে যুগোশ্লাভিয়ায় যাবার নির্দেশ দিয়ে সোহানা সিদ্ধান্ত নিল, আগের প্ল্যান মত সাবরিনাকে নিয়ে রোমেই যাবে সে। এয়ারপোর্টে ভিআইপি-র মর্যাদা পেল ওরা, সাথে সামান্য যা লাগেজ আছে কাস্টমস অফিসাররা তা ছুঁলো না। বাইরে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ন্যাটো সংস্থার একটা স্টাফ কার। ওদেরকে দেখে একজন সামরিক অফিসার গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

দশাসই চেহারা অফিসারের, চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, দুই সুন্দরী ইউনাকো কর্মকর্ত্রীকে দেখে তার চেহারায় কোন ভাবান্তর ঘটল না—গাম্ভীর্যের সাথে শুধু হাত বাড়িয়ে দিল করকম্পনের জন্যে।

'মর্নিং। সোয়ান। ব্রিগেডিয়ার।'

হাসিমুখে হ্যান্ডশেক করল সোহানা, বলল, 'মর্নিং! সোহানা, ইউনাকো।'

ব্রিগেডিয়ার বলল, 'আমি ন্যাটো, নেপলস—এই এলাকার চার্জে আছি।'

সাবরিনাকে দেখিয়ে সোহানা বলল, 'আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, মিস সাবরিনা।' ব্রিগেডিয়ার সাবরিনার সাথেও হাত মেলাল।

সাবরিনা বলল, 'মিস সোহানা তাঁর রেড প্রায়োরিটি ব্যবহার করছেন, অর্থাৎ মেজর জেনারেলের নিচে যে-সব অফিসার আছেন তাঁদের সবাইকে তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে হবে।'

'কি জানি!' গম্ভীর চেহারা আরও গম্ভীর করে তুলে ব্রিগেডিয়ার বলল, 'তবে, কোন প্রশ্ন না তুলে সহযোগিতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে।'

মুহূর্তের জন্যে একটু অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। তারপর আবার বলল ব্রিগেডিয়ার, 'আসুন, গাড়িতে উঠি।' বলে নিজে একটা জাম্প-সীটে উঠে বসল।

সোহানা আর সাবরিনা পাশাপাশি বসল ব্যাক সীটে।

'আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ…' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শুরু করল ব্রিগেডিয়ার সোয়ান।

ব্রিগেডিয়ারকে থামিয়ে দিয়ে সোহানা বলল, 'আমি আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য চাই।'

'যেমন?'

'বিধ্বস্ত এয়ারফোর্স ওয়ানের খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'গাড়ি ছাড়ো,' ড্রাইভিং সীটে বসা করপোরালকে নির্দেশ দিল ব্রিগেডিয়ার, তারপর তাকাল সোহানার দিকে। 'হ্যাঁ, পাওয়া গেছে।'

'কিন্তু,' বলল সোহানা, 'ওটা ঠিক এয়ারফোর্স ওয়ান নয়।'

'হ্যাঁ,' একটু অপ্রতিভ সুরে বললেন ব্রিগেডিয়ার। 'কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে?'

'জানি,' নির্লিপ্ত দেখাল সোহানাকে। 'ওটা একটা বোয়িং সেভেন-জিরো-সেভেন, তাই না?'

চেহারা ম্লান করে তুলে জবাব দিল ব্রিগেডিয়ার, 'হ্যাঁ। ওটা একটা ফ্রেটার, এয়ারলাইনার নয়। বিধ্বস্ত প্লেনে কোন রেজিস্ট্রেশন মার্ক পাওয়া যায়নি, কাজেই মালিকের সন্ধান পেতে লম্বা সময় লাগবে।'

তথ্যটা একটু নিরাশ করল সোহানাকে। নকল এয়ারফোর্স ওয়ানের সাথে কবির চৌধুরীর সম্পর্ক আবিষ্কার হলে কিছুটা সুবিধে হত।

ড্রাইভারের পাশে বসা একজন লেফটেন্যান্ট মুখের সামনে মাউথ পীস তুলে জানাল, রেডিও মেসেজ এসেছে। বোতাম টিপে কাচের পার্টিশন নামিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ব্রিগেডিয়ার, জানতে চাইল, 'বলো?'

'হেডকোয়ার্টার থেকে কল এসেছে স্যার,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'ট্রিয়েস্ট আর ডাবরোভনিকে রিসিভ করা হয়েছে টাকার দাবি। এই দাবি আমেরিকান নিউজ এজেন্সিকেও জানানো হয়েছে জিম্মি ওপেক মন্ত্রীদের মুক্তির জন্যে।'

'হেডকোয়ার্টারে চলো, জলদি!' তাগাদা দিল ব্রিগেডিয়ার। তাকাল সোহানার দিকে। 'ঘটনা আবার তাহলে ঘটতে শুরু করল, কি বলেন?'

'শুরু হবার পর থামল কখন?' পাল্টা প্রশ্ন করল সোহানা। 'টাকার দাবি জানানো হবে, আমরা সবাই সেটা আশা করছিলাম।'

ভুরু কুঁচকে উঠল ব্রিগেডিয়ারের, কিন্তু কথা বাড়াল না সে। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আজকাল কিডন্যাপ একটা মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'কিডন্যাপ হয়তো তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে,' বলল সোহানা, 'কিন্তু এই কিডন্যাপের সাথে যে লোকটা জড়িত, কবির চৌধুরী, তাকে আপনি মামুলি লোক বলতে পারেন না।'

ন্যাটো হেডকোয়ার্টারের অপারেশন রুমে পৌঁছে পোলারয়েড ফটো দেখল ওরা। অনুরোধ করায় ট্রিয়েস্ট থেকে রেডিও-যোগে পাঠানো হয়েছে ব্লো-আপগুলো। ডেস্ক ম্যাগনিফায়ারে একটা প্রিন্ট ঢুকিয়ে দিতেই ওয়াল স্ক্রীনে বড় হয়ে ফুটল ছবিটা।

ছবিতে ওপেক মন্ত্রী আর ক্রুরা সবাই আছে কিনা চেক করে দেখল সোহানা। এদের সবার চেহারার বর্ণনা এবং ফটো ইউনাকো কমপিউটরে জমা আছে। ছবিতে নকল মাসুদ রানাকেও দেখা গেল। সোহানা এবং সাবরিনা অনেকক্ষণ সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তাকে।

'অদ্ভুত,' বিড় বিড় করে বলল সোহানা।

'অবিশ্বাস্য!' বলল সাবরিনা। 'সার্জারীর এই জাদু কল্পনা করা যায় না...'

'ব্রিগেডিয়ার,' প্রশ্ন করল সোহানা, 'এই ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেন আপনি?'

চিন্তা করার সময় না নিয়ে সাথে সাথে ব্রিগেডিয়ার জানাল, 'জিম্মিরা একটা দুর্গে রয়েছে। মেঝেটা ফ্ল্যাগস্টোন দিয়ে তৈরি,' উৎসাহের সাথে ব্যাখ্যা করল সে। 'চুনবালির দেয়াল। এই ধরনের দুর্গ দু'একটা আমাদের ইংল্যান্ডেও দেখতে পাওয়া যায়। কোন সন্দেহ নেই, দুর্গের একটা কামরায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জিম্মিরা।'

তার রায় মেনে নিল সোহানা, তারপর জানতে চাইল, যুগোস্লাভিয়ার দু'একটা দুর্গের নাম ব্রিগেডিয়ারের জানা আছে কিনা।

'জিম্মিদেরকে কি যুগোশ্লাভিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?' আকাশ থেকে পড়ল ব্রিগেডিয়ার। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'সম্ভবত কয়েকশো দুর্গ আছে ওখানে। একটারও নাম জানি না আমি।'

'কয়েকশো?' মাথা নাড়ল সোহানা। 'অত হবে না। তবে যে-ক'টা আছে সেগুলোর মধ্যে থেকে এটাকে বেছে বের করা সহজ হবে না, আর কোন সূত্র যদি না পাওয়া যায়।'

টাকার দাবি লেখা একটা কাগজ নিয়ে কামরায় ঢুকল একজন করপোরাল। কবির চৌধুরী পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের কাটা হীরে চেয়েছে দেখে ম্যালকম ফিলপটের মতই একটা ঢোক গিলল সোহানা। 'সর্বনাশ! এ যে অনেক টাকা!'

'আর কি বলা হয়েছে?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইল ব্রিগেডিয়ার।

কাগজের ওপর আবার চোখ বুলাল সোহানা। 'কবির চৌধুরী জানিয়েছে, আরব রাষ্ট্রগুলো বা ইউনাকো অথবা অন্য কোন সরকার বা প্রতিষ্ঠান তার এই দাবি যদি না মানে, তিন ঘণ্টা পর পর একজন করে ওপেক মন্ত্রীকে খুন করবে সে।'

'মাই গড!' ফিসফিস করে বলল ব্রিগেডিয়ার। 'এ তো বদ্ধ পাগলের কথা! আসলেও কি তাই করবে সে, আপনি বিশ্বাস করেন?'

কাগজ থেকে মুখ তুলে সোহানা বলল, 'এ লোক সিরিয়াস লোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই সাথে মাথায় পাগলামির ছিটও আছে।'

ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে শক্তভাবে চেপে রেখে এতক্ষণ চুপ করে ছিল সাবরিনা, জানতে চাইল, 'সময়-সীমা সম্পর্কে কিছু বলেছে, সোহানা?'

সোহানার হাত থেকে নিয়ে কাগজের ওপর চোখ বুলাচ্ছিল ব্রিগেডিয়ার, সে-ই উত্তর দিল, 'হ্যাঁ,' হাতঘড়ি দেখল। 'এখন থেকে এক ঘণ্টা। ইউনাকো যদি কবির চৌধুরীর দাবি মেনে নেয়, তাহলে স্থানীয় সময় কাঁটায় কাঁটায় এক হাজার ঘণ্টায় রোমের আমেরিকান ফোর্সেস নেটওয়র্ক থেকে প্রচার করতে হবে খবরটা।' মুখ তুলে সোহানার দিকে তাকাল সে। চোখে কৌতুক ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'তারমানে, এখন সবকিছুই আপনার ওপর নির্ভর করছে, ম্যাডাম।'

নিঃশ্বাসের সাথে ধীরে ধীরে বলল সোহানা, 'এক ঘণ্টা···মাত্র এক ঘণ্টার

মধ্যে মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারিকে আমরা হারাতে পারি।'

'কেন? এনার্জি সেক্রেটারি কেন?' জানতে চাইল সাবরিনা। 'ওপেক মন্ত্রীদের কেউ নয় কেন?'

'যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কবির চৌধুরীর ঝগড়ার কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সোহানা। হাতের কাছে শত্রুর প্রতিনিধি থাকতে ধনকুবের একজন তেল মন্ত্রীকে খুন করার জন্যে বেছে নেবে সে, বিশ্বাস হয়?'

কবির চৌধুরীর দাবি সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে দেখার পর ইউনাকোর প্রথম কাজ হলো কিভাবে আরও সময় আদায় করা যায় তার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় গুরুত্ব লাভ করল, এই পরিমাণ টাকার হীরে জোগাড় করা। এই কাজটা তেমন কঠিন হলো না। সোহানার নির্দেশে আমস্টারডাম ডায়মন্ড এক্সচেঞ্জে টেলিফোন করল সাবরিনা। ইউনাকোর তরফ থেকে পেমেন্টের গ্যারান্টি দেয়া হলো, জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো তাতে। অপরপ্রান্ত থেকে জানানো হলো, পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের কাটা হীরে পরবর্তী ফ্লাইটে রোমে পৌঁছুবে।

ওদিকে, ন্যাটোর অপারেশন রুমে বসে পরিস্থিতিটা সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে দেখছে সোহানা। 'কবির চৌধুরীর খোঁজ পাওয়ার জন্যে সময় দরকার আমার,' বলল ও। অপূর্ব সুন্দর আঙুলগুলো ভাঁজ করে মুঠো পাকিয়েছে, ঘন ঘন মৃদু ঘুসি মারছে টেবিলের ওপর। 'নাগালের বাইরে থেকে আমাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে সে। দাবি মেনে নেবার খবর ব্রডকাস্ট করলেই সাথে সাথে আবার নির্দেশ আসবে তার কাছ থেকে—অমুক জায়গায় পৌঁছে দাও হীরে। সেখানে ফাঁদ পাতব, অত সময় দেবে না সে। হীরে পৌঁছে দেয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।'

'কিন্তু ম্যাডাম, ব্রডকাস্ট না করেও তো উপায় দেখছি না,' বলল ব্রিগেডিয়ার সোয়ান। 'ওপেক মন্ত্রীদের প্রাণের ওপর আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি কি? তবে, আপনি যদি মনে করেন কবির চৌধুরী মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে...'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাঁধের এপাশের চুল ঘাড়ের পিছনে পাঠিয়ে দিল সোহানা। জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেল দৃষ্টি, কোন্ সুদূরে যেন তাকিয়ে আছে। রোমের গাঢ় নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘের ভেলা ভেসে যাচ্ছে। 'নিজের হাতে খুন করবে, এটা হয়তো সত্যি নয়,' নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল সে। 'কিন্তু ভুললে চলবে না, অন্তত দু'জন বিপজ্জনক লোক রয়েছে তার সাথে। তাছাড়া, খুন না করেও করেছে বলে জানাতে পারে আমাদেরকে। সাক্ষী দেবে ওপেক মন্ত্রীদেরই কেউ। রিভলভারের মুখে যে-কোন কাজ করাতে পারে তাদেরকে দিয়ে।'

'ঠিক বুঝলাম না...'

'কবির চৌধুরীর কাছে নিশ্চয়ই রেডিও আছে। আমাদের ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে ব্যবহার করবে সেটা। প্রতিবার অল্প সময় ব্রডকাস্ট করবে, যাতে সে কোথায় আছে তা আমরা ধরে ফেলতে না পারি। ধরুন, শেখ জাহিদ আল খালিদ যদি রেডিওতে বলেন, তিনি নিজের চোখে মাসুদ রানার হাতে ম্যালকম

ফিলপটকে খুন হতে দেখেছেন, আমরা কি সেটা বিশ্বাস না করে পারব?'

'সত্যি-মিথ্যে জানার কোন উপায় থাকবে না আমাদের,' সোহানার সাথে একমত হয়ে বলল ব্রিগেডিয়ার। 'ধরে নিতে হবে, ঘটনাটা ঘটেছে।'

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। দু'জনই গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখা গেল সোহানাকে। হাত বাড়িয়ে একটা প্যাড আর বল পয়েন্ট পেন্সিল তুলে নিল সে, খসখস করে কিছু লিখল। প্যাড থেকে কাগজটা টেনে ছিঁড়ে বাড়িয়ে দিল ব্রিগেডিয়ারের দিকে।

কাগজটা নিয়ে চোখের সামনে তুলল ব্রিগেডিয়ার। পড়া শেষ করে সোহানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে। আপনার ধারণা, এতে রাজি হবে?'

'সময় আদায় করার আর কোন উপায় নেই।'

'কিন্তু কবির চৌধুরী কোথায়, আমরা জানি না···' প্রতিবাদের সুরে শুরু করল ব্রিগেডিয়ার।

'সেটা আমি জানার চেষ্টা করছি, ব্রিগেডিয়ার,' বলল সোহানা। 'এ-এফ-এন থেকে এই মেসেজটা সাড়ে ন'টায়, তারপর আবার দশটায় ব্রডকাস্ট করার ব্যবস্থা করুন। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, কবির চৌধুরী যোগাযোগ করবে। ততক্ষণে তার হদিস পাবার একটা উপায় বের করে ফেলব আমরা।'

'কিন্তু যদি না পারেন?'

'না পারলে ম্যালকম ফিলপটের আশা ছেড়ে দিতে হবে আমাদের।'

নিচের ঠোঁট ভিজিয়ে নিল ব্রিগেডিয়ার। 'এ-সব সিদ্ধান্তের দায়িত্বটা আমাকে নিতে হচ্ছে না, সেজন্যে নিজেকে আমার ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। আমি ভাবছি মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথা। প্রথমে হারাতে হলো এয়ারফোর্স ওয়ান, তারপর যদি শোনেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফিলপটও নেই··· কার ওপর যে খেপে উঠবেন, জানি না।'

'ইউনাকো সম্পর্কে জানেন তিনি,' একটু বিরক্ত এবং কঠিন শোনাল সোহানার কণ্ঠস্বর। 'আমার সাথে তাঁর পরিচয়ও আছে। ঝুঁকিটা কেন নিতে হয়েছে, তিনি বুঝবেন। এবার, ব্রিগেডিয়ার, দু'মিনিটের জন্যে আমাকে একটু একা থাকতে দেবেন কি?'

অপারেশন রুমের আরেক প্রান্তে চলে গেল ব্রিগেডিয়ার। ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে রোমের সোভিয়েত দূতাবাসের নাম্বার ডায়াল করল সোহানা

'ইয়েস?' অপরপ্রান্ত থেকে জানতে চাইল অপারেটর।

একটা সন্দেহ নিয়ে খেলছে সোহানা। ওর যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে শুধু যে কবির চৌধুরীর দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে ওদেরকে তাই নয়, সেই সাথে মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারির জীবনও বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। মন শক্ত করে রিসিভারটা আরও জোরে চেপে ধরল ও। বলল, 'আমি জেনারেল অ্যালেক্সি কিচিওমোপভ-এর সাথে কথা বলতে চাই।'

অপরপ্রান্তে কিছুক্ষণ কোন শব্দ নেই। তারপর জানানো হলো, ওই নামের কোন জেনারেল দূতাবাসে নেই।

এই রকম উত্তরই আশা করেছিল সোহানা। আবার বলল, 'তুমি হয়তো তাঁকে তাঁর ছদ্মনামে চিনতে পারবে—কামচিন।'

আরেক টেলিফোনে বা ইন্টারকমে কারও কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছে অপারেটর, আন্দাজ করল সোহানা। এবারও সাড়া দিতে দেরি করল লোকটা। তারপর বলল, 'দুঃখিত, দূতাবাসে এই নামের সাথেও আমরা কেউ পরিচিত নই।'

'অসহযোগিতা করছ,' শান্ত সুরে বলল সোহানা, 'কিন্তু সেজন্যে ক্ষতি তোমাদেরই হবে। তোমার কর্মকর্তারা একটা প্রজেক্টে কাজ করছেন, সে-ব্যাপারেই মূল্যবান একটা তথ্য দিতে চেয়েছিলাম আমি। ঠিক আছে, তুমি যখন তোমার বড়কর্তার সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ নিতে রাজি নও...'

'এক মিনিট, অপেক্ষা করুন,' তাড়াতাড়ি বলল অপারেটর। তারপর খসখস আওয়াজ শোনা গেল। সোহানা বুঝল, একটা টেলিফোনের রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে আরেকটায় কথা বলছে লোকটা। দশ সেকেন্ড পর জানতে চাইল সে, 'আপনি কিন্তু আপনার নাম বলেননি।'

'তুমি জিজ্ঞেসা করোনি। সোহানা চৌধুরী, ইউনাইটেড নেশনস অ্যান্টি-ক্রাইম অর্গানাইজেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর। কিন্তু যাকে চাইছি তাকে তুমি চেনোই না, আমার পরিচয় জেনে কি হবে?'

এবার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো সোহানাকে। তারপর অপারেটর বলল, 'উত্তর আমরা আগেই দিয়েছি, ম্যাডাম। ওই নাম দুটোর সাথে আমরা পরিচিত নই। তবে, আপনি যদি আপনার নিকট-ভবিষ্যতের গতিবিধি সম্পর্কে কিছু জানান, সেটা কাজে লাগতে পারে।'

'কাজে লাগতে পারে? কোন্ কাজে লাগতে পারে?' না বোঝার ভান করে জানতে চাইল সোহানা।

খানিক ইতস্তত করে একটা জবাব তৈরি করল অপারেটর, বলল, 'এই ধরুন, আমরা যে-ব্যাপারে আলোচনা করছি।'

অপরপ্রান্তের উদ্দেশ্য পরিষ্কার বোঝার জন্যে আরও প্রায় মিনিট খানেক কথার মারপ্যাঁচ নিয়ে খেলল সোহানা, তারপর জানাল, 'ও, ভাল কথা, পিয়াজা বারবেরিনির একটা রেস্তোরাঁ সানফ্লাওয়ারে থাকব আমি, এখন থেকে দশ মিনিট পর। জায়গাটা মার্কিন দূতাবাসের কাছেই।'

'আমরা জানি কোথায়, ম্যাডাম,' বলল অপারেটর, তারপর কেটে দিল যোগাযোগ।

জানালার সামনে রাস্তার দিকে মুখ করে বসেছে সোহানা। ফুরফুরে বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কাঁধের চুল, ঝাঁঝাল রোদে পিয়াজা বারবেরিনির দিকে তাকানো যায় না। ওয়েটারকে ডেকে এক কাপ কফির অর্ডার দিল ও। এই সময় চোখে পড়ল মেট্রো স্টেশনের দিক থেকে রাস্তা পেরিয়ে বিশালদেহী একজন লোক এদিকেই এগিয়ে আসছে। ফিরে যাচ্ছিল ওয়েটার, তাকে ডেকে দু'কাপের কথা বলল সোহানা।

রাস্তা পেরিয়ে এসে রেস্তোরাঁয় ঢুকল লোকটা। পরনে গ্যাবার্ডিনের স্যুট, হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভেতরটা চোখ বুলিয়ে দেখে নিল, তারপর সোজা এগিয়ে এসে বসল সোহানার টেবিলে। মুখে একটু হাসি নেই।

'আমার ফোন বোধহয় আশা করেছিলেন আপনি,' বলল সোহানা।

দু'কাপ কফি নিয়ে এল ওয়েটার। নিজের কাপটা তুলে নিয়ে নাকের কাছে তুলল কামচিন, গন্ধ শুঁকে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল সে, কাপ নামিয়ে রেখে ওয়েটারকে চা দিতে বলল। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কামচিনের কাপটা নিজের দিকে টেনে নিল সোহানা।

'কাজের কথা শুরু হোক, তাড়াতাড়ি শেষ করবেন,' নিচু গলায় বলল কামচিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও গমগম করে উঠল তার কণ্ঠস্বর।

'আপনি জড়িত, আপনি রোমে আছেন—এসব আমি জানলাম কিভাবে, জিজ্ঞেস করবেন না?'

'জানেন না,' বলল জেনারেল কিচিওমোপভ ওরফে কামচিন, 'আমি রোমে আছি এ আপনি আন্দাজ করে নিয়েছেন! বললেন, আমি জড়িত··· কিসের সাথে জড়িত?'

'এই মুহূর্তে আমি যে ব্যাপারটা নিয়ে ব্যস্ত,' বলল সোহানা।

'তার সাথে আমার বা আমার দেশের কোন সম্পর্ক আছে, এ আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না।'

'তাই যদি হয়,' শান্ত সুরে বলল সোহানা, 'আপনি তাহলে এখানে কেন?'

কামচিনের থমথমে চেহারায় এই প্রথম একটু হাসি দেখল সোহানা। জেনারেল বলল, 'কৌতূহল, মিস সোহানা! আর কিছু নয়।'

'জানতে ইচ্ছে করে না, আমি আপনার নাম, ছদ্মনাম ইত্যাদি জানলাম কিভাবে?' মুচকি একটু হাসল সোহানা।

'পলিটব্যুরোয় নতুন পজিশন পেয়েছি আমি,' বলল জেনারেল, 'তাতে লোকসান হয়েছে এই যে পশ্চিমা এসপিওনাজ জগৎ আমার সম্পর্কে বড় বেশি মাথা ঘামাচ্ছে—তাদের সাথে যোগ দিয়েছে ইউনাকো-ও। তা না হলে আমার ছদ্মনাম তো দূরের কথা, আসল নামও জানাজানি হত না।'

কফির কাপে চুমুক দিল সোহানা। চা দিয়ে গেল ওয়েটার। মোটা একটা চুরুট ধরাল কামচিন। সোহানার যাতে অসুবিধে না হয়, মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে।

'কিউবা আমাদের বন্ধু হওয়ায় এই একটা লাভ হয়েছে,' বলল জেনারেল। 'ভাল চুরুট খেতে পাই।'

'আপনি নিশ্চয়ই আশা করছেন না, আমরা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব।'

'না,' বলল জেনারেল। 'আমার ধারণা···মানে··' নিজের একটা দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়ে যাবে ভেবেই বোধহয় ইতস্তত করতে লাগল সে, তারপর বলল, '···মন খুলে কথা বললে, আমার ধারণা, আমরা দু'পক্ষই উপকৃত হব।'

এইটুকু বলে থেমে গেল দেখে সোহানা বুঝল, নিজে থেকে কিছু প্রকাশ করতে রাজি নয় কে.জি.বি.। হাতঘড়ি দেখল ও, সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

ধীরেসুস্থে শুরু করল সোহানা। 'আভাসে-ইঙ্গিতে কথা না বলে আমি যদি সরাসরি প্রসঙ্গটা তুলি, আপনার কোন আপত্তি নেই তো, জেনারেল?'

'আপনিই সেটা ভাল বোঝেন,' কামচিনের গম্ভীর চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই কি ভাবছে সে।

'শুধু যদি মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্লেন হাইজ্যাক করা হত তাহলে আলাদা কথা ছিল,' বলল সোহানা, 'কিন্তু জিম্মি হিসেবে মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারি আর ওপেক মন্ত্রীদের আটক করে গোটা দুনিয়াকে একটা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কবির চৌধুরীর নামটা আপনার অপরিচিত, এ আমি বিশ্বাস করি না···কাজটা কি তার করা উচিত হয়েছে বলে মনে করেন আপনি? চিন্তা করে দেখুন তাকে যে সাহায্য করেছে, সে-ই বা কেমন চরিত্র?'

প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি জোর দিয়ে অ্যাশট্রেতে ঘষে চুরুটটা নেভাল কামচিন। 'জানতে পারি, কে তাকে সাহায্য করছে বলে আপনার ধারণা?'

'কবির চৌধুরী সাহায্য পাচ্ছে কোন রাষ্ট্রের কাছ থেকে। আমি তো বলব, সাংঘাতিক বোকামি করছে দেশটা।'

'কি রকম?' এমন ভান করল কামচিন যেন হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে সে।

'সব জানাজানি হয়ে গেলে আরবদের ঘৃণা ছাড়া আর কি পাবে সেই দেশ? জাতিসংঘের নিন্দা প্রস্তাব এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এক কথায়, মুখে চুনকালি পড়বে তার। কবির চৌধুরীর মত একজন ক্রিমিনালকে সাহায্য করার জন্যে এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে সে, অথচ একবার ভেবে দেখছে না, একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে কত কি হারাতে হতে পারে তাকে—সাংঘাতিক বোকামি নয়?

'জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে আমরা স্পষ্ট করে বলেছি, এই ঘটনার সাথে আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই জড়িত···'

'আপনারা তো এ-কথাও বলেছেন যে ইউনাকোর ডেপুটি ডিরেক্টর ঘুষ খেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে হাত মিলিয়েছে,' বলল সোহানা। 'কে কি বলেছে, সে-কথা থাক। আমি শুধু বলতে চাই, কেউ যদি মনে করে মিছেমিছি দোষ চাপানো হবে আর মাথা পেতে সেটা মেনে নেবে ইউনাকো বা যুক্তরাষ্ট্র, তাহলে মস্ত ভুল করবে সে। আমি জানি, ওপেক মন্ত্রীরা কেউ যদি খুন হয়, কঠোর প্রতিশোধ নেবে যুক্তরাষ্ট্র।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল কামচিন, ঝট্ করে ফিরল সে, ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল, 'ওপেক মন্ত্রীরা খুন হবে, এই ধারণা হলো কোত্থেকে?'

কবির চৌধুরীর টাকার দাবি এবং শর্ত ব্যাখ্যা করল সোহানা।

'বেচারী আমেরিকা!' কৃত্রিম সহানুভূতি জানাল জেনারেল কিচিওমোপভ।

'আমেরিকা অপেক্ষা করছে,' বলল সোহানা। 'নির্ভর করছে ইউনাকোর

ওপর। আমরা যখন ওদেরকে জানাব, অমুক দেশ কবির চৌধুরীকে শুধু যে প্লেন হাইজ্যাকে সাহায্য করেছে তাই নয়, তাকে লোকবল, অস্ত্রশস্ত্র, বৈরী এলাকায় এয়ারস্ট্রিপ ইত্যাদি দিয়েও সাহায্য করেছে, তখন কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন, জেনারেল?'

'আন্দাজে ঢিল ছোঁড়াটা দেখছি ভালই রপ্ত করেছেন!'

ওয়েটারকে ডেকে বিল চাইল সোহানা, তারপর পাঁচশো লিরার কড়কড়ে নোট দিয়ে বিদায় করল তাকে। রোমের ইংরেজি দৈনিক দি সান-এর প্রভাতী সংস্করণটা কোল থেকে তুলে দু'জনের মাঝখানে টেবিলের ওপর রাখল ও, খুব সাবধানে। বলল, 'প্রথম পৃষ্ঠার সাথে ক্লিপ দিয়ে আটকানো আছে একটুকরো কাগজ। ওতে একটা মেসেজ লেখা আছে। এখন থেকে,' রিস্টওয়াচ দেখল ও, 'তিন মিনিট পর আমেরিকান ফোর্সেস নেটওয়ার্ক থেকে ব্রডকাস্ট করা হবে মেসেজটা। সেটা আবার এক হাজার ঘণ্টায় রিপিট করা হবে। মেসেজটা কবির চৌধুরীর জন্যে, কিন্তু এ-ধরনের মেসেজ পাবে বলে আশা করছে না সে।'

'আপনি খুবই বুদ্ধিমতী, বুঝলাম। কিন্তু এসব কথা আমাকে শোনাবার মানে কি?'

'কবির চৌধুরীর কাছ থেকে দু'ঘণ্টা সময় চাওয়া হবে,' ভাব দেখে মনে হলো জেনারেলের কথা শুনতে পায়নি সোহানা। 'ইউনাকোর এই অনুরোধ রক্ষার জন্যে তাকে যদি একটু চাপ দেয়া হয়, আমি মনে করব আমার একটা উপকার করা হলো। যে আমার এই উপকারটুকু করবে, সে যদি কবির চৌধুরীকে সাহায্য করে এক-আধটু অন্যায় করেও থাকে, আমি সেটা চেপে যাবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। আমি আশা করি, কিভাবে কি করলে কবির চৌধুরীকে মানানো যাবে, আপনার তা ভালই জানা আছে, জেনারেল কিচিওমোপভ।'

সোহানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল জেনারেল। তারপর চাপা গলায় বিস্ফোরণ ঘটল, 'আমি? আমার সাথে কবির চৌধুরীর সম্পর্ক কি? আপনার এই ধারণা হলো কি করে যে ওই রকম একটা লোকের সাথে আমার যোগাযোগ থাকতে পারে?'

'আমি যদি ভুল বুঝে থাকি, জেনারেল, ক্ষমা করবেন। আমার বিশ্বাস, শীঘ্রিই আবার আমাদের দেখা হবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোহানা, কোন দিকে দৃকপাত না করে বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁ থেকে। লম্বা, নীল একটা ন্যাটো স্টাফ-কার ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে ওর সামনে দাঁড়াল, বনেটে পত পত করছে পতাকা। দরজা খুলে গেল, ভেতরে উঠল সোহানা। হুস করে বেরিয়ে গেল গাড়ি।

ধীরেসুস্থে নতুন আরেকটা চুরুট ধরাল কামচিন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল মিনিটখানেক। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁর বাইরে। কালো একটা জিল লিমুসীন, বনেটে পত পত করছে রাশিয়ান পতাকা, তার পায়ের সামনে এসে থামল। দরজা খুলে গেল, দু'সারি

দাঁতের মাঝখানে চুরুট নিয়ে গাড়িতে চড়ল সে।

দশটা পাঁচে ন্যাটো অপারেশন রুমের টেলিফোন বেজে উঠল। ভারী, গম্ভীর সুরে কবির চৌধুরী বলল, 'দু'ঘণ্টা, সোহানা। তারচেয়ে এক সেকেন্ডও বেশি নয়।'

'আমার কথার নড়চড় হবে না,' বলল সোহানা। কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রিগেডিয়ার সোয়ান, কার সাথে কথা বলছে সেটা এই মুহূর্তে ওকে জানতে দিতে চায় না ও। 'কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার জন্যে এই সময়টুকু একান্ত দরকার।'

'কোন রকম চালাকি নয়, সোহানা,' সাবধান করে দিল কবির চৌধুরী। 'শুধু আমেরিকান আর আরবরা নয়, আমার দয়ার ওপর নির্ভর করছে তোমার এজেন্ট রোজির প্রাণও—মনে রেখো।'

'সত্যি তাই,' নরম সুরে বলল সোহানা। 'কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আপনি ওদের কারও কোন ক্ষতি করবেন না।'

'করব,' ঠাণ্ডা সুরে বলল কবির চৌধুরী, 'যদি আমার দাবি মেনে নিতে গড়িমসি করা হয়।'

সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে এল সোহানা, বলল, 'মেনিলথিনের কাছ থেকে এরই মধ্যে আপনি জেনেছেন, বাহরাইন বন্দীখানা থেকে পালিয়ে গেছে মাসুদ রানা।'

তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করল সোহানা, কিন্তু কবির চৌধুরী কথা বলল না।

'বন্দী রানাই ছিল আপনার হাতে একমাত্র কার্ড, যেটা সম্পর্কে রাশিয়ানরা আগ্রহী,' আবার বলল সোহানা। 'আপনি রানাকে ধরে রাখতে পারেননি, তার মানে ওকে জেরা করার বা কাজে লাগাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো কে.জি.বি.। ওরা যে আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হবে, বোঝাই যায়।'

'কি বলতে চাও তুমি?' হুঙ্কার ছাড়ল কবির চৌধুরী।

'রানা যে পালিয়েছে, এই খবর রাশিয়ানদের জানাবার সাহস আপনার নেই, আপনি তাদেরকে নয়-ছয় বুঝিয়েছেন। কিন্তু আমি যদি কথাটা ওদেরকে বলি, ওরা আমার কথাই বিশ্বাস করবে। তবে, আপনি যদি অনুরোধ করেন, কথাটা ওদেরকে আমি বলব না।'

অপরপ্রান্তে চুপ করে থাকল কবির চৌধুরী কিন্তু সোহানা এবার নিস্তব্ধতা ভাঙল না।

অবশেষে কবির চৌধুরীই মুখ খুলল, 'উপকারের বিনিময়ে উপকার—আমার তাতে আপত্তি নেই। আমি তোমাকে দু'ঘণ্টা সময় দিলাম, বিনিময়ে তুমি মুখ খুলবে না। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো সোহানা।

'সময়টা বুঝেশুনে খরচ কোরো, সোহানা!' হুমকির মত শোনাল কবির চৌধুরীর শেষ কথাটা।

'চেষ্টা করব,' বলল সোহানা, মুখ ফিরিয়ে তাকাল ব্রিগেডিয়ারের দিকে।

চার

রানা ধরে নিল, মেনিলখিনের নির্দেশে রাডারের চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যেই এত নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কামোভের পাইলট। শুধু তাই নয়, বড়সড় লোক-বসতি তো বটেই, ছোটখাট গ্রাম বা নিঃসঙ্গ খামার বাড়িও এড়িয়ে যেতে চায় ওরা। যে পাইলট এত রকম সাবধানতা অবলম্বন করে সে এ-ব্যাপারেও নিশ্চয়ই সচেতন, বিপদ যদি আসে তো আসবে ওপর দিক থেকে, কাজেই সেদিকে একটা চোখ খোলা না রেখেই পারে না সে। তার মানে, কেউ যদি চুপিসারে পিছু নিতে চায়, হেলিকপ্টারের পিছন আর নিচেটা হবে তার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ।

গোত্তা খেয়ে অনেক নিচে নেমে এল আটভা, মাটি থেকে পঞ্চাশ ফিট ওপরে থাকতে সিধে হলো আবার। খুদে কামোভের সিকি মাইল পিছনে রয়েছে রানা। পরবর্তী প্রায় একশো মাইল, নিচের দিকে যতবার তাকাল রানা, গাছপালার সবুজ আর মাটি বা পাথরের বাদামী ঝলক ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। সরু উপত্যকার মাঝখান দিয়ে, দুই পাহাড়ের ফাঁক গলে, কখনও চূড়া টপকে কামোভ যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। ঝকঝকে নীল কয়েকটা লেক পেরিয়ে এল। ঘণ্টায় নব্বই থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ওঠানামা করছে কামোভের গতি, সমান তাল বজায় রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা। ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠল ও।

তারপর হঠাৎ ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করল মাটি সামনে তাকিয়ে পাহাড়ের কয়েকটা শৃঙ্গ দেখল রানা, পনেরো থেকে ষোলোশো ফিট উঁচু। সামনে খোলা চার্টের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ও। পাহাড়গুলোকে চেনা গেল, ডাইনারিক আল্পস।

আবার যখন মুখ তুলে সামনে তাকাল, কোথাও দেখতে পেল না কামোভকে।

আতঙ্কিত হয়ে উঠল রানা, কিন্তু তা মাত্র মুহূর্তের জন্যে। নিজেকে যুক্তি দেখাল, হেলিকপ্টার বাষ্প হয়ে উড়ে যাবার বা মাটিতে সেঁধিয়ে চোখের আড়াল হবার জিনিস নয়। ঝাপটা দিয়ে থ্রটল খুলে সামনের দিকে তীরবেগে ছুটতে ইচ্ছে করল প্রথমে, কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি ঠেকিয়ে রাখল ওকে। নিজেকে বোঝাল, সামনেই কোথাও আছে কামোভ, শুধু ওর চোখে ধরা পড়ছে না। প্লেনের নাক ঘুরিয়ে নিল ও।

প্রায় খাড়াভাবে উঠতে শুরু করল আটভা। তিন মিনিটের কিছু বেশি সময়ে চার হাজার ফিট উঠে এল রানা। তারপর আগের কোর্সে ফিরিয়ে নিয়ে এল প্লেনকে। স্টারবোর্ডের দিকের জানালা দিয়ে পাথুরে এলাকার ওপর চোখ বুলাচ্ছে। একটু পরই উজ্জ্বল হাসি ফুটল চেহারায়।

রহস্যের সমাধান পাওয়া গেছে। একটা হিমবাহের কাঠামোর কিনারা টপকে নিচের উপত্যকায় নেমে গেছে হেলিকপ্টার। চোখা মাথাওয়ালা পাহাড়গুলোর মাঝখানে বুড়ো আঙুলের ছাপের মত দেখাল উপত্যকাটাকে, আঁকাবাঁকা একটা পাহাড়ী রাস্তা থেকে খানিক উঁচুতে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে, ঘাস আর গাছ সাজানো সমতল একটা বিস্তৃতি। প্রকৃতির তৈরি এই কার্নিসের দিকে মুখ করে পাহাড়ের একটা ডেবে যাওয়া অংশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্গটা। আরও একটু নিচে, পাথর কেটে বেশ খানিকটা জায়গা সমতল করা হয়েছে। কামোভকে দেখা গেল সেখানে, নেমে পড়েছে, রোটর ব্লেড মন্থর হয়ে এসেছে এরই মধ্যে।

কবির চৌধুরীর আস্তানায় পৌঁছে গেছে মেনিলথিন।

ন্যাটো কমপিউটর কমপ্লেক্সে ঝড়ের বেগে ঢুকল একজন করপোরাল। ইউনাকোর ডেপুটি ডিরেক্টরকে চায় সে। লালচুলো একজন মার্কিন মেজর খানিক ইতস্তত করে দিক নির্দেশ দিল তাকে। কয়েকজনকে পাশ কাটিয়ে সোহানার পাশে এসে দাঁড়াল করপোরাল, নিচু গলায় জানাল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে ওকে নিয়ে যাবার জন্যে বাইরে গাড়ি প্রস্তুত। জাগরেব ফ্লাইটও ওর জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

সোহানা ব্যস্ত, সাবরিনার সাথে কথা বলছে। সাবরিনা ওকে রিপোর্ট করছিল, পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের হীরে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে, প্যাকেট নিয়ে আমস্টারডাম ডায়মন্ড এক্সচেঞ্জের একজন প্রথম সারির সদস্য যে-কোন মুহূর্তে রওনা হবে। সাবরিনা থামতেই মুখ খুলল ব্রিগেডিয়ার সোয়ান।

'সৈকত, লবণ খেত আর প্রতিটি খোলা মাঠের ওপর নজর বুলাবার জন্যে এক স্কোয়াড্রন পি-নাইনটিকে তৈরি হতে বলেছি আমি। আমার বিশ্বাস, অনুমতি পেলে এয়ারফোর্স ওয়ানকে বের করে ফেলবে ওরা।'

'যুগোশ্লাভিয়ায় ঢোকার অনুমতি?' বিস্মিত দেখাল সোহানাকে। 'ন্যাটো সদস্য হলে কথা ছিল...'

'যুগোশ্লাভ সরকারের সাথে যোগাযোগ করে ওদের সাথে আমি কথা বলেছি, ম্যাডাম,' বলল ব্রিগেডিয়ার। 'কি ঘটছে না ঘটছে সবই জানে ওরা। ওদেরও সন্দেহ, বোয়িং এবং জিম্মিরা ওদের মাটিতেই কোথাও আছে। কিন্তু সার্চ করার অনুমতি চাইলে এড়িয়ে যাচ্ছে...'

'সেটাই স্বাভাবিক,' বলল সোহানা। 'ন্যাটোকে ওরা নিজেদের দেশে ঢুকতে দিতে পারে না। সেজন্যেই জাগরেবে যাচ্ছি আমি। যুগোশ্লাভিয়া ইউনাকোর সদস্য, ইউনাকোর ছোট একটা দলকে খুব সম্ভব নিতে আপত্তি করবে না ওরা।' কাগজ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে একটা ব্রীফকেসে ভরতে শুরু করল ও। 'প্লেন দিয়ে সার্চ করালেও এয়ারফোর্স ওয়ানকে আপনি পেভেন না, ব্রিগেডিয়ার। কবির চৌধুরী বোয়িংকে শুধু লুকিয়েই ফেলেনি, হিট সেনসর যাতে ওটাকে খুঁজে না পায় তার জন্যে নিশ্চয়ই ঠাণ্ডাও করে রেখেছে। দেখুন

গিয়ে, কোন হ্যাঙ্গারের ভেতর তারপুলিন দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে এয়ারফোর্স ওয়ানকে। আমার অন্তত তাই বিশ্বাস।'

সাহায্য করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল দেখে চেহারা একটু ম্লান হয়ে উঠল ব্রিগেডিয়ারের। সেটা লক্ষ করে সোহানা আবার বলল, 'আপনার আইডিয়াটা অবশ্য চমৎকার ছিল, শুধু যুগোশ্লাভিয়া আর কবির চৌধুরীর বেলায় কাজে লাগার নয়। কিন্তু থেমে যাবেন না, প্লীজ, চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যান—এসব ব্যাপারে আপনার মাথা খেলে ভাল।'

প্রশংসা শুনে খুশি হলো ব্রিগেডিয়ার। সাবরিনাকে শেষ দু'একটা নির্দেশ দিয়ে কমপিউটর কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে এল সোহানা, পিছনে ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন ন্যাটো অফিসার।

জাগরেব ফ্লাইট আকাশে চড়ার তিন মিনিট পর সাবরিনার টেবিলে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। রুদ্ধশ্বাসে একটা কণ্ঠস্বর বলল, 'সোহানা কোথায়, সাবরিনা? ওর সাথে কথা আছে। রানা বলছি। জিম্মিদের পেয়েছি আমি।'

আঙুল নেড়ে লালচুলো মেজরকে ডাকল সাবরিনা। পড়িমরি করে ছুটে এসে টেবিলের সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াল মেজর। 'কত খরচ পড়বে আর কি রকম কঠিন, এসব আমি জানতে চাই না,' তাকে বলল সাবরিনা। 'আমি চাই এই লাইনের কলটা—' হাতের রিসিভার দেখাল সে, '—মিস সোহানার প্লেনের সাথে জোড়া লাগানো হোক। এখুনি!'

'ইয়েস, ম্যাডাম!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল মেজর, 'ইয়েস—ইয়েস ম্যাডাম!' কমিউনিকেশন রূমের দিকে ছুটল সে, যেন তার ঘাড়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাবার দায়িত্ব চেপেছে।

ওদের জন্যে সকালের নাস্তা পাঠিয়ে দিয়েছে কবির চৌধুরী। খিদে নেই রোজির, কিন্তু সে না খেলে ফারুকও খাবে না বুঝতে পেরে তাকেও বসতে হলো। নাস্তা মানে এক ধরনের মাড়, তার সাথে তেলতেলে শাক পাতা। 'যুগোশ্লাভ-খাবার এত বাজে, আমার জানা ছিল না,' বলল সে।

মধ্য ইউরোপের রন্ধন-প্রণালী সম্পর্কে লেকচার দিতে শুরু করল ফারুক। বয়স মাত্র তেরো হলে কি হবে, দুনিয়ার প্রায় সব ব্যাপারেই কিছু না কিছু জানা আছে তার।

সকৌতুকে হাত জোড় করল রোজি, 'ঘাট হয়েছে, বাবা, মাফ করে দাও!' তারপর চেহারায় কৃত্রিম আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে তাকাল ওপর দিকে। সেখানে আটকে গেল তার দৃষ্টি, চোখে ফুটল বিস্ময়। লেকচার বন্ধ করে রোজির দৃষ্টি অনুসরণ করল ফারুক। দেখল, সিলিং যেখানে পাহাড়ের নগ্ন পাঁচিল ছুঁয়েছে, সেখানে ছোট একটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে।

'আরে, আগে তো খেয়াল করিনি,' বলল রোজি, উঠে গিয়ে দাঁড়াল ফাঁকের নিচে। 'দিনের আলো দেখতে পাচ্ছি, ফারুক।'

রোজির পাশে এসে দাঁড়াল ফারুক। পাহাড়ের গায়ে হাত রাখল সে।

খানিকটা জায়গা ডেবে আছে, সেজন্যেই সিলিং একটা অংশকে স্পর্শ করতে পারেনি। ফাটলটা শুরু হয়েছে সিলিঙের আরও একটু ওপর থেকে, দিনের আলো সেদিক থেকেই আসছে।

দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে ওপরের ফাটলটা দেখার চেষ্টা করল ফারুক, বলল, 'আপনি গলে বেরিয়ে যাবেন, ফাঁকটা অত বড় নয়। আমি বুঝেশুনে খাই, শরীরে মেদ জমতে দিই না—ওটা গলে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারব আমি।'

'কিন্তু তোমাকে যেতে দেয়া উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না,' বলল রোজি। 'তোমার দাদু জানতে পারলে আমার ওপর ফায়ার হয়ে উঠবেন...'

মৃদু হাসল ফারুক। 'আপনি আমার দাদুকে চেনেন না, তাই এ-কথা বলছেন। এই রকম একটা সুযোগ পেয়েও আমি সেটা কাজে লাগাইনি শুনলেই বরং খেপে উঠবেন তিনি। এখন দয়া করে আপনি যদি আমাকে একটু উঁচু করে ধরেন...'

হাঁটু মুড়ে বসে ফারুককে কাঁধে তুলে নিতে যাবে রোজি, দরজার তালায় চাবি ঢোকাবার আওয়াজ হলো। দড়াম করে খুলে গেল কবাট, ওরা তখন সামনে টেবিল নিয়ে বসে আছে। হোঁচট খেতে খেতে ঘরে ঢুকল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট গডলিম্যান।

'এমন বোকা, পালাবার চেষ্টা করছিল,' বলল আহমেদ কায়াম। গডলিম্যানের পিছু পিছু ঘরে ঢুকল সে। 'এই দুর্গ থেকে যে পালানো সম্ভব নয়, বিশ্বাস করে না! অন্যায় করেছে, এই তার সাজা—তোমাদের সাথে এখানে বন্দী থাকবে।' বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে আবার দরজায় তালা লাগিয়ে দিল সে।

বিছানায় বসে একটা কাঁধ ডলতে শুরু করল গডলিম্যান। টয়লেটে গিয়েছিল ও, সাথে গার্ড ছিল, তাকে কাবু করে উঠান পর্যন্ত চলে গিয়েছিল সে। কিন্তু সামনে থেকে ড্রব্রিজটা তুলে ফেলে পালাবার রাস্তা বন্ধ করে দেয় আহমেদ।

সব শুনে গডলিম্যানের সাহসের প্রশংসা করল রোজি, কিন্তু সেই সাথে বলল, 'যদিও কাজটা তোমার বোকামিই হয়ে গেছে, গডলিম্যান। লোকটার কথাই ঠিক, এই দুর্গ থেকে পালানো সম্ভব নয়।'

বেজার হলো গডলিম্যান। ফিসফিস করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না। একবার পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি, ওরা ভাবতেই পারবে না আবার আমি সে-চেষ্টা করব। সেই সুযোগটাই নেব আমি।'

'তার মানে আবার আপনি...?' সপ্রশংস দৃষ্টিতে গডলিম্যানের দিকে তাকিয়ে থাকল ফারুক।

'অবশ্যই!'

'ধন্যবাদ,' চেহারা গম্ভীর করে তুলে বলল ফারুক, 'আপনি আমার কাছ থেকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য পাবেন।'

হেসে ফেলল গডলিম্যান।

রোজি বলল, 'হেসো না, ওর সাহায্য তোমার দরকার হবে,' বলে সিলিঙের ফাঁকটা দেখাল।

ফাঁকের নিচে গিয়ে দাঁড়াল গডলিম্যান। তার সামনে এসে পিছন ফিরে দাঁড়াল ফারুক, 'আমাকে তুলুন।'

ফারুককে দু'হাত দিয়ে ধরে উঁচু করল গডলিম্যান। 'গলে উঠে যেতে পারবে?'

'অনায়াসে,' বলে সিলিঙের ওপর উঠে পড়ল ফারুক, তারপর ফাঁকটা গলে ছাদে বেরিয়ে যেতে শুরু করল। নিচ থেকে ওরা দু'জন আলোর ছোট টুকরোটাকে ঢাকা পড়ে যেতে দেখল।

দুর্গটাকে মাঝখানে রেখে বার কয়েক চক্কর দিল রানা। কিন্তু কাছেপিঠে ঘেঁষল না। তারপর এগোল অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের দিকে, ওদিকে আর কিছু না হোক দু'একটা জেলে পাড়া না থেকেই পারে না।

বেশিদূর যেতে হলো না, নিচে একটা ছোট গ্রাম দেখতে পেল রানা। ভাগ্য ভাল, মাত্র মাইলখানেক দূরে একটা মাঠ পাওয়া গেল। মাঠের একধারে বিশাল একটা ঘর দেখল ও, পরিত্যক্ত খামার বাড়ির অংশ। ল্যান্ড করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না, কোন বিপদ ছাড়াই নেমে এসে স্থির হলো প্লেন। ঘরটা জরাজীর্ণ হলেও, ধীর গতিতে প্লেন নিয়ে সেটার ভেতর ঢুকে যেতে পারল ও, দেয়াল বা ছাদ ধসে পড়ল না। হ্যাভারস্যাক কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে এল ও, গুন গুন করে গানের সুর ভাজতে ভাজতে মেঠো একটা পথ ধরে এগোল গ্রামের দিকে। দেখে কে বলবে, বাঁধন-ছেঁড়া ট্যুরিস্ট নয় এ লোক?

ডলারের বিনিময়ে স্থানীয় মুদ্রা সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রচুর লোকসান দিতে হলো রানাকে। তবে রেস্তোরাঁটা খুদে আর গ্রামীণ হলেও মজার মজার খাবার পেয়ে ভরপেট খেয়ে নিল ও। ছোট একটা কাফেতে ঢুকে গ্রামের দু'চারজন যুবককে বিয়ারের ক্যান উপহার দিল, তারপর ঘর-বাড়ির পাশ ঘেঁষে এগোল পোস্ট অফিসের দিকে।

পরবর্তী বিশটা মিনিট দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটল। ইন্টারপ্রেটর হিসেবে পাওয়া গেল পোস্ট-মাস্টারের ষোড়শী মেয়েকে। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। সোহানার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ হতে, ব্যাপারটা জাদু মনে হলো রানার। এই মুহূর্তে ওর মাথার ওপর রয়েছে সোহানা।

দুর্গের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিল রানা। আগেই ষোড়শীর কাছ থেকে দুর্গের নাম জানা হয়ে গেছে ওর। সোহানাকে জানাল, গ্রামের নাম লুকা। সোহানা জানাল, আজ সন্ধের দিকে দেখা হবে দু'জনের। বলল, 'আমি সম্ভবত একাই আসব, রানা। যুগোশ্লাভ সরকারের কাছ থেকে কি ধরনের সাহায্য পাব না পাব, এখনও আমি জানি না।'

'আরে, বাদ দাও সাহায্য! তুমি আর আমি, আমরা দু'জনে দু'জনকে একটু সাহায্য করলেই গোটা একটা সেনা-বাহিনী গড়ে নেয়া যায়।'

'সেনা-বাহিনী!' অবাক হলো সোহানা।

'বুঝলে না? বানিয়ে নিতাম আর কি!'

যোগাযোগ কেটে দিল সোহানা।

একটা গাধার পিঠে চড়ে রওনা হয়ে গেল রানা। দুর্গ এখান থেকে বেশ অনেক মাইল দূরে। ঠিক ওই সময় জাগরেব এয়ারপোর্টে নামছে সোহানার প্লেন।

ফাঁকটা থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ের খাড়া গা দেখে শিউরে উঠল ফারুক। নিচ থেকে চোখ ফিরিয়ে দু'পাশে আর ওপর দিকে তাকাল সে। দুর্গের মাথার ওপর গভীর গহ্বরের মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে ফাটলটা। দুর্গের ছাদে উঠে এসেছে সে, পিরামিড আকৃতির টাওয়ারগুলো তার নাগালের মধ্যেই। সাবধানে এগিয়ে গিয়ে একটা টাওয়ারের ওপর চড়ল সে। এখান থেকে পাহাড়ের খাড়া গা, রাস্তা, আরও সামনে উপত্যকা, পরিষ্কার দেখতে পেল সব। উঁকি দিতেই চোখে পড়ল চিলেঘরের লম্বা জানালা। টাওয়ার থেকে নেমে এল সে, দ্বিতীয় আরেকটা টাওয়ারের পাশ ঘেঁষে নামল অন্য একটা নিচু ছাদে। মুখ তুলে তাকাল, দেখল, টাওয়ারের মাথা থেকে উঠে গেছে একটা ফ্ল্যাগ-পোল, পোলের মাথা থেকে নিচে নেমে এসেছে লম্বা একটা রশি।

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফারুকের। টাওয়ারে উঠতে শুরু করবে, এই সময় নিচ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। হাঁটু মুড়ে দুর্গের কিনারায় বসল সে। আওয়াজটা আসছে একটা ভেন্টিলেটর থেকে। ওটা সম্ভবত ট্রফিরুমের ভেন্টিলেটর, আন্দাজ করল সে। জিম্মিদেরকে বোধহয় দিনের বেলা আবার ওখানে নিয়ে আসা হয়েছে। গলার আওয়াজটা চিনতে পারল। কথা বলছে কবির চৌধুরী।

রাগে লাল হয়ে আছে কবির চৌধুরীর চেহারা। দু'কোমরে হাত রেখে কথা বলছে সে। '...কাজেই বোঝা গেল, বন্ধুরা, আপনাদের সবার সরকারই আমার সাথে অসহযোগিতা করতে শুরু করেছে। তারা আপনাদের প্রাণের মূল্য হিসেবে মাত্র পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দিতে রাজি নয়। আপনারাই বলুন, দু'ঘণ্টা সময় চাওয়ার আর কি কারণ থাকতে পারে? আর কি ব্যাখ্যা আমি করতে পারি? এই দু'ঘণ্টা সময় হাতে পেয়ে এই দুর্গে আসার পথ খুঁজবে, তারা এত বোকা বলে আমি বিশ্বাস করি না। কারণ, আমি তাদেরকে জানিয়েছি, সেক্ষেত্রে আপনারা সরাই খুন হয়ে যাবেন।'

মন্ত্রী আর ক্রুদের আলাদা করে ফেলেছে কবির চৌধুরী, তার কাছে ক্রুদের কোন মূল্য নেই। কবির চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোডি পারকিন আর মেনিলথিন, দু'জনের হাতেই একটা করে মেশিন-পিস্তল। আহমেদ কায়ামের সাথে রয়েছে কয়েকজন গেরিলা, ট্রফিরুমের বাকি অংশের ওপর চোখ রাখছে তারা।

কামরার ভেতর সবচেয়ে লম্বা আর শক্তিশালী লোক এনার্জি সেক্রেটারি ম্যালকম ফিলপট, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে কঠিন সুরে তিনি বললেন. 'তমি একটা নর-পিশাচ, তোমার সাথে অসহযোগিতা করে ঠিক

কাজই করছে সবাই।'

উত্তেজিত না হয়ে সহনশীল কৌতুকের সাথে ফিলপটকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল কবির চৌধুরী। জুতসই একটা জবাব খুঁজছিল সে, খাটনি থেকে তাকে রেহাই দিলেন শেখ জাহিদ আল খালিদ।

একটা হাত তুলে এনার্জি সেক্রেটারিকে ক্ষান্ত হবার অনুরোধ করলেন তিনি, বললেন, 'শান্ত হোন, বন্ধু, শান্ত হোন। ওর মত একটা জঘন্য লোকের সাথে লাগতে যাওয়া নিজেকে অপমান করারই নামান্তর। এদিকে, আপনি আমার কাছে এসে বসুন।'

দাঁতে দাঁত ঘষল কবির চৌধুরী, কিন্তু বাহরাইনী শেখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে সুবিধে করতে পারল না। 'পঙ্গু শেখ সাহেবও তার দিকে নিষ্পলক, কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকলেন। এক পা এগোলেন ফিলপট, ঝট করে তার দিকে ফিরল কবির চৌধুরী।

ভাঁজ করা হাত দুটো শরীরের পাশে নামিয়ে নিলেন ফিলপট, এক পা এগিয়ে বুক উঁচু করে দাঁড়ালেন। বাহরাইনী শেখকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ধন্যবাদ, শেখ জাহিদ। কিন্তু শয়তানটাকে আমি বোঝাতে চাই···'

'প্লীজ, মি. ফিলপট!' আবেদনের সুরে বললেন শেখ আদনান দারজাল।

'তুমি যদি ভেবে থাকো, আমাদেরকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করবে···' কঠিন সুরে আবার শুরু করলেন ফিলপট। শেখ দারজালের কথা তিনি শুনতেই পাননি।

'বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না!' নতুন, কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর থেকে বেরিয়ে এল হুমকির সুর। 'আপনার চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি আমরা কেউ শুনতে আগ্রহী নই।'

হঠাৎ করেই উত্তেজনায় টানটান, ভীতিকর হয়ে উঠল ঘরের ভেতর পরিবেশ। ফিলপটের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে কোডি পারকিন, কথাগুলো সে-ই বলল।

কথাটা কে বলল দেখার জন্যে একদিকে কাত হয়ে পড়লেন ড. ওয়াহাব, পারকিনকে দেখতে পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল তাঁর বুক। লোকটার চোখে পরিষ্কার খুনের নেশা আবিষ্কার করলেন তিনি। তাঁর মত শেখ ইবরাহিম আতাফীও পারকিনের চেহারা দেখে মনে মনে আঁতকে উঠলেন। একটা হাত বাড়িয়ে ফিলপটের কব্জি চেপে ধরলেন তিনি।

বললেন, 'প্লীজ, মি. ফিলপট···'

ঝাঁকি দিয়ে কনুই ছাড়িয়ে নিয়ে আরও এক পা সামনে এগোলেন এনার্জি সেক্রেটারি। 'তুমিই রানা···তুমি···' এই ক'টা শব্দ উচ্চারণ করেই দম নিতে হলো তাঁকে। '···তুমি যদি এই বেজন্মা কুকুরটার সাথে হাত না মেলাতে, এসব কিছুই ঘটত না। তোমার এই বেঈমানীর কথা আমরা, অন্তত আমি কখনও ভুলব না। বেঁচে থাকলে আমি তোমাকে নিজের হাতে···' আরও এক পা এগোলেন তিনি।

'ফিরে আসুন, মি. ফিলপট!' ড. ওয়াহাব অনুরোধ করলেন।

'আর এক ইঞ্চিও এগিয়ো না!' সাবধান করে দিল পারকিন।

কিন্তু তার কথা কানে তুললেন না ফিলপট। মনে হলো, প্রচণ্ড রাগে অন্ধ এবং বধির হয়ে গেছেন। থরথর করে কাঁপছেন তিনি।

'তোমার স্পর্ধা দেখে আমার বমি পাচ্ছে,' হুঙ্কার ছাড়লেন ফিলপট। 'তোমার তুলনায় কবির চৌধুরী একটা, একটা...'

লক্ষ্য স্থির না করে, বলতে গেলে একচুল না নড়ে, মেশিন-পিস্তলের ট্রিগারে আঙুলের চাপ দিল পারকিন। এক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেল এনার্জি সেক্রেটারির দিকে। সামনের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে পারকিনের দিকে এগিয়ে আসছিলেন তিনি, একটা হাত কব্জির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে গেল। বাকি বুলেটগুলো ঢুকল গলায় আর মুখে। অদৃশ্য হয়ে গেল মুখ। রক্ত, হাড় আর থেঁতলানো মাংসের মুখোশ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না ওটাকে। লাশটা মেঝেতে পড়ার পর মনে হলো, ধড় আর মাথা প্রায় আলাদা হয়ে গেছে। দুটোর মাঝখানে দু'একটা হাড় আর সামান্য একটু চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই।

ঘরের ভেতর বারুদের গন্ধ।

পারকিনের প্রচণ্ড ক্রোধ দমন করার তেমন কোন চেষ্টাই করল না কবির চৌধুরী। করলেও কোন লাভ হত বলে মনে হয় না। কারণ পারকিন জংলী পশু, তার না আছে বিবেক, না আছে দয়ামায়া, না দায়িত্বজ্ঞান। ঘাড়ে যখন শয়তান ভর করে সেটাকে সামলানো তার নিজের পক্ষেও সম্ভব নয়। ম্যালকম ফিলপটের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, জীবনে অনেক নিষ্ঠুর লোকের সংস্পর্শে এলেও, এই ধরনের লোকের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা ছিল না।

ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর পারকিনের কাঁধের ওপর ভারী একটা হাত আলতোভাবে তুলল কবির চৌধুরী, হাতটা সেখানেই রাখল সে। পারকিনের চোখে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। ধীরে ধীরে পারকিনের চোখ থেকে খুনের নেশা, চকচকে ভাবটা, অদৃশ্য হয়ে গেল।

'শেষ পর্যন্ত তাহলে,' আরব মন্ত্রীদের দিকে ফিরে গম্ভীর কণ্ঠে বলল কবির চৌধুরী, 'ঘটনা এতদূর গড়াল। কিন্তু আপনারাই বলুন, কে এর জন্য দায়ী? আমার সম্মান আপনারা রাখলেন না, মুখে যা আসে তাই বলে আপনারা আমাকে অপমান করলেন, আমার লোকজনকে অপমান করলেন। আপনারা না মানতে পারেন, কিন্তু আমি একজন সম্মানিত মানুষ। এই রকম রক্ত নিয়ে খেলার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। তবে, একদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে, এ একরকম ভালই হয়েছে।' খানিক বিরতি নিল সে, তারপর আবার বলল, 'একটা দৃষ্টান্ত তৈরি হলো। আপনারা এবং আপনাদের সরকার এ-থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। যা ঘটে গেল, এ-থেকে সবাইকে বুঝতে হবে, আমাকে হালকা করে দেখা চলবে না।'

আতঙ্কে, ঘৃণায় স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। কেউ কোন শব্দ করছে না, এক চুল নড়ছে না।

'আবারও বলছি, আমি একজন সম্মানিত মানুষ,' শান্ত গলায় বলল কবির

চৌধুরী। 'আমার কথার দাম আছে। ইউনাকোর মিস সোহানাকে আমি জানিয়েছি, আপনাদের সরকার যদি আমার দাবির টাকা দিতে রাজি না হয়, তিন ঘণ্টা পর পর একজন করে মন্ত্রীকে খুন করব আমি।'

তেল মন্ত্রীরা সবাই হতবিহ্বল চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছেন কবির চৌধুরীর দিকে।

আবার বলল সে, 'কথাটা এখন আপনাদেরকে জানাতে পারি—ম্যালকম ফিলপটকে দুপুরবেলা খুন করার ইচ্ছা ছিল আমার। নিজের বোকামির জন্যেই এক ঘণ্টা কম বাঁচল সে। কিন্তু তার মত আপনারাও অতটাই বোকা, এ আমি বিশ্বাস করতে চাই না।' ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল কবির চৌধুরী, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ঘেমে নেয়ে উঠেছে ফারুক। ফোঁপাতে ফোঁপাতে টাওয়ার থেকে নেমে এল। ফাটলের কাছে এসে পা দুটো নামিয়ে দিল নিচের দিকে। গলা চড়িয়ে গডলিম্যান বলল, 'ঝুলে পড়ে হাত ছেড়ে দাও, ফারুক, আমি ধরে নেব।' তাই করল ফারুক, তাকে লুফে নিয়ে বিছানার দিকে এগুলো গডলিম্যান, শুইয়ে দিল ধীরে ধীরে। ফারুকের চেহারা দেখে আঁতকে উঠল রোজি। তাড়াতাড়ি একটা ইনসুলিন ইঞ্জেকশন দিল তাকে, তারপর জোরজার করে খানিকটা মাড় আর কালো রুটি খাওয়াল। আগের মতই, ধীরে ধীরে কমে এল জ্বর।

শান্তভাবে অপেক্ষা করছে গডলিম্যান। ফারুকের অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণটা আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে ওরা, সে এবং রোজি দু'জনেই শুনেছে গুলির আওয়াজ; ছেলেটা একটু সুস্থ হলে নিজে থেকেই সব বলবে বলে আশা করছে সে। গুলির কারণ এবং কার কি হয়েছে তা হয়তো জানতে পেরেছে ফারুক।

ফারুকের মুখ মুছিয়ে দিয়ে নরম সুরে রোজি বলল, 'কেমন লাগছে এখন, ফারুক?'

শান্ত সুরে ফারুক বলল, 'আমি ঠিক আছি।'

'যদি পারো, এবার তাহলে বলো।'

রোজির একটা হাত খামচে ধরে বিছানার ওপর উঠে বসল ফারুক। 'ভদ্রলোককে মেরে ফেলেছে ওরা…' বলেই ফুঁপিয়ে উঠল।

'কাকে মেরে ফেলেছে?' ঢোক গিলে জানতে চাইল গডলিম্যান।

'আমেরিকান ভদ্রলোক, মি. ফিলপটকে। তাঁর সাথে মি. কবির চৌধুরীর তর্ক হচ্ছিল, আমার দাদু মি. ফিলপটকে শান্ত হতে বললেন, আর তারপরই কে যেন একজন কথা বলে উঠল। মি. ফিলপট খুব রেগে গেলেন, বকাঝকা শুরু করলেন… আবার কেঁদে ফেলল ফারুক।

'তারপর কি হলো?' তাগাদা দিল রোজি।

'তারপর…তারপর, সেই লোকটা গুলি করল তাঁকে। মি. ফিলপট নিশ্চয়ই মারা গেছেন। একসাথে অনেকগুলো গুলির আওয়াজ শুনেছি আমি। তারপর অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ পাইনি। তারপর মি. চৌধুরী বললেন, এমনিতেও

তিনি মি. ফিলপটকে খুন করতেন, তবে এত তাড়াতাড়ি নয়…'

ফারুককে দু'হাতে ধরে নিজের কোলের ভেতর টেনে নিল রোজি। স্যুটের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছে পিট পিট করে তাকাল ফারুক। 'আমি ঠিক জানি না, তবে আমার কেন যেন মনে হয়েছিল, মি. ফিলপটকে গুলি করেছেন মেজর মাসুদ রানা…'

চিলেঘরের মেঝেতে পায়চারি শুরু করল গডলিম্যান, বিমূঢ় দেখাল তাকে। 'কি যেন মিলছে না, ফর গডস সেক! রানাকে আমি চিনি…' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে, '…কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারার সে নয়…হতে পারে না!' ফারুকের দিকে ফিরল সে। 'তোমার ভুল হয়নি তো?'

'শেষ দিকে মি. ফিলপট মেজর রানাকে বকাঝকা করছিলেন, মাথা নাড়ল ফারুক, 'না, আমি ভুল করছি বলে মনে হয় না।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল গডলিম্যান, এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, হতে পারে বন্ধু, তবু আমি নিজের হাতে খুন করব রানাকে।

এই সময় রোজি অনুভব করল, ফারুকের কোটের ভেতর, শরীরের চারদিকে কি যেন পেঁচানো রয়েছে। কোটের বোতাম খুলে ফেলল সে, দেখল, লম্বা এক প্রস্থ রশি পেঁচানো রয়েছে ফারুকের শরীরে। ফারুক বাধা দিল না, ধীরে ধীরে রশিটা খুলতে শুরু করল সে। দেখতে পেয়ে ওদের দিকে এক রকম ঝড়ের বেগে ছুটে এল গডলিম্যান। 'রশি পেলে কোত্থেকে?' জানতে চাইল সে।

'ফ্ল্যাগ-পোলে ছিল,' বলল ফারুক। 'এটা পেলে ছাদ থেকে নিচের দিকে অনেকটা নেমে-যেতে পারবেন আপনি, সে-কথা ভেবেই খুলে এনেছি।'

সিলিঙের ফাঁকের দিকে চোখ রেখে বলল গডলিম্যান, 'কিন্তু আমি গলব কিভাবে?'

লম্বা জানালার দিকে গডলিম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল ফারুক, 'ওটাতে শুধু কাঁচ আছে, লোহার বার নেই। ওরা ধরে নিয়েছে ওই পথে সাহস করে কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। তা সম্ভবও নয়। কিন্তু রশি থাকলে?'

দেয়ালজোড়া ফাটলটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল গডলিম্যান। তারপর ধীরে ধীরে এগোল সেদিকে, ভাবছে, কি দিয়ে ভাঙা যায় কাঁচটা—

জাগরেব এয়ারপোর্টে সোহানাকে অভ্যর্থনা জানালেন যুগোশ্লাভ সরকারের উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাঁর সাথে কয়েকজন সামরিক এবং বেসামরিক কর্মকর্তাও রয়েছেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর রাজনীতিক ভদ্রলোক বললেন, 'এই সঙ্কটে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে আমার সরকার তার ক্ষমতার মধ্যে সম্ভাব্য সব কিছু করবে, মিস সোহানা। কবির চৌধুরীর মত ক্রিমিনাল এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমরা সর্বদাই সোচ্চার। ইউনাকোর একজন সদস্য হিসেবে যুগোশ্লাভ সরকার তার দায়িত্ব অবশ্যই পালন করবে। আমরা এই সঙ্কটের একটা সন্তোষজনক সুরাহা দেখতে চাই।'

'আপনার মহানুভবতার তুলনা হয় না,' বলল সোহানা, আন্দাজ করল, জেনারেল কামচিন বোধহয় এরই মধ্যে ব্যস্ত সময় কাটিয়ে গেছে এখানে। 'কবির চৌধুরীর আস্তানায় হানা দিতে চাই আমি, আপনারা তাহলে সাহায্য করবেন?'

'কিন্তু—সেটা কোথায়, আপনি জানেন, মিস সোহানা?'

সোহানা জানাল, জানে। আবার প্রশ্ন করা হলো ওকে, বড়সড় ফোর্স নিয়ে হানা দেয়া কি উচিত হবে?

মনে মনে হাসল সোহানা। বুঝল, যেখানে রাশিয়ানদের সাথে লড়াই বেধে যাবার সম্ভাবনা আছে সেখানে যুগোশ্লাভ আর্মড ফোর্সকে পাঠাতে চাইছেন না উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সোহানা তাঁকে আশ্বস্ত করে বলল, ফোর্স পাঠানোর কোন দরকার নেই, ইউনাকোর ছোট একটা গ্রুপই কবির চৌধুরীর আস্তানা দখল করার জন্যে যথেষ্ট। সবশেষে বলল, 'কিন্তু ওখানে আমার পৌঁছুবার ব্যবস্থা আপনারা করবেন।'

'অবশ্যই!' বোমা বিস্ফোরণের মত আওয়াজ ছাড়লেন ভদ্রলোক। 'এই এয়ারপোর্টেই আপনার জন্যে একটা হেলিকপ্টার তৈরি রাখা হয়েছে। ওটা আপনারই, যেখানে খুশি যেতে পারেন...'

হাত বাড়িয়ে হেলিকপ্টারটা দেখালেন ভদ্রলোক। জানালেন, পাইলটের কাছে সব এলাকার চার্ট আছে। ধন্যবাদ জানিয়ে 'কপ্টারের দিকে এগোল সোহানা, এই সময় পিছন থেকে ডাক পড়ল। ফিরে এসে দাঁড়াতে উপ-মন্ত্রী বললেন, 'ইউনাকো টেলিফোন করেছে। জরুরী মেসেজ।'

ভি.আই.পি. লাউঞ্জে এসে রিসিভার নিল সোহানা। লাইনে এল সাবরিনা, তার গলার সুর শুনেই সোহানা বুঝল, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে।

'হীরে কোথায় কিভাবে পৌঁছে দিতে হবে, সে-ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে কবির চৌধুরী,' বলল সাবরিনা। 'বলছি, তুমি লিখে নাও।'

'না,' বলল সোহানা। 'তার আগে খারাপ খবরটা শুনতে চাই আমি।'

'খারাপ খবর?' অপরপ্রান্তে বিস্মিত হলো সাবরিনা, তারপর বলল, 'হ্যাঁ...একটা খারাপ খবর আছে, কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে?'

খবরটা কি?' কঠিন শোনাল সোহানার গলা।

'ম্যালকম ফিলপট, এনার্জি সেক্রেটারি, তাঁকে খুন করেছে সে...'

'গড, ওহ গড!' চোখ বুজে গুঙিয়ে উঠল সোহানা। 'সত্যি এই কাজ করবে শয়তানটা, একবারও বিশ্বাস করিনি আমি। এরজন্যে আমিই দায়ী, সাবরিনা! মি. ফিলপটের জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছি...'

নিজেকে দোষী ভাবছে বলে সোহানাকে তিরস্কার করল সাবরিনা, বলল, 'কবির চৌধুরীর শর্ত এবং নির্দেশ আমরা ভাঙার আগেই ফিলপট খুন হয়েছেন। কাজটা সে নিজের হাতে করেনি। রেডিও মেসেজে জানিয়েছে, এনার্জি সেক্রেটারি তাকে অপমান করায় এই ঘটনা ঘটেছে।'

'গুলিটা করল কে?'

'তা বলেনি কবির চৌধুরী,' বলল সাবরিনা। 'জানিয়েছে, জিম্মিদের উদ্ধার

করার কোন চেষ্টা হলে সবাইকে একসাথে মারবে সে।'

সোহানা কথা বলছে না দেখে আবার বলল সাবরিনা, 'এসব যে মিথ্যে হুমকি নয়, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, সোহানা। যেভাবেই হোক, আন্দাজ করতে পেরেছে, আমরা বোধহয় তার কাছাকাছি চলে আসছি। বাহরাইন থেকে পালিয়েছে রানা এই খবর শোনার পর তার ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, মেনিলখিনকে অনুসরণ করে দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে রানা। সে জানে, তুমি এখন জাগরেবে—রাশিয়ানরা নিশ্চয়ই এই খবর দেবে তাকে। তুমি বিরাট একটা ফোর্স নিয়ে দুর্গের দিকে রওনা দেবে, এটা সে ধরেই নেবে। আমার ধারণা, ধরা পড়ার আগে জিম্মিদেরকে তো মারবেই, নিজেও আত্মহত্যা করবে—তার পালাবার পথ আমরা যদি বন্ধ করে রাখি।'

'বিরাট ফোর্স নিয়ে যাচ্ছি না আমরা,' বলল সোহানা। আরও কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল সে। তার বিশ্বাস, কামচিনের সাথে ওর কথা হবার পর রাশিয়ানরা কবির চৌধুরীকে সীমার বাইরে যেতে দেবে না। ব্যাপারটা নির্ভর করে কামচিনের মনে কতটা ভয় ঢোকাতে পেরেছে সে, তার ওপর। কিন্তু ম্যালকম ফিলপট খুন হবার পর আর কোন আশার কথা কাউকে শোনাতে রাজি নয় সোহানা কাগজ কলম টেনে নিয়ে বলল, 'কিভাবে পৌঁছে দিতে হবে হীরে, বলো।'

পাঁচ

কঠোর পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠল রানা। নিচ থেকে উঠে বা রাস্তা ধরে নাক বরাবর এগিয়ে নয়, ওপর থেকে নিচের দিকে নেমে দুর্গে পৌঁছুতে চায় ও ক্লান্ত গাধাটাকে রেহাই দেবার পর খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে হচ্ছে ওকে।

পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে খানিকটা নেমে গিয়ে গাধাটাকে বসে পড়তে দেখেছে ও, সেই থেকে মনে মনে আশা করছে, আবার দরকারের সময় পাওয়া যাবে বন্ধুকে। সোহানার সাথে দেখা করার জন্যে ফিরতে তো ওকে হবেই।

সাথে করে বোঝাটা নিয়ে আসেনি রানা, রেখে এসেছে ষোড়শীর কাছে। সাথে করে এনেছে একজোড়া দু'মুখো রেডিও আর একটা সাব মেশিন-গান ঘণ্টা তিনেক পাহাড় বেয়ে ওঠার পর অবশেষে একটা কার্নিস পেল ও, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বুজল, হাঁপাতে লাগল হাপরের মত।

তিন মিনিট পর কার্নিসের ওপর উঠে বসল রানা, জ্যাকেটটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শীত শীত ভাবটাকে ঠেকাবার চেষ্টা করল, তারপর তাকাল দুর্গের দিকে।

ওপর থেকে ছবির মত সুন্দর দেখাল। দুর্গ জোড়া উঠান আর খাদটা পরিষ্কার দেখা গেল, খাদের ওপর ঝুলছে ড্রব্রিজ। বাঁ দিকে তাকাল রানা। বন-

জঙ্গল। রাস্তা থেকে পাহাড়ের গা যেখানে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করেছে, গাছপালার খুব ভিড় ওখানে। তারপর ক্রমশ হালকা হতে শুরু করে কয়েকশো ফিট ওপরে, কার্নিসের নিচে একদম নেই।

পাহাড়ের প্রায় পুরো একটা দিক জুড়ে এই কার্নিস। দুর্গটাকে আরও ভাল করে দেখার জন্যে সেটা ধরে এগোল রানা। খানিক দূর এগোতেই কামোভ হেলিকপ্টারটা দেখতে পেল, রোটর ব্লেড ঘুরছে। দুর্গের বাঁ দিকে বড়সড় একটা কার-পার্ক। কার-পার্কের পিছনে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়, গাছ-গাছালিতে ঢাকা। ঢালটা খাড়া নয়। ওখানেই প্রথমে লোকটাকে দেখতে পেল রানা—ছুটছে।

ফিল্ড গ্লাস অ্যাডজাস্ট করে লোকটার দিকে ফোকাস স্থির করার জন্যে এতই ব্যস্ত থাকল রানা, কামোভের রোটর ব্লেড ঘোরার তাৎপর্য সেই মুহূর্তে ওর কাছে ধরা পড়ল না। আকাশে উঠল 'কপ্টার, নাক ঘুরিয়ে ছুটে গেল ঘন জঙ্গলের দিকে। এই সময় লক্ষ করল ও, দুর্গের নিচে জঙ্গলের ভেতর একদল লোক ছুটোছুটি করছে। কয়েক সেকেন্ড পর তাদের মাথার ওপর পৌঁছে গেল 'কপ্টার।

রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল সব। দুর্গ থেকে পালিয়েছে লোকটা, হেলিকপ্টারের সাহায্য নিয়ে কবির চৌধুরীর লোকজন তাকে খুঁজছে। কিন্তু খোঁজাখুঁজি চলছে দুর্গের নিচে, আর লোকটা রয়েছে দুর্গের অনেক ওপরে, ঢালের গায়ে।

দুর্গ থেকে পালিয়েছে ওই লোকটা তাহলে কে? ফিল্ড গ্লাস অ্যাডজাস্ট করে তাকাল রানা, কিন্তু লোকটাকে ফোকাসের মধ্যে দেখতে পাবার আগেই বুঝল, ও গডলিম্যান না হয়েই যায় না।

ছাদের কিনারায় রশি বেঁধে টেনেটুনে দেখল গডলিম্যান, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে ঝুলে পড়ল। ছাদ থেকে একতলা নিচে নামল ও, পা রাখল লম্বা একটা ঝুল-বারান্দায়। তার আগেই কাঁচ লাগানো জানালা দিয়ে দেখে নিয়েছে, ঝুল-বারান্দার সাথে যে ঘরটা রয়েছে সেটা খালি, লোকজন নেই। রশি ধরে দু'বার ঝাঁকি দিল, সঙ্কেতটা বুঝতে পেরে ছাদের কার্নিস থেকে রশিটা খুলে ছেড়ে দিল রোজি। এবার ঝুল-বারান্দার একটা পিলারের গায়ে রশিটা একবার শুধু জড়িয়ে নিল গডলিম্যান, দুটো প্রান্তই রইল নিজের হাতে। নেমে এল আরও একতলা নিচে। রশিটা পিলার থেকে ছাড়িয়ে আনতে কোন অসুবিধে হলো না। এইভাবে, কারও চোখে ধরা না পড়ে অনেকটা নামল ও। মাটি থেকে আর মাত্র দশ ফিট ওপরে ও। জায়গাটা ফাঁকা, শুধু তারপুলিন দিয়ে কি যেন একটা ঢাকা রয়েছে, আকৃতিটা চেনা চেনা লাগল ওর। রশি ছেড়ে দিয়ে পাঁচিলে পা রাখল, নামতে শুরু করল মাটির দিকে, অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক, সেই সাথে পাথর হয়ে গেল শরীরটা। একটা পাঁচিল থেকে অর্ধেক ঝুলছে ও, পাঁচ হাত দূরে তারপুলিনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একজন গার্ড, হাতে রাইফেল। গডলিম্যানের বুকের ভেতর ধুপধাপ আওয়াজ শুরু হয়ে গেল,

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘেমে গেল মুখ। চোখ তুললেই তাকে পাঁচিলের গায়ে দেখতে পাবে গার্ড।

হাত দিয়ে তারপুলিনটা সরাল গার্ড, ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ঝকঝকে একটা মোটরসাইকেল। মুগ্ধ আগ্রহের সাথে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লোকটা, তারপর ধীরে ধীরে বিষণ্ন হয়ে উঠল তার চেহারা। বোধ হয় এই রকম একটা মোটরসাইকেল কেনার সামর্থ্য তার নেই, কোন কালে হবেও না। বিরস বদনে ঘুরে দাঁড়াল সে, অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল মেইন গেটে।

ঝুপ করে নিচে নামল গডলিম্যান, এক ছুটে গিয়ে দাঁড়াল মোটরসাইকেলের পাশে। যেদিক থেকে ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি, সেই ওপর থেকেই এল চিৎকারটা। 'ধর, ধর! পালাল, পালাল!' আহমেদ কায়ামের গলা।

দুর্গের প্রাচীর ফুলে আছে, তাই গডলিম্যানকে দেখতে পাচ্ছে না আহমেদ। কি করবে, মুহূর্তের জন্যে ভেবে পেল না গডলিম্যান, তারপরই মোটরসাইকেলে চড়ে বসল সে। প্রথমবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল দু'চাকার বাহন। ওপর থেকে এখনও চিৎকার করছে আহমেদ, উত্তরে গর্জে উঠল মোটরসাইকেল।

গডলিম্যানকে দেখতে না পেলেও এঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে মেশিন-পিস্তল বাগিয়ে ধরে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল আহমেদ। আহমেদের চিৎকার শুনতে পায়নি, কিন্তু গুলির আওয়াজ শুনে খিলানের নিচে সতর্ক হয়ে গেল সশস্ত্র গার্ড। এরই মধ্যে ভেতরের উঠান পেরিয়ে এসেছে গডলিম্যান, হেডলাইটের দিকে ঝুঁকে পড়ে ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে বাহনটাকে।

গার্ড রাইফেল তাক করেছে দেখে গতি না কমিয়েই এঁকেবেঁকে এগোল গডলিম্যান। পর পর দুটো গুলি করল গার্ড। গুলি লাগানো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে হাতের রাইফেল ফেলে দিয়ে ড্রব্রিজ তুলতে শুরু করল সে।

মোটা ওক কাঠের চওড়া তক্তাটা খাদের ওপর থেকে উঠছে, দেখতে পেল গডলিম্যান। এঞ্জিনের শব্দ সত্ত্বেও জং ধরা চেইনের ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল। গার্ডকে পাশ কাটিয়ে এল সে, ড্রব্রিজ এরই মধ্যে তিন ফিট উঠে এসেছে। কিন্তু এখন আর ফেরার উপায় নেই তার।

ড্রব্রিজে উঠে এল হোন্ডা, হুইল ঘোরানো বন্ধ করে দিল গার্ড। আকস্মিক পতন শুরু হলো বাঁধনহীন তক্তার, সেটার কিনারা থেকে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল হোন্ডা, বারো ফিট উড়ে গিয়ে পড়ল ব্রিজের অপরদিকে। কয়েকটা তীব্র ঝাঁকি খেলো গডলিম্যান, মনে হলো উল্টে যাবে মোটরবাইক, কিন্তু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আবার সেটাকে সিধে করে নিল সে।

চিলেঘরের লম্বা ফাটল থেকে অনবরত গুলি করছে আহমেদ। ব্রিজের গোড়ায় আরও দু'জন গার্ডকে দেখা গেল, তারাও গুলি করছে। একটা বুলেট বাতাসে শিস তুলে গডলিম্যানের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু আতঙ্কিত বোধ করার সময় পেল না সে, সামনের রোড ব্যারিয়ারে একজন গার্ড ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। লোকটার হাতে রাইফেল। এক সেকেন্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাস্তা ছেড়ে ঢালের ওপর উঠে এল গডলিম্যান।

ঢালটা এদিকে খাড়া নয়, ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটে চলল হোন্ডা। ব্যারিয়ার ওর কাছ থেকে দুশো গজ দূরে, ব্রিজটাও তাই। ঝোপের আড়ালে পড়ে যাওয়ায় গার্ডদের গুলি তাকে লাগবে না। কিন্তু সবাই ওকে এদিকে আসতে দেখেছে।

ঢাল থেকে পাশের উপত্যকায় নেমে যাবে কিনা ভাবল গডলিম্যান। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার আগেই গাছের একটা গুঁড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে হোন্ডা সহ ছিটকে পড়ল একটা ঝোপের গায়ে। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। মনে মনে একটা হিসেব কষে নিয়েছে, ব্যারিয়ারটা পিছনে ফেলতে পারলে রাস্তা টপকাবার একটা উপায় বেরিয়ে যেতে পারে, তারপর ঢাল বেয়ে ওপর দিকে উঠে গেলে সহজে তাকে ধরতে পারবে না ওরা।

হিসেব মিলে গেল গডলিম্যানের। কারও চোখে ধরা না পড়ে রাস্তা থেকে ঢালে উঠে এল সে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটছে, এই সময় তাকে দেখতে পেল রানা।

জাগরেব এয়ারপোর্টে ভি.আই.পি. লাউঞ্জে বসে রয়েছে সোহানা। ওর সামনের সোফায় বসেছেন উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অন্যান্য কর্মকর্তারা লাউঞ্জের আরেক প্রান্তে।

'মিস সোহানা, আপনার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে,' উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন।

সোহানার হাতে একটা কাগজ, কবির চৌধুরীর নির্দেশ লেখা রয়েছে তাতে। সাবরিনার মুখ থেকে শুনে নিজের হাতে লিখেছে এটা সোহানা। এবার নিয়ে পাঁচবার পড়ছে। মুখ না তুলে সামনের নিচু টেবিল থেকে কফির কাপটা তুলে চুমুক দিল সে।

রোম থেকে একটা রেডিও ফটো পাঠানো হবে জাগরেবে, সেটার জন্যে অপেক্ষা করছে সোহানা। যুগোশ্লাভ মন্ত্রী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, পৌঁছুলেই ডেসপ্যাচ রাইডার সরাসরি এয়ারপোর্টে নিয়ে আসবে সেটা। কিন্তু তার আগেই এসে পৌঁছুল আরেকজন লোক। নরম চামড়ার একটা পেটমোটা ব্যাগ দেখা গেল তার হাতে। সোহানার সাথে চোখাচোখি হতেই ব্যাগটা নাড়ল সে, হীরেগুলো পরস্পরের সাথে বাড়ি খেয়ে মিষ্টি একটা শব্দ তৈরি করল।

'আপনার আদেশ মত ডায়মন্ড নিয়ে এসেছি, ম্যাডাম,' বলল হীরে ব্যবসায়ী।

হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিল সোহানা, কিন্তু সেটা খুলে ভেতরে কি আছে না আছে পরীক্ষা করে দেখল না। আমস্টার ডায়মন্ড এক্সচেঞ্জের একজন সদস্যকে অবিশ্বাস করার কোন দরকার নেই।

এর একটু পরই পৌঁছুল রেডিও ফটো। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সোহানা। ছবিতে খুদে একটা দ্বীপ দেখা গেল, নিচে লেখা—সসার আইল্যান্ড। সাথে ম্যাপ রেফারেন্স রয়েছে। সী-লেভেল থেকে

মাত্র কয়েক ফিট উঁচু দ্বীপটা। ডালমাটিয়ান কোস্ট থেকে খুব বেশি দূরে নয়। পানির ওপর জেগে থাকা পাথরটা পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো মিটার চওড়া হতে পারে, একটা পোল আর ক্রসবার ছাড়া দেখার মত কিছু নেই। ফটোতে ঠিক বোঝা গেল না, তবে মনে হলো সমতল।

পোল আর ক্রসবারটা দ্বীপের কিনারায়, ফাঁসিকাঠের মত দেখতে।

'কি ওটা?' যুগোশ্লাভ উপ-মন্ত্রী সোফার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, প্রশ্নটা তাঁকেই করল সোহানা। 'ফাঁসিকাঠ?'

'দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে,' উপ-মন্ত্রী বললেন, 'কিন্তু তা হয় কিভাবে! কাউকে ফাঁসি দিতে হলে চার দেয়ালের ভেতর জেলখানাই তো রয়েছে, অত কষ্ট করে ওখানে নিয়ে যাবার দরকার কি?'

শক্ত পাথরে একটা বোল্ট পোঁতা রয়েছে, তা থেকে উঠে এসেছে মোটা একটা রশি, রশির অপরপ্রান্ত জড়িয়ে বাঁধা হয়েছে খাড়া পোলের সাথে—পোলটা যদি কোন কারণে দ্বীপের কিনারা থেকে পানিতে পড়েও যায়, দূরে ভেসে যেতে পারবে না। পোলের মাথায় আড়াআড়ি ভাবে রয়েছে ক্রসবার, তার একটা বাহু ঝুলে আছে পানির ওপর।

নিজের সোফায় এসে বসলেন উপ-মন্ত্রী।

কবির চৌধুরী বলছে, 'ক্যানভাসের একটা ব্যাগে হীরেগুলো ভরে কর্ড দিয়ে বেঁধে ভাল করে বন্ধ করতে হবে মুখটা, ওই কর্ডের সাথেই মুখের কাছে থাকতে হবে একটা ইস্পাতের তৈরি রিঙ, ডায়ামিটারে সেটা হবে ছ'ইঞ্চি। ক্রসবারের যে বাহুটা পানির ওপর ঝুলে আছে সেটায় গলিয়ে দিতে হবে এই রিঙ। রিঙটা গলাবার সময় খেয়াল রাখতে হবে, ঠিক যেন দুটো পেরেকের মাঝখানে থাকে ওটা।'

'আর কিছু বলেছে?' জানতে চাইলেন উপ-মন্ত্রী।

'হ্যাঁ। ''দ্বীপে পা ফেলা চলবে না, কারণ ওখানে মাইন আছে। ক্রসবারে রিঙ পরাতে হবে বোটে দাঁড়িয়ে। আজ সন্ধেয়, আটটার মধ্যে এই অপারেশন শেষ করতে হবে, দেরি হলে আরও একজন লোক মারা যাবে। সেই সাথে স্মরণ রাখতে বলছি, জিম্মিদের উদ্ধার করার যে-কোন প্রচেষ্টা শুরুতেই নস্যাৎ করে দেয়া হবে—আগুনের সাহায্যে। সেক্ষেত্রে একজন একজন করে নয়, বন্দীদের সবাইকে একসাথে মেরে ফেলা হবে''।'

'অদ্ভুত,' বললেন উপ-মন্ত্রী, মনে মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করছেন ইউনাকোর ডেপুটি ডিরেক্টর কি ধরনের সাহায্য চাইতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে।

'কবির চৌধুরীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন আপনারা,' বলল সোহানা। 'দ্বীপে কেউ নামতে পারবে না। নুড়ি পাথর ভরা অন্য কোন ব্যাগ নয়, পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের হীরে ভরা ব্যাগই ঝুলিয়ে দিয়ে আসতে হবে ক্রসবারে। সময়েরও যেন কোন হেরফের না হয়, সম্ভব হলে আগেই কাজটা শেষ করবেন। পরে আমি আপনাকে আরও পরামর্শ দিতে পারব বলে আশা রাখি।'

'ইউনাকো যখন চার্জে রয়েছে, আপনি যা বলবেন তাই হবে, মিস সোহানা,' বললেন উপ-মন্ত্রী। 'কিন্তু তারপরও যদি কোন...'

'তারপরও খারাপ কিছু যদি ঘটে, আমি দায়ী থাকব,' গম্ভীর সুরে বলল সোহানা। উঠে দাঁড়াল ও।

লাউঞ্জ থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে সোহানা, তার সাথে হন হন করে হাঁটছেন উপ-মন্ত্রী। জানতে চাইলেন, 'কবির চৌধুরী কিভাবে উদ্ধার করবে ব্যাগটা, আপনার কোন ধারণা আছে?'

'সেটা জানলে তো তাকে বাধাই দিতে পারতাম,' বলল সোহানা, বেরিয়ে এল লাউঞ্জ থেকে। উপ-মন্ত্রীকে পিছনে ফেলে এয়ারপোর্ট অ্যাপ্রনের দিকে এগোল ও।

গভীর ছায়া পড়েছে পাহাড়ের গায়ে। ছোট বড় পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে কার্নিস ধরে আরও খানিক এগিয়ে সিক্রেট এজেন্ট গডলিম্যানের মাথার ওপর চলে এল রানা। ঝুঁকি নিয়ে ধীরে ধীরে, সতর্কতার সাথে নামতে শুরু করল ও, গডলিম্যান বা হেলিকপ্টারের পাইলটকে চমকে দিতে চায় না। দু'জনের মধ্যে আর যখন মাত্র কয়েক ফিট ব্যবধান, নরম সুরে বলল, 'গডলি, আমি রানা!'

সাথে সাথে বিদ্যুৎ খেলে গেল গডলিম্যানের শরীরে। আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হবে, তার কোন সুযোগই পেল না রানা। হিংস্র বাঘের মত ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গডলিম্যান। 'শালা বেঈমান! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!' অপ্রস্তুত রানার গলা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে সে। হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটছে রানা।

'আরে, তুমি কি পাগল হলে...ছাড়ো,...'

'চোপ, শালা!' গর্জে উঠল গডলিম্যান। এরই মধ্যে হাঁপাতে শুরু করেছে সে। 'তুই শালা টাকা খেয়ে মানুষ খুন করিস! এত বড় স্পর্ধা তোর ম্যালকম ফিলপটের মত একজন...'

'এভাবে চিৎকার করলে দু'জনেই ধরা পড়ে যাব...'

পিছু হটছে রানা, ধাক্কা খেলো একটা পাথরের সাথে। গডলিম্যানকে বুকে নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল ও। গডলিম্যানকে মারার জন্যে হাত উঠছে না ওর। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ব্যাপারটা। হঠাৎ ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল গডলিম্যান, জুতো পরা একটা পা তুলল রানার মুখের ওপর। পা-টা নেমে আসছে দ্রুত। দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলল রানা। কষে এক মোচড় দিয়ে ঠেলে দিল সামনের দিকে। ছিটকে গিয়ে পাঁচ হাত দূরে পড়ল গডলিম্যান, মাথাটা ঠুকে গেল একটা পাথরের সাথে। আধশোয়া অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে তার বুকের ওপর উঠে এল রানা, ভাঁজ করা হাঁটুর নিচে বন্দী করল তার একটা হাত, নিজের বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরল একটা কব্জি, বলল, 'আগে শোনো, তারপর মারামারি কোরো। ভুলটা কোথায় হয়েছে বুঝতে পেরেছি আমি। মাসুদ রানা এখানে একজন নয়, দু'জন। কবির

চৌধুরী যাকে দিয়ে এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাক করিয়েছে সে আমি নই, নকল রানা।'

ফুলে ওঠা মাথার পিছনটা ব্যথা করছে, কিন্তু রানার কথা শুনে সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলল গডলিম্যান। চোখে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল সে। 'দু'জন রানা!' ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। 'অসম্ভব...' পরমুহূর্তে ভাবল, রানা যদি খুনীই হবে, সে যদি এনার্জি সেক্রেটারিকে খুনই করে থাকবে, তাহলে তার দৃষ্টি আকর্ষণের সময় কাঁধ থেকে সাবমেশিন-গানটা নামায়নি কেন? কেন তাকে গুলি করে মেরে ফেলেনি? 'তুমি তাহলে...'

'রানা। নকল লোকটা কে, আমি জানি না, গডলি,' তার বুক থেকে নেমে পড়ে বলল রানা। 'প্লাস্টিক সার্জারীর সাহায্য নিয়ে তাকে আমার মত বানিয়েছে কবির চৌধুরী।' উঠে দাঁড়াল ও। 'ওকে ঠেকাতে হবে, গডলি।'

উঠে বসল গডলিম্যান, মাথার পিছনে হাত দিতেই ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখ। থেমে থেমে বলল, 'ওই লোকের আচরণ প্রথম থেকেই খাপছাড়া লেগেছে আমার, কিন্তু একবারও সন্দেহ হয়নি যে...'

'হুবহু আমার চেহারা?'

'হুবহু।'

'কাকে খুন করেছে সে,' জানতে চাইল রানা। 'এনার্জি সেক্রেটারি?'

'হ্যাঁ,' বলল গডলিম্যান। হত্যাকাণ্ডটা কিভাবে ঘটেছে তার একটা বর্ণনা দিল সে।

কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারল না রানা। ম্যালকম ফিলপটের সাথে দু'একবারই আলাপ হয়েছে ওর, কিন্তু ভদ্রলোককে দারুণ ভাল লাগত ওর। জানতে চাইল, 'শালা কি এখনও এয়ারফোর্স ওয়ানের ইউনিফর্ম পরে আছে, ঠিক জানো?'

'জানি, আছে।'

'আমার কাপড় তুমি পরো, তোমারটা আমাকে দাও,' বলল রানা।

'কেন?'

'পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে ওদের সাথে ওদের রানা হিসেবে অভিনয় করব আমি। বলব, নাগালের বাইরে চলে গেছ তুমি, কাজেই সার্চ করার আর কোন দরকার নেই। তাতে অন্তত খানিকটা সময় পাওয়া যাবে।'

পরনের কাপড় বদলাবদলি করল ওরা। গডলিম্যানকে আড়ালে অপেক্ষা করতে বলে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নেমে এল রানা। জঙ্গলে ঢোকার সময় ভাবল, সার্চ পার্টিতে যদি নকল লোকটাও থাকে? একই চেহারার দু'জন লোককে দেখে কবির চৌধুরীর গেরিলারা কি করবে? গেরিলাদের প্রথম দলটাকে তাদের পিছন থেকে দেখতে পেল ও। সন্তর্পণে তাদের একেবারে পিঠের কাছে চলে এল। এরা কেউ তার মত লম্বা নয়, কাজেই ধরে নেয়া চলে এদের মধ্যে শয়তানের চেলাটা নেই। ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও, নির্দেশের সুরে বলল, 'খোঁজাখুঁজির দরকার নেই আর, সবাই ফিরে যাও। বসের হুকুম। কুইক!' সবাই ইংরেজি বুঝল না, কিন্তু যারা বুঝল তাদের দেখাদেখি বাকিরাও

ফিরে চলল। রানা ওদের সাথে আসছে কিনা দেখার জন্যে একজনও ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল না। ওদেরকে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে দিল রানা, তারপর আবার ফিরতি পথ ধরে বেরিয়ে এল জঙ্গলের বাইরে।

গডলিম্যানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রানা, এই সময় জোরাল একটা দড়াম আওয়াজ ভেসে এল নিচের দিক থেকে।

'ড্রব্রিজের শব্দ,' বলল গডলিম্যান। 'কিছু একটা বেরুবে বোধ হয়।'

ব্রিজের ওপর একটা মিনি বাসকে দেখা গেল। রাস্তা ধরে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা, তাকে অনুসরণ করল লোক ভর্তি একটা ট্রাক আর দুটো জীপ। চোখে ফিল্ড গ্লাস তুলে বাসের আরোহীদের গুনল রানা। জিম্মিদের সাথে কবির চৌধুরীও রয়েছে। 'ব্যাটল ড্রেস পরা একটা মেয়েকেও দেখলাম,' বলল ও। জিম্মিরা সবাই রয়েছে ওতে, সম্ভবত একজন বাঁদে।'

'কে সে?'

'রোজি...'

'চিলেঘরে ফারুকের সাথে থাকার কথা ওর,'. চিন্তিত ভাবে বলল গডলিম্যান। 'তুমি জানো, রোজি ইউনাকোর একজন এজেন্ট?'

'পরে জেনেছি।'

'নিশ্চয়ই ওর কোন বিপদ হয়েছে, রানা!'

'হুঁ।' গম্ভীর দেখাল রানাকে। 'ঠিক আছে, দেখি ওকে উদ্ধার করতে পারি কিনা।'

'মানে? তুমি দুর্গের ভেতর ঢুকতে চাও?'

'ক্ষতি কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

দুটো কমিউনিকেটরের একটা গডলিম্যানকে দিল রানা। রসিকতা করে বলল, 'আবার যদি দেখা হয়, ইউনিফর্মটা চেয়ে নিয়ো।'

পাহাড় থেকে দুর্গে নামল রানা। ওকে দেখে অবাক হলো একজন গার্ড, রানা তাকে ঝাঁঝের সাথে জানাল, খানিক দূর গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে একটা জীপ। লক্ষ করল গেরিলাদের অনেকেই দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে। আরও কয়েকজনকে বিদায় করার সুযোগটা কাজে লাগাল ও। মেইন গেটের কাছে এরা পাঁচজন রয়েছে, আর কেউ কিছু জানতে চাওয়ার আগেই বলল, 'রাস্তা ধরে কিছু দূর গেলেই নষ্ট জীপটা দেখতে পাবে। ছুট লাগাও—তুমি, তুমি আর তুমি। যদি মেরামত করা সম্ভব না হয়, ঠেলে রাস্তার মাঝখান থেকে এক ধারে সরিয়ে রেখো।'

তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে গেল তিনজন সেন্ট্রি।

গেটে বাকি দু'জনকে রেখে দুর্গের ভেতর ঢুকল রানা। গডলিম্যানের দেয়া পথ-নির্দেশ অনুসরণ করে ওপরতলায় উঠে এল ও, শেষ এক প্রস্থ সিঁড়ি টপকে পৌঁছে গেল চিলেঘরের সামনে। এখানেই থাকার কথা রোজির। দরজায় নক করল ও। কিন্তু কোন মেয়েলি গলা নয় ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিজয়ী এক

পুরুষের উল্লাস-ধ্বনি।

ছাদের কার্নিস থেকে রশি খুলে দিয়ে ওখানে আর এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করেনি রোজি, কাঁচ ভাঙা লম্বা জানালা গলে আবার ফিরে এল চিলেঘরে।

'স্পাই ভদ্রলোক পালাতে পারবেন বলে মনে করেন?' জানতে চাইল ফারুক।

'আশা তো করি...' কাঁচ ভাঙা লম্বা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দুর্গের উঠানে চোখ রাখল রোজি। 'নিচে নামতে এখনও দেরি আছে ওর।'

রোজির পাশে এসে দাঁড়াল ফারুক। 'আমার কিন্তু ভয় করছে...'

দড়াম করে খুলে গেল দরজা, হাতে মেশিন-পিস্তল নিয়ে ঘরে ঢুকল আহমেদ। ঘরে গডলিম্যান নেই, ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঁচ ভাঙা জানালার সামনে, এটুকু দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল সে। কুকুরের মত ঘেউ করে উঠে দরজার বাইরে দাঁড়ানো গার্ডকে ডাকল সে, তারপর ছুটে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল। 'ধর, ধর! পালাল, পালাল!'

চিৎকারে কাজ হচ্ছে না বুঝতে পেরে মেশিন-পিস্তল দিয়ে নিচের উঠানে গুলি করল আহমেদ। একটু পর দেখল, ড্রব্রিজ পেরিয়ে খাদের ওপারে গিয়ে পড়ল গডলিম্যানের মোটরসাইকেল।

ইতিমধ্যে জানালার কাছ থেকে সরে বিছানায় এসে বসেছে রোজি আর ফারুক, মুখ থেকে রক্ত নেমে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দু'জনের চেহারা। ওদের দিকে ফিরল আহমেদ, গার্ডকে বলল, 'এই শালার ছেলেটাকে ট্রফিরুমে নিয়ে যাও।' ফারুক ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে দেখে এগিয়ে এসে তার গালে ঠাস করে একটা চড় কষাল সে। 'কথা না শুনলে জবাই করে ফেলব, চিনিস না আমাকে!'

'বাচ্চা ছেলের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না তোমার?' অসহায় অবস্থাতেও ফুঁসে উঠল রোজি।

কদর্য একটা ভঙ্গি করল আহমেদ, মুখ ভেঙচে বলল, 'ওমা, বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর! থাম, মাগী, লজ্জা কাকে বলে দেখাচ্ছি তোকে!'

ফারুকের হাত ধরে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে গার্ড, তাকে থামতে বলল আহমেদ। 'মি. কবির চৌধুরী বা মেনিলথিন যাকেই আগে পাও, বলবে গডলিম্যান পালিয়েছে।'

আহমেদকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগোল রোজি। 'আমিও ফারুকের সাথে যাব!'

খপ্ করে রোজির একটা হাত ধরে ফেলে হ্যাঁচকা টান দিল আহমেদ, পরমুহূর্তে ছেড়ে দিল হাতটা। ছিটকে এসে বিছানার ওপর পড়ল রোজি। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল গার্ড।

রোজির দিকে মেশিন-পিস্তল তাক করল আহমেদ। 'তুমি আমার। মি. কবির চৌধুরীর দেয়া মূল্যবান উপহার,' বলল সে। 'তোমার সামনেই তিনি আমাকে বলেছেন, তোমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারি আমি।'

বিছানার ওপর উঠে বসল রোজি। এরপর কি ঘটবে, বুঝতে পারছে। গলাটা শুকিয়ে গেল। এই ধরনের বিপদের জন্যে তৈরি ছিল না সে। এদিক ওদিক তাকাল, হাতের কাছে যদি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু নেই।

'তুমি একটা খাসা মাল,' জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল আহমেদ। 'যদি বলি, তোমাকে আমি ভালবাসি, তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু যদি বলি লোভ হয়?' গলা ছেড়ে হেসে উঠল সে। 'আরে, এত ভয় পাবার কি আছে? আমি তো আর বাঘ-ভাল্লুক নই। নাও, ঝটপট সব খুলে ফেলো দেখি! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! আমার এদিকে অবস্থা কাহিল!'

শক্ত কাঠ হয়ে বসে আছে রোজি, নড়ার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে।

'ব্যাপারটাকে দু'রকমভাবে নিতে পারো তুমি,' বলল আহমেদ। 'একটায় আরাম পাবে, আরেকটায় কষ্ট পাবে। কোন পুরুষের সাথে এটাই যখন তোমার জীবনের শেষ মিলন, আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব, আরামটাকেই বেছে নাও।' এক হাতে মেশিন-পিস্তল, আরেক হাত দিয়ে ট্রাউজারের চেইন খুলল সে। 'তোমার মত ইয়াঙ্কি মেয়ের জানার কথা নয়, কিন্তু সত্যিই বিছানায় আরব পুরুষের তুলনা হয় না। কি হলো, কাপড় খোলো!'

রোজি তবু নড়ছে না দেখে ব্যাটল-ড্রেসের বেল্ট থেকে একটা চকচকে ছুরি বের করল আহমেদ। 'এই শেষবার বলছি, খোলো। তা না হলে কাপড়ে ছুরি চালিয়ে উদোম করব। ভেবে দেখো, চামড়া কেটে যেতে পারে তার ফলে।'

চোখে ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে আছে রোজি।

ওর দিকে এগিয়ে এল আহমেদ। 'কোনটা তোমার পছন্দ?' চাপা গলায় জানতে চাইল সে, 'আরাম, না ব্যথা?'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রোজি। কঠিন সুরে বলল, 'খবরদার, আর এক পাও এগোবে না!'

আবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল আহমেদ। 'ওসবে কোন কাজ হবে না, সুন্দরী! জোর খাটাব আমি। দরকার হলে আগে তোমাকে শেষ করব, তারপর কাজ সারব লাশের ওপর।'

হঠাৎ যেমন রুখে দাঁড়িয়েছিল রোজি, তেমনি হঠাৎ করেই নিস্তেজ হয়ে গেল সে। শরীরটা কাঁপতে শুরু করল। নির্লজ্জ জানোয়ারটা তাকে পাবার জন্যে কি রকম তৈরি হয়ে গিয়েছে, তলপেটের নিচে ইউনিফর্মটা ফুলে উঠতে দেখে বুঝতে পারল সে।

সামনের দিকে লাফ দিল আহমেদ। আঁতকে উঠে পিছিয়ে যেতে গিয়ে খাটের সাথে ধাক্কা খেলো রোজি, ধপ করে বসে পড়ল বিছানার কিনারায়। জ্বলে উঠল কানের নিচটা। রক্তের একটা সরু ধারা নেমে এল কাঁধের দিকে। আঙুল দিয়ে ছুঁলো সে, তারপর হাতটা চোখের সামনে নিয়ে রক্ত দেখল। আতঙ্কে নীল হয়ে গেল চেহারা।

ছুরিটা চালিয়েই আবার লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল আহমেদ। রোজির চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠতে দেখে তৃপ্তির হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'দেখতেই পাচ্ছ,

আমার হাতে এ-দুটো কি রয়েছে। কিন্তু মেশিন-পিস্তলটা আমি একান্ত বাধ্য না হলে ব্যবহার করতে রাজি নই। পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম। তারপর আবার ছুরি চালাব। কোথায় লাগবে তা কিন্তু আমিও জানি না।'

শিউরে উঠে ব্রেজারটা খুলতে শুরু করল রোজি। আঙুলগুলো ব্লাউজের বোতাম খুঁজতে শুরু করল। তার আঙুলের নড়াচড়া আহমেদের লোভাতুর দৃষ্টি লক্ষ করছে গভীরভাবে। তারপর স্কার্টের হুক খুলল রোজি। হাত দুটো দু'পাশে মেলে দিয়ে বিছানার ওপর উঠে দাঁড়াল সে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে এক পা এগিয়ে এল আহমেদ, চোখে নগ্ন লালসা। দুর্গ ছেড়ে যাচ্ছে কয়েকটা গাড়ি, আওয়াজ শুনে ধারণা করল রোজি, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। ব্লাউজ খুলে ফেলল সে, কোমর থেকে নামিয়ে দিল স্কার্ট। পা ছুঁড়ে কাপড়গুলো বিছানা থেকে ফেলে দিল, তারপর মুখ তুলে তাকাল আহমেদের দিকে। হাত দুটো পরস্পরের সাথে জোড়া লেগে আছে, স্থির হয়ে আছে মসৃণ তলপেটের ওপর।

'ওগুলোও,' রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করে বলল আহমেদ। 'ওগুলোও খোলো—আমাকে দেখতে দাও।'

নড়ল না রোজি।

'এই মাগী, শুনতে পাস না?' কর্কশ, নিচু গলা।

এক পা এগিয়ে বিছানার একেবারে কিনারায় দাঁড়াল রোজি। ফর্সা তলপেট জানোয়ারটার নাকের সামনে চলে এল। 'নাও,' ম্লান গলায় বলল সে, 'নিজের হাতে খোলো।'

ঢক ঢক অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেল রোজি, ঘন ঘন ঢোক গিলছে আহমেদ। চট করে ব্রেসিয়ার আর ব্রিফটা দেখে নিল। বলল, 'না!' হাঁপাচ্ছে সে। 'না! তুমি!'

জোর করে একটু হাসল রোজি। 'কেন? না কেন?'

'না!' আবার পর পর কয়েকটা ঢোক গিলল আহমেদ। রোজির অর্ধ-নগ্ন শরীর দেখে মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে তার।

'না বললে শুনব না,' আবার জোর করে একটু হাসল রোজি। 'এটা পুরুষের কাজ, তোমাকেই করতে হবে।'

মেশিন-পিস্তলের দিকে তাকাল আহমেদ, তারপর অপর হাতে ধরা ছুরির দিকে। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল, তারপর মাথা নাড়ল সে। 'না!'

অগত্যা বিছানার ওপর বসল রোজি। হাত দুটো কোলের ওপর ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, আমি পিছনে ফিরি, তুমি শুধু ব্রেসিয়ারের হুকটা খুলে দাও। নাকি তা-ও পারবে না?'

মাথা নাড়ল আহমেদ। কোল থেকে হাত দুটো বিদ্যুৎবেগে তুলে মেশিন-পিস্তলের ব্যারেল ধরে ফেলল রোজি, ট্রিগার গার্ডের সাথে আটকানো আঙুলটা মোচড় দিয়ে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করল। প্রচণ্ড ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল আহমেদ। কিন্তু সেই সাথে ঝাঁকি দিয়ে অস্ত্রটা ছাড়িয়ে নিল রোজির হাত থেকে। 'তবে রে, শালী!' বলে ছুরির ডগাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ব্রেসিয়ারের গায়ে

ঠেকাল, দ্রুত টান দিল ওপর দিকে। চোখের পলকে নগ্ন হয়ে গেল রোজির বুক, বুকের ঠিক মাঝখানে দু'ইঞ্চি লম্বা চিকন একটা লাল রেখা দেখা গেল, ছুরির ধারাল ডগা লেগে ফুটেছে দাগটা। হাত দিয়ে নিজের বুক ঢাকল রোজি। পরমুহূর্তে ছুরিটা বাড়াল আহমেদ, ধারাল ডগার মৃদু খোঁচায় এবার ছোট্ট সিল্কের ব্রিফটা দু'টুকরো হয়ে গেল। সেই সাথে রোজির হাতের ওপর হাত রেখে বুকে ধাক্কা দিল সে। বিছানার ওপর পড়ে গেল রোজি চিত হয়ে।

হাঁ করে হাঁপাচ্ছে আহমেদ, বেল্ট খুলে কোমর থেকে নামিয়ে ফেলল ট্রাউজার। হাতের ছুরি খাড়াভাবে ছেড়ে দিল সে, কাঠের মেঝেতে গেঁথে গেল সেটা। নিচু হয়ে মেশিন-পিস্তলটা রাখল সেটার পাশে। বিছানায় উঠে মাতৃভাষায় দুর্বোধ্য একটা উল্লাস-ধ্বনি ছাড়ল। ঠিক যখন রোজির গায়ের উপর উঠতে যাবে, মাথার পিছনে সাব-মেশিনগানের বাড়ি খেয়ে ঢলে পড়ল সে বিছানার ওপর।

সাব-মেশিনগান সিধে করে নিল রানা। চুলের গোছা ধরে টেনে বিছানা থেকে মেঝেতে ফেলে দিল আহমেদকে। বিছানা থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে পরনের কাপড়গুলো দ্রুত তুলে নিল রোজি, কোনমতে শরীরের সামনে সেগুলো ধরে লজ্জা ঢাকল সে।

'একটা মৌখিক ধন্যবাদও কি আমি পেতে পারি না?' মৃদু হেসে জানতে চাইল রানা।

'আপনাকে আমি ঘৃণা করি!' বলে থরথর করে কাঁপতে লাগল রোজি।

'শালা আমার জীবনটা দেখছি নরক করে তুলেছে!' আপনমনে বলল রানা।

বিছানার চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়াল রোজি। 'মানে?'

আসল ঘটনা ব্যাখ্যা করল রানা। একটু সময় লাগল, তবে শেষ পর্যন্ত রানার সব কথা বিশ্বাস করল রোজি। আরও দু'একটা প্রশ্ন করে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে, এমনি সময়ে মেঝে থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে রানার পিঠ লক্ষ্য করে লাফ দিল আহমেদ। রোজির চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে দেখেই বুঝে ফেলল রানা, বিদ্যুৎ গতিতে সরে গেল সে একপাশে। শার্টের আস্তিনে লাগল ছুরির ডগা, খানিকটা চামড়া সহ চিরে গেল সেটা।

লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় তাল হারিয়ে ফেললেও, চোখের পলকে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আহমেদ। সাথে সাথে চোখ-মুখ কুঁচকে ছুরি সহ হাতটা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে তুলল মুখের সামনে। রানার হাতের সাব-মেশিনগানের বাট পড়ল তার মুখে। রক্তাক্ত হয়ে গেল মুখ, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না সে, ছুরিটাও ছাড়ল না। রানা আবার উল্টো করা সাব-মেশিনগান নিয়ে এগিয়ে আসছে দেখে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে।

আহমেদ বুঝতে পেরেছে, গার্ডরা এসে পড়বে এই ভয়ে গুলি করতে চাইছে না রানা।

মাথা নিচু করে, ছুরি সহ ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে লাফ দিল আহমেদ, রানার তলপেটে ঢুকিয়ে দেবে ধারাল ফলাটা। ফুল টস বল পেলে ব্যাটসম্যান

যেভাবে খেলে, বলটাকে লেগের দিকে পাঠাবার জন্যে নিচ থেকে তেরছা ভাবে চালিয়ে বাঁ কাঁধের কাছে তোলে ব্যাট, রানাও ঠিক সেভাবে চালাল উল্টো করে ধরা সাব-মেশিনগান। ব্যাটে-বলে হলো, ছিটকে পাথুরে দেয়ালে গিয়ে পড়ল আহমেদ। এগিয়ে গিয়ে মেশিনগানের স্লিংটা তার গলায় ফাঁসের মত করে পরিয়ে দিল রানা, তারপর অনবরত ঘোরাতে শুরু করল অস্ত্রটা। চামড়ার স্লিং এঁটে বসল আহমেদের গলায়। তার বুকে একটা পা দিয়ে মেঝের সাথে শরীরটাকে চেপে রাখল রানা। দাপাদাপি করল আহমেদ। মুখ খুলে বাতাস টানার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল লম্বা, হলুদাভ জিভ। চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। নিঃশব্দে মারা গেল সে।

ছয়

স্লিঙের সাথে লটকানো সাব-মেশিনগানটা পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে রানা, সেটার ওপর চাপা দিয়েছে ভাঁজ করা জ্যাকেট। অস্ত্রটা আমেরিকার তৈরি, এখন আর সেটা কারও চোখে পড়বে না। ওর হাতে রয়েছে আহমেদের মেশিন-পিস্তল, রোজির পিঠের দিকে তাক করে আছে ও। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। দুর্গে ঢোকার সময় কার পার্কে তিনটে জীপ দেখেছিল রানা, আরেকটা হাফ ট্রাক ছিল ভেতরের উঠানে। ট্রাকে নানা ধরনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস দেখেছিল ও, কোথাও সাপ্লাই দেয়া হবে।

নিচে নেমে এসে মনে হলো, খালি হয়ে গেছে দুর্গ। কিন্তু সতর্ক থাকল রানা সারাক্ষণ, তীক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক তাকাল, কোথাও যদি ওর ডুপ্লিকেটটাকে দেখতে পাওয়া যায়। আরোহীদের মধ্যে লোকটাকে দেখেনি ও। উঠানে পৌঁছে দেখল, একজন নিরস্ত্র লোক ট্রাকের ওপর শেষ একটা বস্তা তুলছে। লোকটা চোখে নগ্ন কৌতূহল নিয়ে দেখল রানা আর রোজিকে, কিন্তু কোন কথা বলল না।

'সবাই গেল কোথায়?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রোজি।

'সবাইকে নিয়ে চলে গেছে কবির চৌধুরী,' নিচু গলায় বলল রানা। 'জিম্মিদের একটা মিনিবাসে দেখেছি আমি। কোথায় গেছে ওরা, জানি না।'

'ছেলেটা?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল রোজি, 'ফারুক? তাকেও কি...'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'ছেলেটা অসুস্থ, রানা। আমি ছাড়া কেউ ওর চিকিৎসা করতে পারবে না!'

'চুপ!' বলল রানা। ড্রব্রিজের কাছে চলে এসেছে ওরা। দু'জন গার্ডকে দেখে গিয়েছিল ও, সেখানে এখন তিনজনকে দেখা যাচ্ছে।

ড্রব্রিজে পা দিয়েছে ওরা, একটা পিলার থেকে পিঠ তুলে সিধে হয়ে দাঁড়াল তিন নম্বর গার্ড। রানাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে সে। 'কি ব্যাপার, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে?' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল।

'হুকুম,' বলল রানা।

বিমূঢ় চেহারা নিয়ে সঙ্গীদের কি যেন বলল সে, নিজেদের ভাষায়। তারপর আবার রানার দিকে ফিরল, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জানতে চাইল, 'কার হুকুম? আপনি রওনা হবার অনেক আগেই তো মি. কবির চৌধুরী চলে গেছেন।'

চট করে কার পার্কের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। দুটো জীপ রয়েছে। জিম্মি আর কবির চৌধুরীর সাথে যোগ দেবার জন্যে নকল লোকটা তাহলে অপর জীপটা নিয়ে গেছে। বেল্ট থেকে কমিউনিকেটরটা খুলে গার্ডের নাকের সামনে দোলাল ও। কর্কশ স্বরে বলল, 'হুকুম অনেক ভাবে পাঠানো যায়, গর্দভ!' রোজিকে দেখাল ও। 'ওকে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে আমাকে।'

'ও,' শান্ত হয়ে গেল গার্ড। তারপর জানতে চাইল, 'ওকে না পাহারা দিচ্ছিল আরব লোকটা?'

'হেভি খাটনি গেছে তার ওপর দিয়ে,' একটা চোখ টিপে বলল রানা, 'একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।'

হেসে উঠল গার্ড, তারপর ইঙ্গিতে কি বোঝাতে চাইল রানা সেটা অনুবাদ করে শোনাল সঙ্গীদের। রোজির দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল সবাই। ওদেরকে বলল রানা, মি. কবির চৌধুরী নির্দেশ দিয়েছেন, মেয়েটাকে এখুনি নিয়ে যেতে হবে। সেন্ট্রি যারা এখনও এখানে আছে আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তাদের। শেষ জীপটা নিয়ে রওনা হবে তারা।

'আর সাপ্লাই ট্রাক?' জানতে চাইল গেরিলা, হাতের সাব-মেশিনগান নেড়ে ভেতরের উঠান দেখাল।

'তৈরি হবার সাথে সাথে রওনা হয়ে যাবে ওটাও,' বলল রানা।

'কোথায় যাবে? গুহায়?'

'আর কোথায়?'

রোজিকে নিয়ে সামনের জীপটায় চড়ল রানা, কার-পার্ক থেকে জীপ চালিয়ে রাস্তায় উঠে এল রোজি।

'গুহা?' প্রশ্ন করল রোজি।

'তুমিও যেখানে আমিও সেখানে,' বলল রানা। 'আমাদের হাতে এটাই একমাত্র ক্লু।'

'সাপ্লাই ট্রাকটাকে অনুসরণ করলেই তো হয়,' পরামর্শ দিল রোজি।

'হয়, এবং তাই করা উচিত আমাদের,' বলল রানা। 'কিন্তু এই জীপটা অন্য কাজে দরকার আমার।'

একটা বাঁক ঘুরল জীপ, দূরে দেখা গেল লাল আর সাদা রঙের ক্রসবার, রোড ব্যারিয়ার। ব্যারিয়ারের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন গেরিলা।

'যা ভয় করেছিলাম, তাই,' চিন্তিত সুরে বলল রানা।

'কি?'

'রাস্তার পাশে ঢালে কোথাও আরও একটা গাড়ি আছে...'

'জানি,' উৎসাহের সাথে বলল রোজি। 'গডলিম্যান ফেলে গেছে...'

'এই ব্যাটা এখানে থাকলে সেটা উদ্ধার করি কিভাবে? তাছাড়া, আমি চাই দুর্গের লোকরা জানুক, কোথাও না থেমে সোজা গুহার দিকে গেছি আমরা।'

'তাহলে উপায়?'

উত্তর দিল না রানা। ব্যারিয়ারের সামনে জীপ দাঁড় করাল রোজি। ব্যারিয়ার তুলে নিতে শুরু করল গেরিলা, জীপ থেকে নেমে তার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'স্পীক ইংলিশ?' জানতে চাইল ও।

'এ লিতিল।'

আঙুল দিয়ে নিজেদের ফেলে আসা পথ অর্থাৎ দুর্গের দিকটা দেখাল রানা, বলল, 'ইউ—গো ব্যাক দেয়ার।'

সানন্দে ঘাড় নাড়ল গেরিলা, কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রাইফেলটা, তারপর দুর্গের দিকে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। পিছন থেকে তার গলাটা এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে জোরে চাপ দিল রানা। খানিক ছটফট করে জ্ঞান হারাল লোকটা। ছেড়ে দিতেই নিঃশব্দে মাটিতে পড়ে গেল। তাকে টেনে নিয়ে এল রানা ঢালের কিনারায়। কিনারা থেকে পা দিয়ে ঠেলে দিতেই গড়াতে শুরু করল শরীরটা, খানিক দূর নেমে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'জীপ নিয়ে সাপ্লাই ট্রাকের পিছু নেবে তুমি,' বলল রানা। 'আমি বাইকটা উদ্ধার করে সোহানার সাথে দেখা করতে যাব।'

'ম্যাডামকে নিয়ে আসবেন, তাই না? জীপটা নিয়ে গেলেই তো পারেন। আমি বাইক চালাতে জানি।'

'মন্দ বলোনি।'

ঢালে নেমে গিয়ে মোটরসাইকেলটা খুঁজতে শুরু করল ওরা। পেল রোজি। 'বহাল তবিয়তেই আছে দেখছি!' খাড়া করল সেটাকে, প্রথমবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল এঞ্জিন।

হোন্ডা নিয়ে রাস্তায় ফিরে এল ওরা। হোন্ডা ও জীপটাকে কয়েকটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। খানিক পরই এঞ্জিনের আওয়াজ ঢুকল কানে, সাপ্লাই ট্রাক আসছে। হোন্ডার ওপর চড়ে বসল রোজি।

রশি দিয়ে বাঁধা মাল-পত্রে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ট্রাক। ওদের সামনে দিয়ে বেশ দ্রুতগতিতে ছুটে গেল সেটা। দশ পর্যন্ত গুনল রোজি, তারপর স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল হোন্ডা। নিজের বেল্টে রানার কমিউনিকেটর বেঁধে নিয়েছে সে, কবির চৌধুরীর নতুন আস্তানায় পৌঁছে এটার সাহায্যে যোগাযোগ করবে গডলিম্যানের সাথে।

পাহাড়ে উঠে গডলিম্যানের কাছে ফিরে এল রানা। কিভাবে কি করা হবে, ব্যাখ্যা করে বলল তাকে ও। ঠিক হলো, দুর্গ খালি হয়ে গেলে সেখানে

গিয়ে রোজির মেসেজের জন্যে অপেক্ষা করবে গডলিম্যান। মূর্ছিত গেরিলার অস্ত্রটা গডলিম্যানকে দিল রানা।

'রোজির কাছে কিছু আছে, রানা?' জানতে চাইল গডলিম্যান।

'আহমেদের মেশিন-পিস্তল,' বলল রানা। রোজিকে রেপ করতে যাচ্ছিল আহমেদ, রানার মুখে সব ঘটনা শুনে রাগে লাল হয়ে গেল সিক্রেট এজেন্টের চেহারা। সবশেষে বলল রানা, 'চিন্তা কোরো না, ইউনাকোর মিস সোহানা সম্ভবত গোটা ডিপোই খালি করে নিয়ে আসছে···চাই কি কামান, রকেট এই সবও পেয়ে যেতে পারো।'

নিঃশব্দে হেসে রানাকে বিদায় জানাল গডলিম্যান। নিজের জায়গায় ফিরে রাইফেলটা কোলে নিয়ে বসল। বিকেলের সোনালী রোদে গোসল করছে দুর্গ, সেদিকে তাকিয়ে বসে রইল সে চুপচাপ।

পাহাড় থেকে নেমে কিনিন শহরে ঢুকেছে রাস্তাটা, চারদিক থেকে আরও চারটে রাস্তা এসে এক হয়েছে এই শহরের মাঝখানে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে সাপ্লাই ট্রাকের পিছু পিছু শহরে পৌঁছুল রোজি, ধারণা করল, বাঁক নিয়ে সাইবেনিকের পথ ধরবে সাপ্লাই ট্রাক। কিন্তু তা না করে বেনকোভাক-এর রাস্তা ধরল সেটা, তারপর খানিকদূর এগিয়ে এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে এমন একটা জায়গায় পৌঁছুল যেখান থেকে দুর্গ হবে বিশ থেকে পঁচিশ কিলোমিটার, আর সাগর হবে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে। এটাও পাহাড়ী এলাকা, তবে ডাইনারিক আল্পসের মত দুর্গম নয়। সূর্য পশ্চিম দিগন্ত রেখার কাছাকাছি নেমে গেছে, মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রোজি। দিনের আলো থাকতে থাকতে গুহার হদিস পেতে হবে তাকে।

গতি মন্থর হয়ে এল জীপের। রাস্তা থেকে সরে এসে কয়েকটা বোল্ডারের আড়ালে হোন্ডা থামাল রোজি। ডানদিকে ঘুরে গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাওয়া রাস্তা ধরল ট্রাক। পাহাড়ের আরও ওপর দিকে তাকাল রোজি, বার লাগানো একটা গেট দেখতে পেল। গেটের সামনে মস্ত একটা চাতাল, দেয়াল দিয়ে ঘেরা, এখানে সেখানে কয়েকটা পিলারও দেখা গেল। গেটের সামনে থামল ট্রাক, কে এল দেখার জন্যে উদয় হলো একজন গার্ড। চাতালের দেয়াল আর পিলারের পিছনে গুহার কালো মুখ ছাড়া বিশেষ কিছু দেখতে পেল না ও।

বোল্ডারের আড়ালে হোন্ডা লুকিয়ে রেখে একটা ঘুর পথ ধরে পাহাড়ের ওপরে, গুহার প্রবেশ মুখ থেকে খানিকটা উঁচুতে উঠে এল রোজি। কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখল দেয়াল ঘেরা কংক্রিটের চাতালে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনিবাসসহ আরও কয়েকটা গাড়ি। তারপরও আরও অনেক জায়গা খালি পড়ে আছে। জায়গা বদল করে আরেক দিক থেকে গুহার ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল সে। তোবড়ানো সাইনপোস্ট দেখা গেল প্রবেশ মুখের একটা দেয়ালে, তাতে একটা মানুষের মাথার খুলি আর ক্রসবোন আঁকা রয়েছে, নিচে কি যেন লেখা, পড়া গেল না। খুলির পাশে আরও একটা জিনিস আঁকা রয়েছে, বিস্ফোরক জাতীয় কিছু হতে পারে। তবে কি যুদ্ধের সময় এটা

একটা অ্যামুনিশন ডিপো ছিল? সম্ভবত তাই। গুহার ভেতর আলো রয়েছে, জেনারেটরের আওয়াজও পেল সে। কিন্তু গুহার ভেতরটা ভাল দেখা গেল না।

মন খারাপ করে কিনারা থেকে সরে এল রোজি। গুহার আকার-আকৃতি জানতে হবে তাকে, জানতে হবে ঠিক কোন্‌খানটায় রাখা হয়েছে জিম্মিদের। এসব জানতে হলে পাহাড়ের একেবারে মাথায় গিয়ে উঠতে হবে তাকে। গেটে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেন্ট্রি, কাজেই খুব সাবধানে উঠতে শুরু করল সে। গেটের ভেতরই যে জায়গাটা সেটা প্রশস্ত একটা টানেল মাত্র, আসল গুহা আরও অনেক ভেতর দিকে রয়েছে, আন্দাজ করল সে। ধারণাটা যে সত্যি প্রমাণ পাওয়া গেল চূড়ায় উঠে এসে। তবে যতটা লম্বা হবে বলে মনে করেছিল, গুহার ভেতরটা তারচেয়ে অনেক বেশি লম্বা। গুহাটা দু'ভাগে ভাগ করা, মাঝখানে ছেদ টেনেছে একটা গভীর নদী।

প্রবেশমুখ থেকে এগিয়ে গিয়ে টানেলটা শেষ হয়েছে নদীর উঁচু পাড়ে। নদী আর খাদের ওপর ঝুলছে সরু একটা ব্রিজ। ওপারে একটা ছোট পথ, অদৃশ্য হয়ে গেছে আরেকটা টানেলের ভেতর, এটাই আসল গুহা। ঝুলন্ত ব্রিজে রেইল রয়েছে, তবু ওটাকে নিরাপদ বলা যায় না। একা একা হাসল রোজি। জিম্মিদের কোথায় রেখেছে কবির চৌধুরী, বুঝতে পেরেছে সে।

বেল্ট থেকে কমিউনিকেটর খুলে সুইচ অন করল সে। দুর্গে রয়েছে গডলিম্যান, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যোগাযোগ হলো তার সাথে।

গুহার সামনে মিনিবাস পৌঁছুলে সবার আগে নামল কবির চৌধুরী। নিজের হাতে গেটের তালা খুলল সে। গরু-ছাগলের মত খেদিয়ে মিনিবাস থেকে নামিয়ে আনা হলো জিম্মিদের। সবশেষে নামানো হলো হুইলচেয়ার, তাতে বসে আছেন পঙ্গু বাহরাইনী শেখ, তাঁর একটা হাত ধরে আছে কিশোর নাতি ফারুক। মাথার ওপর এঞ্জিনের গুঞ্জন শোনা গেল, কামোভ হেলিকপ্টার নিয়ে পৌঁছে গেছে মেনিলথিন। কবির চৌধুরীর একজন গেরিলা জেনেরেটার চালু করে দেবার সাথে সাথে আলোকিত হয়ে উঠল টানেল।

পাহারা দিয়ে টানেলের ভেতর ঢোকানো হলো জিম্মিদের। ব্রিজের সামনে আরেকবার গেরিলারা ধরাধরি করে তুলে নিল হুইলচেয়ার, সবার আগে বাহরাইনী শেখ ব্রিজ পেরুলেন। তারপর পা বাড়ালেন সৌদী আরবের ড. ওয়াহাব। ব্রিজ তো দুলছেই, সেই সাথে তাঁর পা-ও কাঁপছে, ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠলেন তিনি। রেইল আঁকড়ে ধরে আছেন, চোখ দুটো কষে বন্ধ করে রেখেছেন, তবু প্রতি মুহূর্তে তাঁর মনে হতে লাগল, নিচের খাদে পড়ে যাচ্ছেন তিনি। তাঁকে অনুসরণ করলেন শেখ আদনান দারজাল আর শেখ ইবরাহিম আতাকী। ফারুক তার দাদুর সাথেই ব্রিজ পেরিয়েছে। সবার মধ্যে বোধহয় একমাত্র সে-ই ভয় পায়নি।

সবার শেষে থাকল কবির চৌধুরী, কিন্তু ব্রিজ পেরোবার আগে মেনিলথিনের সাথে কথা বলল সে, দুর্গের সাথে রেডিও যোগাযোগ করার

নির্দেশ দিল তাকে। 'কায়ামকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও গডলিম্যান ধরা পড়েছে কিনা। ধরা না পড়লে 'কপ্টার নিয়ে যাও তুমি, সার্চ-পার্টির সাথে তুমিও থাকো। ওদিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া মাত্র দুর্গ থেকে সবাই যেন এখানে চলে আসে, এই আমি চাই। আর, হ্যাঁ, কায়ামকে জানিয়ে দাও, হীরে-চোর মেয়েটাকে আমাদের দরকার নেই। তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে সে।'

মেনিলখিনের চেহারায় একটু বিস্ময়ের ভাব ফুটল। সেটা লক্ষ্য করে গম্ভীর সুরে বলল কবির চৌধুরী, 'বেঈমানীর সাজা ওটা। আমার কাছে বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নেই।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল মেনিলখিন, ব্রিজ পেরিয়ে জিম্মিদের দিকে এগোল কবির চৌধুরী। লম্বা-চওড়া একটা কার্নিসের ওপর আশ্রয় দেয়া হয়েছে জিম্মিদের, তিন দিক থেকে একশো ফিট গভীর খাদ ঘিরে রেখেছে কার্নিসটাকে। দু'জন গার্ড তীক্ষ্ণ নজর রাখছে তাঁদের ওপর। গুহার পাথুরে গা কেটে তৈরি করা হয়েছে সিঁড়ির ধাপ, ধাপগুলো সাবধানে টপকে এসে জিম্মিদের সামনে দাঁড়াল কবির চৌধুরী। 'এটা হয়তো ফাইভ স্টার হোটেল নয়,' মুচকি হেসে বলল সে, 'কিন্তু নরকের চেয়ে কয়েক কোটি গুণ ভাল।'

'শেখ আদনান দারজাল জানতে চাইলেন, আমাদেরকে তুমি ছাড়ছ কখন, কিছু ঠিক হয়েছে?'

'আগে আমার দাবি পূরণ করা হোক তো!'

'তোমার দাবি পূরণ করা হবে, সে-রকম কোন প্রতিশ্রুতি কি দেয়া হয়েছে?' বাহরাইনী শেখ জানতে চাইলেন।

'অবশ্যই,' বলল কবির চৌধুরী। 'আজ সন্ধেয় পেয়ে যাব পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার—নগদ নয়, ওই টাকার হীরে। এত বড় অঙ্কের টাকা আদায়ের ঘটনা ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।' তার চেহারায় আত্মতৃপ্তির একটা ভাব দেখা গেল।

ব্যঙ্গের সুরে বাহরাইনী শেখ বললেন, 'তার মানে এই নয় যে ইতিহাসে তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

'আমি একজন বিজ্ঞান সাধক,' গম্ভীর সুরে বলল কবির চৌধুরী, 'আমার তবু আশা আছে, যুগান্তকারী কিছু একটা আবিষ্কার করে ইতিহাসের পাতায় একটু হয়তো জায়গা করে নিতেও পারি। কিন্তু চরিত্রহীন, নিষ্ঠুর, অর্থপিশাচ তেল-মন্ত্রীগণ, আপনাদের আমি জিজ্ঞেস করি—ইতিহাসের আস্তাকুঁড় ছাড়া আর কোথায় স্থান পাবেন আপনারা? দুনিয়ার বেশিরভাগ মুসলিম ভায়েরা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, কিন্তু আপনারা প্রয়োজনের চেয়ে শত কোটি গুণ সম্পদ কুক্ষিগত করেছেন। আপনারা বৃষ্টি আর বর্ষার শোভা দেখার জন্যে এশিয়ার দেশগুলোয় বেড়াতে যান। নিজেদের আরাম আয়েশের জন্যে, বদমায়েশির জন্যে টাকা ওড়ান দু'হাতে, অথচ...' হঠাৎ থামল সে, তারপর ক্ষীণ একটু হেসে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল, আবার বলল, 'এসব কথা বলে

কোন লাভ নেই। আপনাদের স্বভাব-চরিত্র বদলাবার নয়।'

খুক্ করে একটু কাশল এয়ারফোর্স ওয়ানের কমান্ডার ঘিগ হার্ভে। কার্নিসের আধো অন্ধকার ঠোঁটের কাছে বসে আছে সে। বলল, 'আসল কথায় আসুন, মি. কবির চৌধুরী। আমরা জানতে চাই, আপনার দাবি পূরণ করা হলে আমরা ছাড়া পাব তো?'

'সেটা নির্ভর করে আরও অনেক কিছুর ওপর,' বলল কবির চৌধুরী। 'ধরুন, আপনারা যদি কেউ পালাতে চেষ্টা করেন, তাকে খুন না করে আমার কিছু করার থাকবে? কিংবা দাবিও পূরণ করা হলো, আবার গোপনে গোপনে আপনাদেরকে উদ্ধারের চেষ্টাও চালানো হলো, এই অবস্থায় আপনাদের সবাইকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবে আমার সামনে?'

'যা করেছেন করেছেন,' বললেন বাহরাইনী শেখ, 'ওই বোকামিটুকু আর করতে যাবেন না। আশা করি আপনিও বোঝেন, তাতে আপনি নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনবেন। আমাদের এতগুলো লোককে মেরে ফেলে আপনি বেঁচে যাবেন, এ হতে পারে না।'

'আমি খুনী নই,' শান্ত সুরে বলল কবির চৌধুরী। 'কিন্তু আমার অবাধ্য হলে আমি ননীর পুতুলও নই। কাজেই, কেউ পালাবার চেষ্টা করবেন না।' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে। পিছনে অস্বস্তি আর আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

রাস্তায় কোন গাড়ি দেখল না রানা, জীপ চালিয়ে নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল গ্রামে। একটা দোকান থেকে কয়েকটা ভিউ কার্ড আর এক বাক্স চুলের ক্লিপ কিনল ও, তারপর এল পোস্ট-অফিসে। পোস্টম্যানের ষোড়শী মেয়ে উপহারগুলো পেয়ে যতটা না খুশি হলো তারচেয়ে বেশি পেল লজ্জা। তার কাছ থেকে হ্যাভারস্যাকটা নিয়ে আবার গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল ও। মাইল খানেক সোজা এসে থামল মাঠের কিনারায়। বিশাল ঘরের ভেতর আটভার লেজটা দেখা গেল। রানার ধারণা, সোহানাও এখানে ল্যান্ড করবে।

এঞ্জিনের আওয়াজ পাবার আগে হেলিকপ্টারকে দেখতে পেল রানা।

প্রথমেই রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহানা। তারপর মাত্র কয়েকটা প্রশ্ন করে রানার কাছ থেকে জেনে নিল সব। চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল তার। বলল, 'জিম্মিরা কোথায়, এখনও তাহলে সেটা জানি না আমরা।'

'হয়তো জানি,' বলল রানা। 'গডলিম্যানের সাথে যোগাযোগ হলে বুঝতে পারব।'

'আমি ভাবছি, রোজির কোন বিপদ হয়নি তো?' উদ্বিগ্ন দেখাল সোহানাকে।

সেই মুহূর্তে পাহাড় থেকে নেমে এসে হোন্ডায় চড়ছে রোজি। এক মিনিটের মধ্যে রাস্তায় উঠে এল ও, ছুটল দুর্গের দিকে। কিছুক্ষণ পর একটা আওয়াজ পেল সে, হোন্ডার শব্দকে ছাপিয়ে উঠল সেটা। চোখ তুলে মাথার ওপর তাকাতেই দেখল, মেনিলথিনের হেলিকপ্টার। গোত্তা দিয়ে সোজা ওর

দিকেই নেমে আসছে যান্ত্রিক ফড়িংটা।

রোজি গুহায় পৌঁছুবার আগেই কামাভ নিয়ে আকাশে উঠেছিল মেনিলথিন। দুর্গের সাথে রেডিও যোগাযোগ করে জানতে পারে সে, গডলিম্যান তো ধরা পড়েইনি, আহমেদ কায়াম খুন হয়েছে এবং দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছে রোজি। সবচেয়ে বিভ্রান্ত করল তাকে দুর্গে পারকিনের উপস্থিতি, যে-সময়ে ওই লোকের জিম্মি আর কবির চৌধুরীর সাথে গুহায় থাকার কথা।

মেনিলথিনের রিপোর্ট পেয়ে আসল ব্যাপার কি আন্দাজ করতে পারল কবির চৌধুরী, নাটকের মাঝখানে আবার ফিরে এসেছে মাসুদ রানা।

'কিন্তু আপনি শিওর হচ্ছেন কিভাবে, স্যার?' জানতে চাইল মেনিলথিন।

মেনিলথিনকে তেড়ে প্রায় মারতে যায় কবির চৌধুরী, 'মাথায় গোবর নাকি? পারকিন এখানে ছিল!' চিৎকার করে বলল সে। 'কাজেই ওখানে সে থাকতে পারে না, ইডিয়ট। এখনও সে এখানে রয়েছে। হেলিকপ্টার নিয়ে যাও—জলদি! যেখানে থেকে পারো রোজিকে ধরে আমার সামনে হাজির করো—জ্যান্ত! সোহানা কি করছে জানতে হবে আমাকে। চোখ খোলা রাখলে একটা হোন্ডা দেখতে পাবে তুমি।'

'হোন্ডা?'

'রানা জীপ নিয়ে সোহানার সাথে দেখা করবে,' নিজের ধারণা প্রকাশ করল কবির চৌধুরী। 'গডলিম্যান যে হোন্ডাটা ব্যবহার করেছিল সেটা নিয়ে গুহার আশপাশে কোথাও চলে এসেছে রোজি। তাকে আমার চাই, মেনিলথিন। যেখান থেকে পারো নিয়ে এসো তাকে।'

'রোজি আশেপাশে কোথাও আছে, বুঝছেন কিভাবে?' প্রশ্ন করল মেনিলথিন।

'নিশ্চয়ই সাপ্লাই ট্রাকের পিছু নিয়ে এখানে এসেছে সে,' বলল কবির চৌধুরী। 'রানা ওকে নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার একটু পরই ট্রাক রওনা হয় ওখান থেকে। কাজেই এই সুযোগ ছাড়েনি রোজি। এতদিন আমার সাথে কাজ করেও তোমার কোন উন্নতি হয়নি, রামছাগলই রয়ে গেছ! যাও এখন, রোজিকে না নিয়ে এমুখো হয়ো না!'

রাস্তা থেকে নেমে এল রোজি, হঠাৎ ব্রেক কষে একটা বীচ গাছের নিচে থামাল মোটরসাইকেল। গোত্তা দিয়ে নেমে আসছিল কামোভ, সোজা হয়ে গিয়ে দূরে সরে গেল সেটা। তারপর আবার ফিরে এসে চক্কর দিতে শুরু করল গাছের ওপর।

সূর্যের নিচের কিনারা দিগন্তরেখা ছুঁইছুঁই করছে, শেষ মুহূর্তের উজ্জ্বল রোদে কামোভের ককপিটে পরিষ্কার মেনিলথিনকে দেখতে পেল রোজি। প্রতিটি চক্করের সাথে 'কপ্টারটাকে আরও নামিয়ে নিয়ে আসছে সে। এক সময় রোটর ব্লেডের বাতাসে গাছের ডালপালা নুয়ে পড়তে লাগল। পিঠ থেকে মেশিন-পিস্তলটা নামাল রোজি, সতর্কতার সাথে লক্ষ্যস্থির করে ধূসর রঙের আকৃতিটার দিকে গুলি করল এক দফা। কামোভের ফিউজিলাজে লেগে পিছলে

গেল কয়েকটা বুলেট। দ্রুত কাত হয়ে দিক বদলাল 'কপ্টার, তাড়াতাড়ি সরে গেল রেঞ্জের বাইরে।

রাস্তার ওপারে ফাঁকা একটা মাঠ, শেষ মাথায় পৌঁছে নামতে শুরু করল কামোভ। এই একটা সুযোগ, ভাবল রোজি। মাটি থেকে কামোভ আর যখন মাত্র কয়েক ফিট ওপরে, গাছের তলা থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে রাস্তায় উঠে এল রোজি, তারপর ফুল স্পীডে ছুটল। বিশ সেকেন্ড পর পিছনে আবার কামোভের আওয়াজ পেল সে, ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। সুযোগ নয়, ওটা ছিল ফাঁদ। ল্যান্ড করার ভান করেছিল মেনিলথিন, টোপ গিলে গাছের নিরাপদ আশ্রয় থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে রোজি।

এদিকে রাস্তাটা ঢালের মাথা ধরে এগিয়েছে, দু'পাশে ঝোপঝাড়। মাথার ওপর এসে পড়ল কামোভ, বড় একটা গাছ বা অন্য কিছু চোখে পড়ল না যেখানে মাথা গুঁজতে পারে রোজি। মোটরসাইকেলকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল কামোভ। চোখ তুলে তাকাল রোজি, জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়েছে মেনিলথিন, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে।

দুই সেকেন্ড পর নেমে এল প্রথম বুলেট-বৃষ্টি। হোন্ডার চাকার সামনে মেঠো রাস্তার ছাল তুলে আঁকাবাঁকা একটা নকশা তৈরি করল বুলেটগুলো। কিছুই করার নেই ওর, অসহায়ভাবে হোন্ডার হ্যান্ডেল ধরে বসে আছে রোজি।

নতুন একটা কৌশল নিল মেনিলথিন। হোন্ডার সামনে আরও খানিকটা নামাল কামোভ, রোটর ব্লেডের বাতাসের ধাক্কায় দম বন্ধ হয়ে এল রোজির, ওর মুখের সামনে মাত্র কয়েক ফিট দূরে ঘুরছে রোটর ব্লেড।

ধুলোর পাহাড় উঠল সামনে থেকে, চোখ বন্ধ না করে পারল না রোজি। রাস্তার কিনারা থেকে নেমে এল হোন্ডা, চোখ মেলে আর্তনাদ করে উঠল রোজি। বিশ্বস্ত বন্ধুর মত তাকে পিঠে নিয়ে নেমে যাচ্ছে হোন্ডা, ঢাল থেকে নেমে এসে ঝপাৎ করে পড়ল অগভীর একটা পুকুরে। মোটরসাইকেল ডুবে গেল, রোজিও ডুবল গলা পর্যন্ত। হোন্ডা থেকে ছিটকে পড়ার সময় পুকুরের পাড়ের সাথে ঘষা খেয়ে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে সে, চোখে অন্ধকার দেখল কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে পানির ভেতর ডুবে গেল নাক পর্যন্ত। হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ মেলার চেষ্টা করল রোজি, পারল না। একটু একটু করে এগোল ও। তীরে এসে মাথাটা নামিয়ে দিল কাদামাটির ওপর। তারপর জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরল একটু পরই। দেখল, তার মাথার চুল ধরে টানছে মেনিলথিন, শরীরটা পুরোপুরি পুকুর থেকে ডাঙায় তুলে নিয়ে এল সে। রোজির সামনে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে কি যেন চিন্তা করল জার্মান লোকটা, তারপর রোজির ইউনিফর্মের কলার ধরে টান দিতে লাগল। উঠে বসল রোজি, সেই সাথে চিবুকের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে আবার জ্ঞান হারাল।

আকাশে উঠে এল কামোভ, পাইলটের পাশের সীটে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে রোজি। এইমাত্র আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে। উল্টোদিকের জানালা দিয়ে মাথা বের করে কি যেন দেখছে মেনিলথিন, এই সুযোগে একটু হাত-পা

নেড়ে রোজি বুঝতে পারল, তাকে রশি দিয়ে বাঁধার প্রয়োজন বোধ করেনি মেনিলথিন। বেল্ট থেকে আস্তে আস্তে কমিউনিকেটরটা খুলল সে। 'গডলিম্যান!' সেটের বোতাম টিপেই চিৎকার শুরু করল। 'ওরা আমাকে ধরে ফেলেছে! গুহায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে! আমি...'

শরীরের পাশ থেকে মেশিন-পিস্তল তুলে গুলি করল মেনিলথিন। চুরমার হয়ে গেল কমিউনিকেটর। কিন্তু ইতিমধ্যে পুরো মেসেজ গডলিম্যানকে জানিয়ে দিয়েছে রোজি।

মোটর লঞ্চের রেইল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাবরিনা, পাশে গম্ভীর দর্শন ব্রিগেডিয়ার সোয়ান। অ্যাড্রিয়াটিক পেরিয়ে এসে ডালমাটিয়ান উপকূলে পৌঁছে গেছে মোটর লঞ্চ। উপকূল রেখা ধরে এগোচ্ছে ওরা। পিছনে এখনও দেখা যাচ্ছে খুদে শহর সাইবেনিকের আলো, যুগোশ্লাভ অফিশিয়ালদের কাছ থেকে হীরের ব্যাগ ডেলিভারি নেয়ার জন্যে ওখানে ওদেরকে ভিড়তে হয়েছিল। সামনে, এখনও অনেকটা দূরে, জাদার। জাদারও খুদে উপকূল শহর। সন্ধে হয়ে আসার সাথে সাথে সেখানেও একটা দুটো করে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে আলো। ম্যাপে সসার দ্বীপের কোন হদিস পাওয়া না গেলেও, সোহানার কাছ থেকে বর্ণনা পাবার পর সাবরিনার ধারণা হয়েছে দ্বীপটা সাইবেনিক এবং জাদারের মাঝখানে কোথাও না হয়েই পারে না। কিন্তু উপকূল রেখা ধরে প্রথমবার টহল দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে তারা, সসার দ্বীপের বর্ণনার মিল আছে এমন কোন দ্বীপ ওদের চোখে পড়েনি।

সোহানার নির্দেশে এই অভিযানে বেরিয়েছে ওরা। কিভাবে কি করতে হবে, সব বুঝে নিয়ে ন্যাটো হেডকোয়ার্টার থেকে ইউনাকোর একজন অফিসার হিসেবে যুগোশ্লাভিয়ার উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে সাবরিনা। তার প্রস্তাব ছিল খুদে একটা যুগোশ্লাভ ন্যাভাল টাস্ক-ফোর্স সহ ডালমাটিয়ান উপকূলে হাজির থাকতে চায় সে। ইউনাকোর অনুরোধ, ফেলতে পারেননি উপ-মন্ত্রী। এরপর ব্যক্তিগত একটা অনুরোধ জানায় সাবরিনা, তাকে সাহায্য করার জন্যে সে যদি ন্যাটোর মাত্র একজন অফিসারকে সাথে নেয়, যুগোশ্লাভ সরকার কি ক্ষুণ্ণ হবেন? প্রথম একটু আপত্তি করেছিলেন উপ-মন্ত্রী, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে সাবরিনা যখন স্মরণ করিয়ে দিল, ইউনাকো ইচ্ছে করলে যে-কোন সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারে, তখন আর আপত্তি করলেন না তিনি।

'সন্ধে হয়ে এসেছে, অন্ধকারে ওটাকে খুঁজে পাব বলে মনে হয় না,' হতাশ সুরে বলল ব্রিগেডিয়ার।

হাতঘড়ি দেখল সাবরিনা। 'সাতটা বাজতে চলল। আটটা পর্যন্ত সময় দিয়েছে কবির চৌধুরী। এরমধ্যে ফাঁসিকাঠে হীরের ব্যাগ ঝুলিয়ে দিতে হবে। যতক্ষণ না পাই, খুঁজতে থাকব আমরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্রিগেডিয়ার। যুগোশ্লাভ টাস্ক-ফোর্সের তিনটে বোট রয়েছে সাগরে, সেগুলোর নেতৃত্ব নিচ্ছে সে। প্রতিটি বোটের সাথে রেডিও যোগাযোগ

আছে তার। 'ফটোতে দেখে যাই মনে হোক, দ্বীপটা একেবারে ছোট হতে পারে—হয়তো পাথরের একটা টুকরো মাত্র।' চার্ট নিয়ে আবার বসল সে। খানিক পর মুখ তুলে বলল, 'সামনে কোথাও লাইটহাউস আছে।'

লাইটহাউসটাকে পেরিয়ে এল ওরা। তিন মিনিট পর কাঁপা গলায় বলল সাবরিনা, 'ওই দেখা যায়! ওটাই সসার দ্বীপ!'

চোখ তুলে তাকাল ব্রিগেডিয়ার। তার ধারণাই ঠিক, পাথরের একটা টুকরোই। ম্লান আকাশের গায়ে স্পষ্ট দেখা গেল পোল আর ক্রসবারটাকে।

খুদে দ্বীপটাকে মাঝখানে রেখে এক চক্কর ঘুরে এল মোটর লঞ্চ। তারপর এগোল অদ্ভুতদর্শন পোলের দিকে।

'একেবারে গায়ের কাছে যাবার দরকার নেই,' ক্যাপ্টেনকে সাবধান করে দিয়ে বলল ব্রিগেডিয়ার। 'আমরা কেউ নামব না ওখানে। বোটও ভিড়বে না। খুব সাবধানে ওটার পাশ ঘেঁষে যেতে হবে, তারই মধ্যে পানির দিকে বেরিয়ে আসা ক্রসবারে ঝুলিয়ে দিতে হবে ব্যাগ।'

প্রথম দু'বার ব্যর্থ হলো ওরা। তিন বারের বার ফাঁসিকাঠের লম্বা বাহুতে, দুই পেরেকের মাঝখানে সম্ভব হলো রিঙ পরানো

'চমৎকার!' বলল সাবরিনা। 'এখন আমরা কি করব?'

'কফি খাব,' বলল ব্রিগেডিয়ার।

'মানে?'

'লাইটহাউসে যাচ্ছি আমরা,' বলল ব্রিগেডিয়ার 'ওটাই হবে আমাদের হেডকোয়ার্টার। এই দ্বীপের ওপর নজর রাখার জন্যে ওর চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় পাবেন আপনি?'

অয়্যারলেস অন করে টাস্ক-ফোর্সকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল ব্রিগেডিয়ার। প্রতিটি বোটে সশস্ত্র নৌ-সেনা আছে। সসার দ্বীপের কাছ থেকে আধ মাইল দূরে থাকল বোটগুলো, তিনটে বোট তিন দিক থেকে ঘিরে রাখল ওটাকে। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা

শীতল বিনয়ের সাথে রোজিকে গ্রহণ করল কবির চৌধুরী। বলল, 'আশা করি আহমেদ কায়াম আর মেনিলথিন তোমার সাথে খুব বেশি খারাপ ব্যবহার করেনি?'

'না-না,' বলল রোজি। 'ভদ্রলোকেরা মেয়েদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে না।'

'তা, দুর্গ থেকে পালিয়ে এলে, কায়াম তোমাকে বাধা দিল না কেন?' জানতে চাইল কবির চৌধুরী।

সাথে সাথে বুঝে নিল রোজি, কায়াম যে মারা গেছে, কবির চৌধুরী সেটা জেনেছে। সতর্কতা আর আতঙ্কের ভাবটা চেহারায় ফুটতে দিতে না চাইলেও, ফুটে উঠল। এটা একটা মস্ত দুর্বলতা তার, কারও চোখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারে না, চেহারার ওপর মনের ভাব স্পষ্ট ছাপ ফেলে।

'হ্যাঁ, রোজি, তুমি ঠিক ভাবছ,' বলল কবির চৌধুরী, 'আহমেদ যে মারা

গেছে, আমি জানি। তোমাদের মাসুদ রানা খুন করেছে তাকে। হ্যাঁ, আসল রানার কথা বলছি আমি।'

'এসব থেকে বোঝা যাচ্ছে,' বলল রোজি, 'সময় ঘনিয়ে এসেছে আপনার। আপনি হেরে যাচ্ছেন।'

'বোকা নাকি!' হাসল কবির চৌধুরী। 'হীরের ব্যাগ আমি ঠিকই উদ্ধার করব, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। নিজের পিঠ বাঁচাবার জন্যে ছোট একটা চমকের ব্যবস্থাও করে রেখেছি। এই পেটমোটা আরবগুলোর ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার। না, রোজি, আমি হারিনি। হারবও না। কে কোথায় আছে, কি করছে, সবই আমার জানা। এই যেমন সোহানার কথাই ধরো। সসার দ্বীপে থাকবে সে, বিরাট একটা কমান্ডো গ্রুপ অপেক্ষা করবে আমার জন্যে...'

'আপনি যদি তাই ভেবে থাকেন...' শুরু করল রোজি, তারপর নিজের ওপর রেগে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে চুপ হয়ে গেল।

হেসে উঠল কবির চৌধুরী। 'না, তা আমি ভাবিনি। তোমাকে একটু বাজিয়ে দেখলাম। সসার দ্বীপে নয়, সোহানা রয়েছে দুর্গের কাছাকাছি কোথাও। তুমি তাকে এই গুহার লোকেশন জানিয়েছ বটে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এখানে এসে পৌঁছায়নি সে। সন্দেহ নেই, সোহানাকে সাথে নিয়ে গডলিম্যানের সাথে যোগাযোগ করছে রানা। ওরা এখন প্ল্যান করবে, কমান্ডো গ্রুপ নিয়ে কিভাবে আমার এই আস্তানায় হামলা চালানো যায়, তাই না?'

চেহারা ভাবলেশহীন করে রাখার চেষ্টা এবারও ব্যর্থ হলো রোজির। এমন ভাবে হেসে উঠল কবির চৌধুরী, যেন দারুণ মজা পেয়েছে সে। বলল, 'কি জানো, রোজি, তোমার ওপর জোর খাটাবার কোন দরকারই করে না। তোমার চেহারাই সব খবর ফাঁস করে দেয়। এখন আমি জানলাম, সোহানা আর গডলিম্যানকে সাথে নিয়ে সত্যিই দুর্গের কাছে রয়েছে রানা। ওদের সাথে কোন কমান্ডো গ্রুপ নেই। সাগরে হয়তো নজর রাখার ব্যবস্থা করবে ওরা, বিশেষ করে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাবরিনাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে সোহানা...'

চেহারা একটু লালচে হয়ে উঠল রোজির, নিচের ঠোঁটটা একটু কাঁপল।

'আবার ধরা পড়ে গেছ তুমি, রোজি,' উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কবির চৌধুরীর চেহারা। 'আমার আন্দাজ যে এবারও ঠিক হয়েছে, তোমার চেহারা বদলে যেতে দেখে সেটা পরিষ্কার হলো।' ইঙ্গিতে মেনিলথিনকে কাছে ডাকল সে। 'প্রতিভার মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করতে নেই, মেনিলথিন। রোজি আমাদের শত্রু হতে পারে, কিন্তু হীরে চোর হিসেবে গোটা দুনিয়ায় ওর সমকক্ষ আর একজনও নেই। বেচারীর উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, মেহমানদের কাছে পৌঁছে দাও ওকে,—কিন্তু তার আগে কিছু খেতে দিয়ো ওকে।'

গডলিম্যান ওদেরকে জানাল, রোজি ধরা পড়ে গেছে।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল সোহানা। 'কতক্ষণ আগে পেয়েছেন মেসেজটা?'

'দশ মিনিটও হয়নি।'

'সর্বনাশ!' আবার বলল সোহানা, এবার বিড়বিড় করে।

'কি ব্যাপার, সোহানা?' প্রশ্ন করল রানা। 'এত সর্বনাশ সর্বনাশ করছ কেন?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে হতাশ একটা ভঙ্গি করল সোহানা, বলল, 'সাধে করছি না। রোজির অনেক গুণ আছে, সাহসী: বুদ্ধিমতী, কিন্তু মস্ত একটা দুর্বলতা হলো, কারও চোখে চোখ রেখে মিথ্যে কথা বলতে পারে না। ওর মনের ভাব চেহারা দেখেই সব টের পাওয়া যায়। কাজেই, রোজির ধরা পড়ে যাওয়ার মানে হলো, আমাদের অবস্থা এবং প্ল্যান সম্পর্কে সবই জানে কবির চৌধুরী। তৈরি থাকবে সে।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল রানাও, বলল, 'তাহলে তো প্ল্যান বদলাতে হয়!'

'কিন্তু—'

'হীরে নিয়ে যাক কবির চৌধুরী, তারপর গুহায় হানা দেব, এই ছিল আমার প্ল্যান,' বলল রানা। 'কিন্তু এখন আর অত দেরি করা সম্ভব নয়। এসো!'

জীপে চড়ল ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসল গডলিম্যান। গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল জীপ।

ওদিকে ঠিক এই সময় গুহার ভেতর ঝুলন্ত ব্রিজের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে কবির চৌধুরী। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে পারকিন, হাতে একটা টর্চ। কবির চৌধুরীর সাথে হাসছে সে-ও।

নিচে, কার্নিসে বসে রয়েছে জিম্মিরা। কার্নিসের অনেকটা ওপরে, দেয়ালের গায়ে একটা গর্ত। সেই গর্তের ভেতর বসে রয়েছে একজন গেরিলা। গর্তের মুখে একটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ চার্জ ফিট করছে সে। পারকিনের টর্চের আলোয় তার কাজ দেখে সন্তুষ্টচিত্তে মাথা দোলাল কবির চৌধুরী।

নিচে থেকে জিম্মিরা গেরিলাটাকে দেখতে পেল না। এক্সপ্লোসিভে একটা ডিটোনেটর ফিট করল লোকটা, উজ্জ্বল হলুদ রঙের কেবল ছুঁড়ে দিল পারকিনের দিকে। কেবলের হুইলটা লুফে নিল পারকিন। তারপর কেবল ছাড়তে ছাড়তে ব্রিজের ওপর দিয়ে পিছিয়ে আসতে শুরু করল সে। হলুদ সাপটাকে সাবধানে এড়িয়ে তাকে অনুসরণ করল কবির চৌধুরী।

সাত

একটা বোল্ডারের ওপর বসে খানিকটা সুপ আর দুটো চিংড়ি মাছের কাটলেট

খেলো রোজি। পুড়ে প্রায় কয়লা হয়ে গেছে কাটলেট, কিন্তু পেট ভরাবার জন্যে তাই খেতে হলো। এরপর তাকে নিয়ে ব্রিজের দিকে রওনা হলো মেনিলথিন। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে একবার তাকাল রোজি, দেখল ওর পিঠে মেশিন-পিস্তল তাক করে আছে লোকটা।

ব্রিজের মাঝখানে ওদের সাথে কবির চৌধুরী আর পারকিনের দেখা হয়ে গেল। ওদেরকে দেখেই বুঝল রোজি, কি যেন গোপন একটা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে ওরা। ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল পারকিন, অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। তার সেই দৃষ্টি দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল রোজির। পারকিন এমনভাবে তাকাল, যেন এই শেষবারের মত দেখছে সে রোজিকে। লোকটার ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। রোজি অন্তরের অন্তস্তল থেকে টের পেল, সবাইকে মেরে ফেলার বুদ্ধি এঁটেছে এরা।

পারকিনের সাথে কবির চৌধুরী ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে কি করছে? ব্যাপারটা জানা দরকার।

ব্রিজের ওপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রোজি, এমন ভাব করল যেন ব্রিজ থেকে পড়ে যাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে সে। রেইল ধরে কাঁপতে লাগল, তারপর বসে পড়ল ব্রিজের একটা তক্তার ওপর। দুই তক্তার মাঝখানে খানিকটা করে ফাঁক, সেই ফাঁকে চোখ রেখে ব্রিজের পাশে তাকাল রোজি। হলুদ কেবলটা চোখে পড়ে গেল।

পিছন থেকে রোজির ওপর ঝুঁকে পড়ে তার একটা কনুই ধরল মেনিলথিন, টেনে আবার দাঁড় করাল তাকে। টলতে টলতে এগোল রোজি। হলুদ কেবল অনুসরণ করে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পাথরের দেয়ালে, গর্তের মুখে। এক্সপ্লোসিভ চার্জটা পরিষ্কার দেখতে পেল সে।

পিঠে মেশিন-পিস্তলের স্পর্শ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে কার্নিসে নেমে এল রোজি। সেন্ট্রিকে ডেকে মেনিলথিন যুগোশ্লাভ ভাষায় বলল, 'এই মেয়ে অনেক রকম ছলনা জানে, কাজেই এর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। চোখ একদম সরাবে না।'

রোজির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ল গার্ড, তার বুকের দিকে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকাল সে। সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মেনিলথিন। ছুটে এসে রোজিকে জড়িয়ে ধরল ফারুক। তারপর কে টেনে নিয়ে চলল দাদুর কাছে। রোজি আন্দাজ করল, এক্সপ্লোসিভ চার্জের কথা জিম্মিরা কেউ জানেন না। ঠিক করল, খবরটা দিয়ে বাহরাইনী শেখের পরামর্শ চাইবে সে।

তার কথা নিঃশব্দে শুনলেন শেখ জাহিদ আল খালিদ। মাঝখানে মাত্র একবার গুহার উঁচু দেয়ালে তাকালেন তিনি। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে বিস্ফোরকটা ফারুকও দেখল।

রোজির কথা শেষ হতে ফারুকই প্রথম মুখ খুলল। ফিসফিস করে বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, উঁচু জায়গায় চড়তে আমার জুড়ি নেই?

আপনারা কেউ যদি গার্ডের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখতে পারেন, ওখানে উঠে বোমাটা অকেজো করে দিতে পারি আমি।'

মুখ হাঁ হয়ে গেল রোজির, পরমুহূর্তে দ্রুত মাথা নাড়ল সে, বলল, 'অসম্ভব!'

বৃদ্ধ বাহরাইনী শেখ রোজির একটা কব্জি ধরে মৃদু চাপ দিলেন। নিচু গলায় বললেন, 'সিদ্ধান্ত নেবার মালিক তুমি নও, মিস রোজি। এমনকি আমিও নই। রাজার রক্ত রয়েছে ফারুকের শরীরে, আমার রক্ত! ওর সাহসের কথা যদি বলো, ওকে কেউ বাঘের খাঁচায় ফেলে দিলেও আমি ভয় পাব না। ওর যদি মনে হয়, বোমাটাকে অকেজো করে দিতে পারবে, আমরা ওকে বাধা দিতে পারি না।' মুচকি একটু হাসলেন তিনি। 'ওকে কেমিস্ট্রি শেখানো হয়েছে, সেটা বোধহয় এই সুযোগে কাজে লাগবে।'

'তার মানে ও জানে...?'

'জানি,' বলল ফারুক। 'এর আগেও আমি বোমা নাড়াচাড়া করেছি।'

জোরে নাক টানল সোহানা। 'পোড়া পোড়া গন্ধ—কিসের হতে পারে? তোমার মনটা নয়তো?'

'গন্ধ যারই হোক,' হাসল রানা, 'জায়গাটা খুঁজে পেয়েছি আমরা!'

রোজির দেয়া বর্ণনা অনুসরণ করে গডলিম্যান ওদেরকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। শেড লাগানো টর্চের আলো ফেলে বিশ মিনিট খোঁজাখুঁজি করেছে চারদিক এই সময় পোড়া কাটলেটের গন্ধ পেয়েছে সোহানা।

'এই নিচের এলাকাটা তোমার, সোহানা,' বলল রানা। 'পাহারায় থাকো, তারপর উপস্থিত বুদ্ধিমত কাজ করবে। ওই নিচু দেয়াল আর গেট, গুহাটা ওদিকে কোথাও না হয়েই পারে না। গডলি, তুমি ওই ওদিক থেকে দেয়াল টপকাবে, ওপর থেকে চাতালে নামব আমি। একবার টর্চের আলো, কেউ নেই। দুবার, গার্ড আছে। সাড়া দেবার দরকার নেই।'

ওরা দু'জন যে যার পজিশনে মাত্র পৌঁচেছে, সমস্ত সন্দেহের নিরসন হলো। চাতাল এবং গেটের মুখ আলোকিত হয়ে উঠল, গেটের ভেতরের দেয়াল থেকে পিঠ তুলে খাড়া হলো দু'জন গার্ড, মেনিলথিনকে নিয়ে চাতালে বেরিয়ে এল কবির চৌধুরী। কারপার্কে এসে দাঁড়াল ওরা। ওপর থেকে রানা আর মাঝখান থেকে গডলিম্যান দেখল, কার-পার্কে মিনিবাস, জীপ গাড়ি ছাড়াও রয়েছে কামোভ হেলিকপ্টারটা।

নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসেছে সোহানা। নিচু দেয়াল টপকে মিনিবাসের পিছনে গা ঢাকা দিল সে।

মিনিবাসের পাশে থামল কবির চৌধুরী, তারপর গেটের দিকে ফিরে হাতছানি দিয়ে কাকে যেন ডাকল সে। গেটের ভেতর থেকে আলোকিত চাতালে বেরিয়ে এল কোডি পারকিন। রানা এবং সোহানা দু'জনেই দেখতে পেল তাকে। দু'জনেই জোর একটা ধাক্কা খেলো ওরা, এমন নিখুঁত মাসুদ রানা

বানিয়েছে কবির চৌধুরী, ভাবা যায় না

'হীরে আমি হাতে পাবার সাথে সাথে,' পারকিনকে বলল কবির চৌধুরী, 'সিগন্যাল দেব তোমাকে। তখন তুমি জিম্মিদের ফেলে কেটে পড়তে পারবে। ওরা কোথায় রয়েছে সেটা আমিই জানিয়ে দেব সোহানাকে।'

'আপনার বোমা, মি. চৌধুরী?' জানতে চাইল পারকিন। 'সাথে রেখেছেন তো?'

কোটের পকেটে হাত ভরে চ্যাপ্টা একটা বাক্স বের করল কবির চৌধুরী, তাতে ফিট করা হয়েছে একটা টাইমিং ডিভাইস আর সুইচ। 'নেই মানে! আমার দাবি পূরণে একটু গোলমাল করলেই আমি এটা ব্যবহার করব। তার আগে তোমাকে অবশ্য সাবধান করে দেব, আমাদের লোকদের যাতে সরিয়ে নিতে পারো।'

'কিন্তু সাগর থেকে পাঠানো সিগন্যাল যথেষ্ট শক্তিশালী হবে? এখানে, এতদূরে ফাটবে বোমাগুলো?'

মুচকি হাসল কবির চৌধুরী। 'যথেষ্ট শক্তিশালী। আমি নিজের হাতে বানিয়েছি যে!' ঘুরে দাঁড়াল সে, দু'পা এগিয়ে দরজা খুলে উঠে পড়ল মিনিবাসে।

ড্রাইভারের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত কবির চৌধুরী, তাই এরপর পারকিন কি করল সেটা তার দেখার সুযোগ হলো না। কিন্তু মিনিবাসের পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখল সোহানা।

পকেট থেকে চ্যাপ্টা একটা বাক্স বের করল পারকিন, ঠিক এই রকম একটা কবির চৌধুরীর হাতেও দেখা গেছে। বাক্সটা এক নজর দেখেই আবার পকেটে ভরে রাখল পারকিন।

প্রাণ পেল মিনিবাসের এঞ্জিন। এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সোহানা, তারপর বিসমিল্লাহ বলে পিছনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল মিনিবাসের মাথায়, লাগেজ ক্যারিয়ারে।

গেট থেকে দেয়ালের কাছে সরে এসে ছড়ছড় শব্দে পানি ছাড়ল একজন গার্ড। তারপর সঙ্গীকে হেঁড়ে গলায় কি যেন বলে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গী বেরিয়ে এল ছায়া থেকে, গেট বন্ধ করল, তারপর খানিকটা এগিয়ে দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে সে-ও পানি ছাড়তে শুরু করল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তার ঘাড়ে এসে পড়ল রানা। হাতের মুঠোয় ধরা জিনিসটা ছুটে গেল। চাতালের মেঝেতে বসে পড়ল হতভম্ব গেরিলা, পিছন থেকে কানের নিচে এসে লাগল প্রচণ্ড এক ঘুসি। নিচু দেয়াল টপকে ওর পাশে এসে দাঁড়াল গডলিম্যান। লোকটা জ্ঞান হারিয়ে শুয়ে আছে, তবু তার পাঁজরে একটা কঠিন লাথি লাগাল সে। রুমাল বের করে লোকটার মুখে ভরে দিল রানা, আরেকটা রুমাল বের করে ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধল গডলিম্যান। কারপার্কে টেনে নিয়ে আসা হলো তাকে, ঢুকিয়ে দেয়া হলো একটা ট্রাকের তলায়।

'এবার রোজিকে উদ্ধার করতে হয়,' ফিসফিস করে বলল রানা।

'অভ্যেস খারাপ মেয়েটার,' রসিকতা করে বলল গডলিম্যান। 'বার বার খালি বিপদে পড়ে, বার বার তাকে আমাদের উদ্ধার করতে হয়। কোথায় সে, কি করছে, যীশুই বলতে পারবেন।'

যুগোশ্লাভ সেন্ট্রির সাথে খুনসুটি করছে রোজি। গা দুলিয়ে, মুখ ভেংচে, মধুর কটাক্ষ হেনে বাইশ বছরের যুবক গেরিলাকে অস্থির করে তুলেছে সে। রোজির একটা শব্দও বুঝছে না সেন্ট্রি, তাতে করে সন্দেহ আর অবিশ্বাস আরও বরং বেড়ে উঠল তার। পিঠ থেকে মেশিন-পিস্তল নামিয়ে রোজির দিকে ধরল সে। চেহারায় রাগ রাগ ভাব, কিন্তু মুগ্ধ দৃষ্টি ওর বুকের দিকে।

'বন্ধুরা এমন ভয় দেখায় না,' বলল রোজি। 'আমি তো শুধু তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছি, সেটা কি অন্যায় হয়েছে? দেখছ না, কেমন একঘেয়ে পরিবেশ?'

চোখ-মুখ দেখেই বোঝা গেল, রোজির একটা কথাও বুঝতে পারছে না গেরিলা। সেই একই সুরে, তার চোখে চোখ রেখে বলে চলল রোজি, 'এবার তুমি পাঁচিলে উঠতে পারো, ফারুক। এ-ব্যাটা এমন কড়া নজর রেখেছে আমার ওপর, গুহায় একদল পাগলা হাতি ঢুকলেও টের পাবে না।'

দাদুর হুইলচেয়ারের আড়াল থেকে বেরিয়ে, অন্যান্য মন্ত্রীদের পর্দা হিসেবে ব্যবহার করে গেরিলার দৃষ্টিপথ থেকে সরে এল ফারুক। পাঁচিলের সামনে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বিগ হার্ভে, ফারুককে ধরে কয়েক ফিট ওপরে তুলল সে। পাঁচিলে হাত আর পা রাখার মত জায়গা পেল ফারুক, বিগ হার্ভে তাকে ছেড়ে দিতে একার চেষ্টায় উঠতে শুরু করল সে।

গেরিলার দিকে এগোল রোজি, সন্তর্পণে। মেশিন-পিস্তলের মাজল ঠেকল তার বুকে, দুই পাহাড়ের মাঝখানে। জিভের ডগা বের করে ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নিল সে, বলল, 'প্রেম বোঝো?'

কি বুঝল কে জানে, চেহারা একটু লালচে হলো গেরিলার, পিছিয়ে গেল সে। ধীরে ধীরে উঠছে ফারুক, এরই মধ্যে বেশখানিক উঠে গেছে। রোজি আবার এগোতে যাচ্ছে দেখে অস্থির ভঙ্গিতে মেশিন-পিস্তল নেড়ে দূরে সরে থাকতে বলল গেরিলা। তাকে ভেঙচাল রোজি, তারপর চাপা গলায় হেসে উঠল। চোখের পলক পড়ছে না লোকটার, রোজির প্রতিটি নড়াচড়া গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ করছে সে। একটু চিন্তা করে বুঝল রোজি, গুহার নিচে লোকটাকে নিয়ে যেতে পারলে সেটাই হবে ফারুকের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ।

সেন্টির দিকে পিছন ফিরে কার্নিসের কিনারা ধরে এগোল রোজি। ঘাড় ফিরিয়ে হাসল একবার, দেখল পিছু পিছু আসছে লোকটা। এক জায়গায় এসে থামল রোজি, হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে নিচু হয়ে কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল নিচের খাদে, তার বিশাল নিতম্ব গেরিলার দিকে।

এক মুঠো নুড়ি পাথর তুলে নিল রোজি। খাদের নিচে ছুঁড়ে দিতে শুরু

করল সেগুলো, প্রতিবার একটা করে। তার প্রতিটি নড়াচড়ায় রয়েছে যৌন-আবেদন, পাঁচ ফিট পিছনে দাঁড়িয়ে সেটা দারুণ উপভোগ করছিল গেরিলা। ঠিক সেই সময় পাঁচিল থেকে হাত ফস্কে গেল ফারুকের।

চলতে চলতে হঠাৎ বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে রাস্তা থেকে নেমে গেল মিনিবাস, তারপর খানিকদূর এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে কাছের একটা ঝোপে গা ঢাকা দিল সোহানা। চারদিকে তাকাল ও। রাত হলেও, আকাশ ভরা তারা আর উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় বেশ খানিকদূর দেখা যায়। সাগরের গর্জন [illegible] পেল ও।

মিনিবাস থেকে [illegible]মল কবির চৌধুরী, ড্রাইভারকে দুর্গে ফিরে যাবার নির্দেশ দিল সে। বাস ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল ড্রাইভার। ফাঁকা জায়গায় একা দাঁড়িয়ে থাকল কবির চৌধুরী। এই সময় নিঃসঙ্গ একজন সাইকেল-আরোহীকে দেখা গেল, মেঠো পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে আসছে। কবির চৌধুরীকে পাশ কাটাবার সময় কি যেন বলল সে, উত্তরে স্থানীয় ভাষায় জবাব দিল কবির চৌধুরী। পরিচিত কেউ নয়, তবুও কুশলাদি বিনিময় করল ওরা।

মেঠো রাস্তাটা পেরিয়ে আবার একবার থামল কবির চৌধুরী, এদিক ওদিক তাকাল। সম্ভবত কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা বুঝে নিতে চায়। ঝোপের আড়াল থেকে তাকিয়ে ছিল সোহানা, হঠাৎ কবির চৌধুরীকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল ও।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে পিছু নিল সোহানা। রাস্তার ওপার থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল, ঢালু জমির ওপর দিয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কবির চৌধুরী একেবারে নিচে না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর আবার পিছু নিল।

নিচে নেমে এসে কয়েকটা গাছকে পাশ কাটিয়ে এল সোহানা। সামনেই দেখা গেল বোল্ডারের স্তূপ, তারপর ফাঁকা, নির্জন সৈকত। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কবির চৌধুরীর প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে সোহানা, হাতে রিভলভার।

একজোড়া ল্যাম্প জ্বালল কবির চৌধুরী। তারপর কয়েকটা বোল্ডারের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। একটু পর আবার তাকে বেরিয়ে আসতে দেখল সোহানা, টেনে নিয়ে আসছে একটা বোট। বোটের পিছনে ফিট করা রয়েছে আউটবোর্ড মোটর। পেট্রল ট্যাংকের ঢাকনি খুলে ভেতরে এক ক্যান গ্যাসোলিন ঢালল সে। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে কোটের আস্তিন সরিয়ে হাতঘড়ি দেখল। ক্রসবারে হীরের ব্যাগ ঝুলিয়ে দেবার সময়-সীমা আধঘণ্টা আগেই পেরিয়ে গেছে, তবু কোন রকম ব্যস্ততা নেই তার আচরণে। মুখে তৃপ্তির হাসি নিয়ে শান্তভাবে সাগরের দিকে তাকাল সে।

সৈকতে দাঁড়িয়ে কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে কবির চৌধুরী।

কবির চৌধুরী নিজে গিয়ে নিয়ে আসবে হীরের ব্যাগ, কথাটা বিশ্বাস

করতে পারছে না সোহানা। সেজন্যেই নিজের উপস্থিতি এখনও গোপন রাখছে ও। ওর ধারণা, কবির চৌধুরীর স্যাঙাৎদের কেউ একজন আগেই রওনা হয়ে গেছে, সে-ই নিয়ে আসবে হীরের ব্যাগ। কাজেই অপেক্ষা করা দরকার। হীরেসহ কবির চৌধুরীকে গ্রেফতার করাই ভাল।

দশ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল কবির চৌধুরী। তারপর আবার কাজ শুরু করল সে। তার পায়ের কাছে একটা রশি ছিল, আগে লক্ষ করেনি সোহানা। ঝুঁকে পড়ে সেটা তুলে নিয়ে টানতে শুরু করল সে। সাগরের পানিতে লম্বা একসার বুদ্বুদ উঠল। ব্যাপারটা কি?

হঠাৎ কেন যেন মনে হলো সোহানার, শুধু শুধু দেরি করাটা বোকামি হয়ে যাচ্ছে তার। কবির চৌধুরীর সহকারীরা কেউ যদি এসে পড়ে, ওদেরকে একা সামলানো হয়তো কঠিন হয়ে উঠবে। কবির চৌধুরী এই মুহূর্তে একা রয়েছে, এখনই তাকে সারেন্ডার করানোর উপযুক্ত সময়। ওকে বন্দী করতে পারলে হীরেও পাওয়া যাবে।

শেষ গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সোহানা। নিঃশব্দ পায়ে সামনে এগোল কয়েক গজ। রিভলভারটা কবির চৌধুরীর চওড়া পিঠের দিকে তাক করল, বলল, 'হ্যান্ডস আপ!'

চোখা একটা পাথর ধরল ফারুক, শরীরের চাপ পড়তেই ভেঙে গেল সেটা। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার, পিছলে নেমে এল শরীরটা। গার্ডের মাথা আর দশ ফিট নিচে থাকতে থামল পতন, পাঁচিলের গায়ে অসহায়ভাবে ঝুলতে থাকল সে।

ঝট্ করে ফারুকের দিকে মুখ তুলল গার্ড, পরমুহূর্তে তাক করল মেশিন-পিস্তল। কার্নিসের ঠোঁটের দিকে পিছন ফিরল রোজি, লাফ দিল গার্ডের পা লক্ষ্য করে। ধপাস করে বসে পড়ল গার্ড, আবার একটা লাফ দিয়ে তার বুকের ওপর পড়ল রোজি, দু'হাত দিয়ে মেশিন-পিস্তলটা ধরে ফেলেছে। মেঝের ওপর পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ল গার্ড, তার ওপর চেপে বসেছে রোজি, মেশিন-পিস্তল নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছে দুজন।

জিম্মিরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। এয়ারফোর্স ওয়ানের ক্রুরা এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলেছে ওদের দু'জনকে। কিন্তু কারও কিছু করার নেই, যে-কোন মুহূর্তে মেশিন-পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে মারা পড়তে পারে রোজি।

সবাই যা ভয় করছিল, তাই ঘটল। রোজি আর গার্ডের শরীরের মাঝখানে খকখক করে উঠল মেশিন-পিস্তল। মেঝেতে হাতের ভর দিয়ে সিধে হলো রোজি, ইউনিফর্মটা তাজা লাল রক্তে ভিজে গেছে। গার্ড উঠল না, তার মুখের প্রায় অর্ধেকটাই নেই।

ঝুপ করে মেঝেতে নামল ফারুক, ফুঁপিয়ে উঠে রোজিকে জড়িয়ে ধরল সে। তার গালে চুমো খেলো রোজি, তারপর তাকে নিয়ে ড. ওয়াহাবের সামনে চলে এল। ফারুকের হাত ধরে তাকে নিজের পাশে বসালেন ড.

ওয়াহাব।

বিগ হার্ভের সামনে এসে দাঁড়াল রোজি। হুকুমের সুরে বলল, 'ঘোড়া হোন।' হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে নিচু হলো বিগ হার্ভে, তাঁর পিঠে উঠে দাঁড়াল রোজি। তারপর লাফিয়ে ধরল পাঁচিলের এক অংশ, উঠতে শুরু করল। যেভাবেই হোক অকেজো করতে হবে বোমাটা।

কেটে পড়বে ওরা। তার আগে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করছিল পারকিন আর মেনিলথিন, এই সময় মেশিন-পিস্তলের আওয়াজ পেল ওরা। বেশির ভাগ গেরিলা চলে গেছে, নিজেদের গোপন পাহাড়ী ঘাঁটিতে ফিরে যাবে তারা। খপ করে সাব-মেশিনগানটা তুলে নিল, পারকিন, ব্রিজের এদিকের প্রান্তটা মেনিলথিনকে পাহারা দিতে বলে ছুটল সে।

টানেলের কোথাও ফুলে আছে, কোথাও ডেবে আছে, গা ঢাকা দিয়ে সহজেই বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে রানা। ওর কয়েক হাত পিছনেই রয়েছে গডলিম্যান। এখনও কারও চোখে ধরা পড়েনি ওরা। গুলির আওয়াজ শুনে রানার পাশে, ফুলে ওঠা দেয়ালের সামনে চলে এল গডলিম্যান। 'জিম্মিদের মেরে ফেলছে শালারা!'

টানেল ধরে ছুটতে গেল গডলিম্যান, তাঁর একটা হাত ধরে ফেলল রানা। চাপা গলায় বলল, 'আস্তে! এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। বোমার ব্যবস্থা করা আছে, জিম্মিদের গুলি করে মারতে যাবে কেন? ব্রিজের এদিকে আমি একটা ছায়া নড়তে দেখেছি। এসো, ওই ব্যাটাকে আগে ধরি।'

টানেলের মুখের কাছে এসে পড়ল ওরা। দেখল, ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মেনিলথিন। কি মনে করে ঘাড় ফেরাল সে, সাথে সাথে তার চোখে পড়ল রানা আর গডলিম্যান।

বোমাটার দিকে কঠিন চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রোজি। সরু একটা ফাটলে এমনভাবে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে ডিটোনেটর, টেনে ওটাকে নামানো সম্ভব নয়। কেবল ধরে টানাটানি করলে, কে জানে, বোমাটা ফেটে যেতে পারে, হাত ছোঁয়াতেও ভয় করল তার। মাথায় একটা বুদ্ধি এল, সাথে সাথে পাঁচিল থেকে নেমে এল কার্নিসে, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে একপাশে সরে দাঁড়াল। দেয়ালের গা ছুঁয়ে ব্রিজের দিকে গেছে হলুদ কেবল। সেটা ধরে চোখা একটা পাথরে ঘষতে শুরু করল সে। কানের পাশে ঠাণ্ডা, শক্ত কি যেন ঠেকল।

'ছেড়ে দাও কেবল,' কর্কশ সুরে বলল পারকিন।

চমকে উঠল রোজি, হাত থেকে খসে পড়ল কেবল। তার বেল্ট থেকে মেশিন-পিস্তলটা বের করে নিল পারকিন, ইঙ্গিতে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে নির্দেশ দিল। গুলিও হলো ঠিক এই সময়।

আধপাক খেয়েই পারকিন দেখল, ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে মাতালের মত

টলছে মেনিলথিন। দু'হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে আছে সে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। অলস ভঙ্গিতে পিছন দিকে কাত হতে শুরু করল সে। রেইলের ওপর পড়ে ঝুলতে লাগল শরীরটা। একবার মনে হলো ব্রিজের ওপর পড়বে আরেকবার মনে হলো ব্রিজের ওপারে খাদে পড়বে। তারপর মাথাটা ব্রিজের বাইরে ঝুলে পড়ল মেনিলথিনের। হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গিয়ে উঠে গেল বুকের ওপর। পতনটা ত্বরান্বিত হলো তাতে। রেইল থেকে খসে নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল মেনিলথিন।

এতক্ষণ মেনিলথিনকে দেখছিল রানা আর পারকিন, এবার ব্রিজের দুই প্রান্ত থেকে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। গুলির আওয়াজ শুনেই রোজিকে সামনে টেনে নিয়ে নিজেকে আড়াল করেছে পারকিন।

চিৎকার করে বলল, 'পিছিয়ে যাও, রানা। তা না হলে রোজির আশা ছাড়ো। তুমিও, গডলিম্যান।'

হাত নেড়ে গডলিম্যানকে পিছিয়ে আসার নির্দেশ দিল রানা, নিজেও পিছু হটতে শুরু করল, কিন্তু পারকিনকে প্রতি মুহূর্তে চোখে চোখে রাখল। কিভাবে যেন বুঝতে পেরেছে পারকিন, এখন যে যুদ্ধটা শুরু হতে যাচ্ছে সেটা হবে অসম যুদ্ধ। তার দলে সে বলতে গেলে একা, কিন্তু রানার দলে রানা ছাড়াও রয়েছে গডলিম্যান আর রোজি, তেল মন্ত্রী আর প্লেন ক্রুদের কথা যদি বাদও দেয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে বাঁচার রাস্তা একটাই দেখতে পেল সে।

কিন্তু জিম্মিদের মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া পারকিনের জন্যে সহজ হলো না। কে.জি.বি. কর্মকর্তা কামচিন তাকে নির্দেশ দিয়েছিল, জিম্মিদের কেউ যেন প্রাণে না বাঁচে। সেই কামচিনই নতুন নির্দেশ পাঠিয়েছে, জিম্মিদের কারও গায়ে আঁচড়টিও দেয়া চলবে না। পারকিনের মনে যাতে কোনরকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় সেজন্যে এই নতুন সিদ্ধান্তের কারণও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছে কামচিন। 'জিম্মিদের খুন করার কে.জি.বি. প্ল্যান ইউনাকো টের পেয়ে গেছে, কাজেই আমরা যদি প্ল্যানটা বাতিল না করি, দুনিয়ার সামনে সব ফাঁস করে দেবে ওরা। অত বড় ধাক্কা আমরা সামলাতে পারব না। কাজেই পাল্টানো হয়েছে সিদ্ধান্ত।'

রাশিয়ানদের যমের মত ভয় করে পারকিন, তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করার কথা ভাবতেও পারে না সে। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি আসবে পরে, এখন যে রানা মেরে ফেলতে এসেছে তাকে, তার কি হবে? নিজের প্রাণের চেয়ে আর কি প্রিয় হতে পারে মানুষের? পকেট থেকে চ্যাপ্টা বাক্সটা বের করার সময় ভাবল সে, হয়তো এটা দেখালেই কাজ হবে, ব্যবহার করার দরকার পড়বে না।

'তিন মিনিট,' বলল সে, আঙুলের চাপ দিয়ে অন করল টাইম সুইচ। কোন ঝুঁকি নিতে চায় না সে, তিন মিনিটের মধ্যে এখান থেকে যদি প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে, জিম্মিদের সাথে সবাইকে নিয়ে নিজে মরে যেতেও আপত্তি নেই তার। আর যদি নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারে, সুইচ অফ করে

দেবে। 'মাত্র তিন মিনিট! তারপরই সবাই তোমরা মারা যাবে!'

রোজিকে সামনে ধরে রেখে ব্রিজের দিকে পা বাড়াল পারকিন। ধীরে ধীরে এখনও পিছিয়ে যাচ্ছে রানা আর গডলিম্যান। পিছু হটে টানেলের ভেতর চলে এল ওরা, রোজি আর পারকিন ব্রিজ পেরিয়ে এপারে পৌঁছুল। আচমকা ঘুরে গেল রোজি, চিৎকার করে বলল, 'এতগুলো নিরীহ মানুষ! তোমার কি ক্ষতি করেছে ওরা? কেন তুমি ওদেরকে মারতে চাইছ? তুমি একটা জানোয়ার, একটা শয়তান!'

প্রচণ্ড রাগে বিস্ফোরিত হলো পারকিন। ধাঁই করে ঘুসি চালাল রোজির নাক বরাবর। জ্ঞান হারিয়ে ব্রিজের ওপর ঢলে পড়ল রোজি। 'আর গাল দিবি আমাকে? আমি কোডি পারকিন, দিবি আর গাল?'

টানেলের ভেতর থেকে গুলি করল রানা। 'উফ্' করে উঠে পিছিয়ে গেল পারকিন, ঘন ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখল তার আহত হাত থেকে খসে পড়া ডিটোনেটরটা অচেতন রোজির মাথার কাছ থেকে প্রায় এক গজ দূরে পড়ে রয়েছে। টাইমারের কাঁটা পুরো এক চক্কর ঘুরে এসেছে, আর দু'মিনিট পর ফাটবে বোমা।'

এক পশলা গুলি ছুঁড়ল, তারপর ক্রল করে ডিটোনেটরের দিকে এগোল পারকিন, কিন্তু রানা তাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। 'ওখানেই থামো, পারকিন,' বলল ও। 'পিস্তল ছেড়ে দাও।'

উঠে দাঁড়াল পারকিন, টানেলের দিকে একনাগাড়ে গুলি করতে শুরু করল। এক সময় চেম্বার খালি হয়ে গেল, গুলি নেই আর।

আরও একপাক ঘোরা শেষ করেছে ডিটোনেটরের কাঁটা। বাকি থাকল একমিনিট।

হাতের পিস্তল ফেলে দিয়ে কোমরের বেল্ট থেকে আরেকটা মেশিন-পিস্তল টেনে নিল পারকিন, রোজির কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে এটা। কিন্তু রানা তাকে গুলি করার সুযোগ দিল না। লক্ষ্যস্থির করে একবারই টিপল রিভলভারের ট্রিগার। পারকিনের ডান হাতের দুটো আঙুল উড়ে গেল। মেশিন-পিস্তলটা পাখির মত লাফ দিল তার হাত থেকে, ডিগবাজি খেতে খেতে পড়ল ব্রিজের ওপর রোজির মাথার কাছে।

সাবধানে এগোল রানা। চ্যাপ্টা রিমোট কন্ট্রোলের বাক্স থেকে চোখ তুলে তাকাল পারকিনের দিকে। ওর নিজের চেহারা, একই মুখ—কিন্তু উলঙ্গ ঘৃণায় বিকৃত হয়ে আছে। পারকিনের হাতের দিকে চোখ পড়ল ওর, ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে।

'নিজের বোকামির জন্যেই আজ আমার এই দশা,' হিসহিস করে উঠল পারকিনের কণ্ঠস্বর। 'বাহরাইনেই তোমাকে আমার খুন করা উচিত ছিল। কিন্তু রাশিয়ানরা তোমাকে জ্যান্ত চেয়েছিল...'

'মাই গড!' বলল রানা। 'তারমানে তুমিও রাশিয়ানদের হয়ে...'

আর সময় পেল না, একটু নড়েচড়ে গুঙিয়ে উঠল রোজি। নিজের

অজান্তেই সেদিকে তাকাল রানা, এবং সাথে সাথে বুঝল, মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে সে। বিদ্যুৎ খেলে গেল পারকিনের শরীরে, তলপেটে প্রচণ্ড লাথি খেয়ে রেইলের ওপর ছিটকে পড়ল রানা।

শেষ পাক ঘুরতে শুরু করেছে ইলেকট্রনিক টাইমারের কাঁটা। সেকেন্ডের কাঁটা নিজস্ব গতিতে নিচ থেকে উঠতে শুরু করেছে। ত্রিশের ঘর পেরোল, একত্রিশের ঘর পেরোল।

রেইলের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ল রানা, লাফ দিয়ে ওর বুকের ওপর চলে এল পারকিন। রানার হাতের রিভলভারটা ধরল সে, অপর হাতে ওর মুখে ঘুসি মারল। রিভলভারটা ধরল বটে, কিন্তু রক্তাক্ত আঙুলগুলোয় জোর পেল না, ছেড়ে দিল আবার। মাত্র একটা হাত দিয়ে হামলা চালাল সে। হাঁটু ভাঁজ করে ওপর দিকে তুলল রানা, তলপেটে গুঁতো খেয়ে কোঁত করে একটা আওয়াজ ছেড়ে ঝুঁকে পড়ল পারকিন, তার কপালের পাশে রিভলভারের বাট দিয়ে আঘাত করল রানা।

ওর শরীরের ওপর ভারী বস্তার মত আরও চেপে এল পারকিন, বুকে ঠেলা দিয়ে তাকে সিধে করার চেষ্টা করল রানা। তারপর আবার বাট দিয়ে মারল নাক-মুখ সই করে। নাক আর ঠোঁট থেঁতলে রক্তাক্ত হয়ে গেল নকল রানার। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল, চোখের মণি কপালের দিকে উঠে গেছে। রেইল থেকে পিঠ তুলে হাঁটু গেড়ে বসল রানা, পারকিনের পেটে মাথা ঠেকাল, তার দুই হাঁটুর নিচে হাত রেখে আবার সিধে হয়ে দাঁড়াতে শুরু করল ও। রানার সাথে উঠে এল পারকিন, রেইলের গায়ে হেলান দিল রানা। ওর মাথা থেকে পিছলে গেল পারকিন। ছটফট করছে সে, গলা থেকে বেরিয়ে আসছে আর্ত-চিৎকার, কিন্তু হাত দিয়ে কিছু ধরে পতনটা রোধ করার কোন উপায় নেই তার। যতক্ষণ না নিচের খাদে, শক্ত পাথরে গিয়ে পড়ল, চিৎকার থামল না। তারপরও কিছুক্ষণ গুহার ভেতর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো আওয়াজটা।

রানা তার দিকে ফিরতেই আঁতকে উঠল রোজি। তার সামনে এই লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, কে ও? মরণপণ যুদ্ধে কে জিতেছে, রানা, নাকি নকল রানা? হাত বাড়িয়ে খপ করে মেশিন-পিস্তলটা তুলল সে।

'আরে করো কি!' টানেল থেকে বেরিয়ে এসে ধমক লাগাল গডলিম্যান। 'মানুষ চিনতে পারো না!'

গডলিম্যানের কথা শেষ হয়নি, রানা আর রোজি দু'জন দু'দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডিটোনেটরের ওপর। রানা একটু দূরে ছিল, কিন্তু ও-ই আগে পৌঁছুল। সুইচ অফ করে ব্যাটারির সাথে লাগানো তার খুলে ফেলল ও। দেখল, ঠিক দুই সেকেন্ড দূরে এসে গিয়েছিল মৃত্যু।

চাঁদের আলোয় সৈকতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কবির চৌধুরী। মেয়েলি কণ্ঠে 'হ্যান্ডস আপ' শুনে মুচকি একটু হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে, কিন্তু সোহানা সেটা দেখতে পেল না। ধীরে ধীরে মাথার দু'পাশে হাত তুলল কবির চৌধুরী, তারপর

ঘুরে দাঁড়াল।

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা। কিন্তু তার হাতের রিভলভারে চাঁদের আলো পড়েছে। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল সে-ও।

'ও, তুমি!' গম্ভীর সুরে বলল কবির চৌধুরী। 'তার মানে, মিনিবাসের ছাদে চড়ে এখানে আসা হয়েছে!'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা। 'কথা কম। খুব সাবধানে কোটটা খুলে ডান পাশে ছুঁড়ে ফেল। সাবধানে, খুব সাবধানে! সন্দেহ হলেই আমি গুলি করব।'

ভয় বা হতাশার কোন ভাব দেখা গেল না কবির চৌধুরীর আচরণে। ভরাট গলায় একটু হাসল সে। বলল, 'বোঝা গেল, তুমি একা। তা, আমাদের হিরো কোথায়? বুঝেছি, বুঝেছি! আমাদের হিরো জিম্মিদের উদ্ধার করতে খুব ব্যস্ত রয়েছে এই মুহূর্তে। ভাল, ভাল!'

রিভলভারের ট্রিগার টিপে দিল সোহানা, কবির চৌধুরীর কানে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। 'বলেছি, কথা কম। কোট খুলুন।'

'বরং আপনি রিভলভার ফেলুন, মিস সোহানা!' ঘাড়ের পিছনে শক্ত, ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ পেল সোহানা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে পিছন থেকে কথা বলল মেয়েটা। হাতের রিভলভার ফেলে দিল সোহানা। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ভরল পিছনের মেয়েটা।

'বুঝতেই পারছ,' হাত নামিয়ে হেসে উঠে বলল কবির চৌধুরী, 'কেউ আমার পিছু পিছু আসবে, এ-আমি ধারণাই করেছিলাম। আসলে মিনিবাসে চড়ার আগেই তোমাকে আমি দেখেছি। তুমি ইউনাকোর ডেপুটি ডিরেক্টর, তোমার একটা বিশেষ সম্মান আছে, সে-কথা ভেবেই মিনিবাস থেকে রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে তোমার রিসেপশনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে আমাকে। একজন পুরুষ মানুষ তোমাকে সার্চ করবে, দেখতে কেমন যেন লাগে। তাই মেয়ে-গেরিলার ব্যবস্থা।'

দ্রুত, দক্ষ হাতে সোহানাকে সার্চ করল মেয়েটা। তারপর পিছিয়ে গেল কয়েক পা, হাতের মেশিন-পিস্তল সোহানার পিঠে তাক করে ধরে থাকল।

'তুমি এখন আমার মেহমান, সোহানা,' বলল কবির চৌধুরী। 'ইচ্ছে করলে বালির ওপর বসতে পারো। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না, মজার একটা জিনিস দেখতে পাবে।'

অসহায় রাগে নিঃশব্দে ফুঁসছে সোহানা। কবির চৌধুরী ফাঁদ পাততে পারে, এটা আগে ভাবেনি বলে তিরস্কার করছে নিজেকে। রাগটা সামলে নিয়ে জানতে চাইল সে, 'আমি হ্যান্ডস আপ বলার আগে কি করছিলেন আপনি?'

ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল কবির চৌধুরী। 'কথা কম! একটু ধৈর্য ধরো, নিজের চোখেই দেখতে পাবে সব।' কোটের পকেট থেকে চ্যাপ্টা একটা বাক্স বের করল সে।

আতঙ্কে শিউরে উঠল সোহানা। দশ গজ দূরে রয়েছে কবির চৌধুরী, এখন যদি লাফ দিয়ে পড়ে ও, পৌঁছুবার আগেই পিছন থেকে গুলি খাবে

মেয়েটার। ‘প্লীজ,’ আবেদনের সুরে বলল সে, কড়া কিছু বলে শয়তানটাকে উত্তেজিত করে তুলতে চাইল না, ‘প্লীজ, এই কাজটি করবেন না! ফর গডস সেক, ডোন্ট ডু ইট! ওরা সবাই নিরীহ মানুষ, কারও কোন ক্ষতি করেনি। আপনি তো আপনার দাবি অনুযায়ী হীরে পেয়েই যাচ্ছেন…’

সবজান্তার ভঙ্গি করে মাথা দোলাল কবির চৌধুরী, হাসল, তারপর বলল, ‘আমার ধারণাই ঠিক, তোমার জন্যে যতটা ভাল, তারচেয়ে বেশি জানো তুমি। কিন্তু বেগম সোহানা চৌধুরী, এখানে তুমি একটু ভুল করছ। এই বাক্স,’ হাতের বাক্সটা নেড়ে দেখাল সে, ‘সে-বাক্স নয়। গুহায় যে বোমাগুলো রয়েছে, সেগুলোর ডিটোনেটর বলে মনে করছ তুমি এটাকে, তা সত্যি নয়।’

পকেট থেকে আরেকটা বাক্স বের করল কবির চৌধুরী, দুটো বাক্স একই রকম দেখতে। ‘এই এটা হলো সেই বাক্স, ডিটোনেটর।’

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল সোহানা। ‘একই কাজের জন্যে দুটো ডিটোনেটর? না—বোধহয়, তিনটে?’

‘তিনটে?’ এবার কবির চৌধুরীর ভুরু কুঁচকে উঠল। ‘কি বলছ তুমি?’

‘এখানে, কবির চৌধুরী, আপনিও একটু ভুল করছেন,’ বলল সোহানা। ‘আপনার তৈরি নকল রানার কাছেও আমি ঠিক এই রকম একটা ডিটোনেটর দেখেছি।’

কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে গেল কবির চৌধুরী। তারপর ম্লান সুরে বলল, ‘বুদ্ধিমতী মেয়ে! আমি জানি না, অথচ তুমি জানো!’ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর আবার মুখ খুলল সে, ‘হুঁ।’ জিম্মিদের নিয়ে কোডি পারকিনেরও তাহলে নিজস্ব প্ল্যান আছে! আবার কি যেন চিন্তা করতে লাগল সে।

তারপর মুখ তুলে সোহানার দিকে তাকাল। বলল, ‘বিশ্বাস করো চাই না করো, জিম্মিদেরকে মেরে ফেলার কোন প্ল্যান আমার ছিল না। উদ্ধার পাব না এই রকম বিপদে পড়ে গেছি দেখলে ওদেরকে খতম না করে আমার হয়তো কোন উপায় থাকত না, কিন্তু শুধু জিঘাংসা চরিতার্থের জন্যে বা খুনের জন্যে খুন করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না, এখনও নেই। তবে, পারকিনের কথা আলাদা! ওকে বুনো পশু বললেও কম বলা হয়। জিম্মিদের হাসতে হাসতে খুন করা ওর পক্ষে খুবই সম্ভব। না, এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ বলে মনে করছি না।’ বলে ডিটোনেটর টাইমারটা পকেটে ভরে রাখল সে, তারপর দ্বিতীয় বাক্সটা চোখের সামনে তুলে সুইচ অন করল। নাটকীয় ভঙ্গিতে সাগরের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘দেখো!’

হাতটা অনুসরণ করে সাগরে তাকাল সোহানা। ধোঁয়া আর লালচে আগুনের কুণ্ডলী থেকে আকাশে উঠল একটা রকেট। মনে হলো, সসার দ্বীপ থেকে উঠল সেটা। কালো আকাশের বুক চিরে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে রকেটটা।

আট

লাইট রুমের তেপায়ার কাছে হেঁটে এল ব্রিগেডিয়ার সোয়ান, এবার নিয়ে কম করেও একশো বার টেলিস্কোপের সকেটে চোখ রাখল। 'এটা কেমন হলো?' বিমূঢ় শোনাল তার কণ্ঠস্বর, 'কিছুই দেখছি ঘটছে না!'

'ডেডলাইন পেরিয়ে যাবার পর এখনও পুরো এক ঘণ্টা পেরোয়নি,' যুক্তি দেখাল সাবরিনা। 'হীরে ওখানে রেখে আসা মাত্র সেটা উদ্ধার করবে, সেরকম কোন প্রতিশ্রুতিও দেয়নি কবির চৌধুরী।' একটু চিন্তা করল সে, তারপর আবার বলল, 'এমনও হতে পারে, টাস্ক-ফোর্সের অস্তিত্ব জেনে ফেলেছে সে, আর তাতেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। আমরা যে এখানে শুধু তার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে আছি, জানে না।'

রেগেমেগে কি যেন বলতে যাচ্ছিল ব্রিগেডিয়ার এই সময় লাইট-হাউস-কীপার রকেটের দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওটা যে সসার দ্বীপ থেকে উঠেছে, দু'জনের কেউই জানে না।

'বুঝেছি!' হতাশ কণ্ঠে বলল ব্রিগেডিয়ার। 'এই রকেটের সাথে হীরের ব্যাগ সংগ্রহ করার কোন সম্পর্ক আছে!' টেবিল থেকে ছোঁ দিয়ে একটা কমিউনিকেটর সেট তুলে নিল সে। দ্রুত নির্দেশ দিল, 'অল ইউনিটস, রিপিট, অল ইউনিটস। ওই রকেটের হদিস চাই আমি। কোনমতেই যেন হারিয়ে না যায়। যেখানেই পড়ুক, উদ্ধার করা চাই। মুভ!'

গভীর সাগরের দিকে ছুটে গেল রকেট, সসার দ্বীপ থেকে দেড় দু'মাইল দূরে গিয়ে পড়ল সেটা। ব্রিগেডিয়ার সোয়ানের টাস্ক-ফোর্স তিন দিক থেকে ছুটল সেটাকে উদ্ধারের জন্যে।

চোখ থেকে শক্তিশালী বিনকিউলার নামিয়ে সোহানার দিকে ফিরে হাসল কবির চৌধুরী। 'ওরা কি করবে না করবে, আগে থেকে বলে দেয়া যায়। তাই না?'

'কেন ছোঁড়া হলো রকেট?' জানতে চাইল সোহানা। 'নিশ্চয়ই হীরে উদ্ধারের সাথে ওটার কোন সম্পর্ক নেই?'

'নেই মানে?' মৃদু হেসে বলল কবির চৌধুরী। 'লেজের সাথে বেঁধে নৌ-সেনাদের সরিয়ে নিয়ে গেল, সে-তো নিজের চোখেই দেখলে। না, দেখোনি—কিন্তু আমি দেখেছি। আর হীরে উদ্ধারের কথা যদি বলো, ওই রকেট ছাড়া কাজটা সম্ভবই হত না।'

'আপনি বলতে চাইছেন, হীরের ব্যাগ উদ্ধার করা হয়ে গেছে আপনার?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সোহানা।

'হয় হয়ে গেছে, নয়তো হচ্ছে—খুব বেশি পার্থক্য আছে কি?' বলেই

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে।

ব্রিগেডিয়ারের সাথে তর্ক বেধে গেল সাবরিনার। দৃঢ়তার সাথে বলল সে, 'আমরা ইনভেস্টিগেট করব, ব্রিগেডিয়ার। ফ্ল্যাগশিপ নিয়ে দ্বীপটা একবার দেখে এলেই কি জানা যাবে ব্যাপারটা।'

চেহারা গম্ভীর করে তুলে সমান দৃঢ়তার সাথে জানাল ব্রিগেডিয়ার, 'না, আমরা কোথাও যাচ্ছি না!'

সাবরিনা বলল, 'আপনাকে আমি স্মরণ করিয়ে না দিয়ে পারছি না যে টাস্ক-ফোর্স আপনার কমান্ডে থাকলেও আপনি ইউনাকোর কমান্ডে রয়েছেন। কাজেই আমি যা বলব তাই হবে। হীরের ব্যাগ তুলে নিয়ে কাবির চৌধুরীর হাতে পৌঁছে দেবে ওই রকেট, এ আমি বিশ্বাস করি না। ওটাকে খুঁজে বের করার জন্যে নৌ-সেনাদের পাঠিয়েছেন আপনি, সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু এখন আমাদের উচিত হীরের ব্যাগটা কি অবস্থায় আছে, কিংবা এখানে আদৌ আছে কিনা জানা।'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্রিগেডিয়ার, বলল, 'আপনি যা বলেন, ম্যাডাম।'

রওনা হয়ে গেল মোটর লঞ্চ। সসার দ্বীপের কাছে এসে গতি কমাল বোট। পোলটা যেখানে খাড়া হয়েছিল, সেদিকে হাত তুলে ব্রিগেডিয়ার বলল, 'যা বলেছিলাম! নিজের চোখেই দেখুন, নেই!'

ভুরু কুঁচকে উঠল সাবরিনার। তারপর পানিতে তাকাল, যেখানে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সার্চ লাইট ফেলা হয়েছে। 'ভুল, ব্রিগেডিয়ার! নেই নয়, আছে!' বিজয়িনীর উল্লাস ফুটল তার কণ্ঠ এবং চেহারায়। 'ওই দেখুন!'

ব্রিগেডিয়ার বাধা দেবার আগেই বোটের নাক থেকে লাফ দিয়ে দ্বীপে পা দিল সাবরিনা। আঁতকে উঠল ব্রিগেডিয়ার, চেঁচিয়ে বলল, 'মাইন! মাইন আছে! দোহাই লাগে, সাবধান!'

ঘুরল সাবরিনা, হাত ঝাপটা দিয়ে ধারণাটাকে বাতিল করে দিয়ে বলল, 'রাখুন! মাইন আছে না ছাই আছে!' বলে বোটের দিকে পিছন ফিরল সে, দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল পাথরের একটা স্ল্যাবের সামনে। খুঁজতে হলো না, সামনেই পড়ে থাকতে দেখা গেল টিউবটাকে, এটা থেকেই বেরিয়ে গেছে রকেট। পোলটা যেখানে ছিল, সেখানে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সাবরিনা। মাটি থেকে পোলের গোড়া আধ হাত বেরিয়ে আছে, বাকিটা নেই। পাথরে ঢোকানো বোল্টের ওপর নজর পড়ল তার। রশির একটা প্রান্ত এখনও বাঁধা রয়েছে বোল্টের সাথে, আরেক প্রান্ত দেখা যাচ্ছে না, পাথরের ওপর টান টান হয়ে রয়েছে রশিটা। দ্বীপের কিনারায় ফিরে এল সে। রশির আরেক প্রান্ত দেখা গেল এখানে। প্রায় গোড়া থেকে ভাঙা পোলটাকেও দেখা গেল, আধ হাত পানির নিচে ভাসছে। রশির আরেক প্রান্ত এখনও বাঁধা রয়েছে সেটার সাথে। পোলের সাথে ক্রস বারটাও দেখল সে।

সাবরিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে বোট থেকে ঝুঁকে পড়ে ব্রিগেডিয়ারও সব

দেখল। 'আমার জন্যে এ এক মহা বিস্ময়!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে, 'ব্যাগটা রয়েছে! সবুর, আমি আসছি! তুলতে হবে ওটাকে!'

ব্রিগেডিয়ারকে দ্বীপে নামতে হলো না, একজন নাবিক তার হাতে একটা বোটহুক ধরিয়ে দিল। বোট থেকে আরও একটু ঝুঁকে পড়ে হুকটা ব্যাগের মুখে লাগানো রিঙে পরাতে যাবে, এই সময় ধূসর রঙের অদ্ভুত একটা আকৃতি স্যাঁৎ করে চলে এল লঞ্চের পাশে। এল, ধাতব রিঙটা নিজের নাকে পরে নিল চোখের পলকে, তারপর সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে চলে গেল! গোটা ব্যাপারটা ঘটতে মাত্র তিন কি চার সেকেন্ড লাগল।

'কি হলো?' অবিশ্বাসে কর্কশ শোনাল ব্রিগেডিয়ারের কণ্ঠ।

'আমারও তো সেই প্রশ্ন—কি ঘটল এটা!' তাজ্জব হয়ে গেছে সাবরিনা।

'গড অলমাইটি! ওই ব্যাগে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার আছে! ওটা পৌঁছে দিতে হবে কবির চৌধুরীর হাতে!'

'কি হবে এখন?'

'কিন্তু জিনিসটা কি?' প্রশ্ন করল ব্রিগেডিয়ার।

'কেন, দেখেননি?' অকারণ ঝাঁঝের সাথে বলল সাবরিনা। 'ওটা একটা ডলফিন। আপনি কি ভেবেছিলেন—সাবমেরিন?'

'একটা কি?' অস্ফুটে জানতে চাইল সোহানা।

'একটা ডলফিন,' আবার বলল কবির চৌধুরী। 'আমাকে রশি টানতে দেখলে না তখন? পানির নিচে খাঁচায় বন্দী ছিল ডলফিন, রশি টেনে খাঁচার পিছন দিকের দেয়ালটা সরিয়ে দিয়েছিলাম। তার জন্যে ওটাই আমার সিগন্যাল।'

'কিসের সিগন্যাল?'

'সাঁতার শুরু করার,' বলল কবির চৌধুরী। 'তিন কি চার মিনিট সাঁতার কাটতে হয়েছে তাকে, দিক-নির্দেশ পেয়েছে একটা আলট্রাসোনিক ডাইরেকশন-বীকন থেকে, যেটাকে তোমরা ফাঁসিকাঠ বলে মনে করছ সেই পোলের মাথায় লাগানো আছে ওটা। দ্বীপটা একবার ভাল করে পরীক্ষা করলেই এসব জানতে পারতে, কিন্তু মাইনের ভয়ে ওখানে তোমরা পা ফেলতেই সাহস পাওনি।'

'মাইন তাহলে ছিল না?'

'না,' বলল কবির চৌধুরী। তারপর সে ব্যাখ্যা করল, আমেরিকা থেকে কিনে একটা ডলফিনেরিয়ামে রেখে কিভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে ডলফিনকে। রকেটের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে নেহাতই সোহানার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে বলল সে, দুটো কাজ ছিল ওই রকেটের। এক, মুলোর ভূমিকায় অভিনয় করা। দুই, লাঠি ভাঙা।

'মুলোর ভূমিকার অভিনয় করা মানে?'

পরম পরিতৃপ্তির সাথে হাসল কবির চৌধুরী। বলল, 'হাতে একটু সময়

আছে, তা না হলে তোমার সাথে খোশ-গল্প করার সুযোগ হত না। রকেটটাকে মুলো ধরো। আর টাস্ক-ফোর্সের বোটগুলোকে ধরো গাধা। গাধার নাকের সামনে মুলো লটকে দিলে যা হবার কথা, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেনি?'

'হুঁ,' ম্লান কণ্ঠে বলল সোহানা। চট করে একবার পিছনটা দেখে নিল ও। ব্যাট্‌ল্-ড্রেস পরা মেয়েটা এখনও নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, মেশিন-পিস্তলটা ওর পিঠের দিকে তাক করা। কবির চৌধুরী ব্যাখ্যা করার আগেই নিজে থেকে বুঝে নিয়েছে ও, কি থেকে কি ঘটেছে, তবু তাকে দিয়ে কথা বলাবার কারণ হলো একটু সময় পাওয়া। এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। কবির চৌধুরী বা মেয়েটা কোন ভুল করে বসতে পারে। চাই কি, ভাগ্য প্রসন্ন হলে রানাও এসে হাজির হতে পারে। ওর ধারণা, রানা তাকে মিনিবাসের ছাদে উঠতে দেখেছে। 'আর লাঠি ভাঙার ব্যাপারটা কি?'

'পোলের গোড়া ভেঙে দেয় ওই রকেট,' বলল কবির চৌধুরী। 'পানিতে পড়ে যায় সেটা, কিন্তু রশি দিয়ে বাঁধা ছিল বলে ডোবেনি। আর, দুই পেরেকের মাঝখানে আটকে ছিল ব্যাগের রিঙ, ক্রসবার থেকে সেটাও খসে পড়েনি। ডলফিনের কাজ, ওই রিঙটা নাকে গলিয়ে নিয়ে এখানে ফিরে আসা। আর বেশি দেরি নেই, এই এল বলে।'

রাত্রির নিস্তব্ধতায় কান পাতল সোহানা। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'অনেক তো হলো, আর কত? এবার ক্ষান্ত দিন না।'

সাথে সাথে কবির চৌধুরীর চেহারা গম্ভীর এবং কঠিন হয়ে উঠল। 'দেখো, আমাকে উপদেশ দিতে এসো না! তোমরা ছেলেমানুষ, নাক টিপলে এখনও দুধ বেরোবে, এই দুনিয়া কিভাবে চলছে তোমরা তার কি বোঝো?'

'হয়তো বুঝি, হয়তো বুঝি না,' শান্ত সুরে বলল সোহানা। 'কিন্তু প্রসঙ্গ সেটা নয়। আমি আপনাকে বলতে চাইছিলাম,' গলার স্বর আরও নরম, আরও মৃদু করল ও, 'এভাবে আপনি নিজেকে নষ্ট করবেন আমরা কেউ তা চাই না। প্রশংসা করছি না, যতদূর জানি, সত্যিকার প্রতিভাধর জীবিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে আপনি প্রথম সারির একজন। এই দুর্ভাগা পৃথিবী আপনার মত একজন বিজ্ঞানীর কাছে থেকে অনেক কিছুই আশা করে। এটা সেটার পিছনে অযথা সময় নষ্ট না করে...'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল কবির চৌধুরী। 'চমৎকার লেকচার দিতে শিখেছ দেখছি! কেউ আশা করে বলে নয়, সাধনার আনন্দে সাধনা করে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে চলেছি আমি, কিন্তু টাকার অভাবে কোনটাই সম্পূর্ণ নিখুঁত করতে পারছি না। আমি কি দিতে পারি, সে-কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার নেই। আর, অযথা সময় নষ্ট কাকে বলছ? কোটি কোটি নিরীহ মানুষকে ঠকিয়ে, তাদের ন্যায্য পাওনা মেরে দিয়ে যারা টাকার পাহাড় বানিয়েছে তাদেরকে একটু আতঙ্কিত করা, তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা বাগিয়ে নেয়াটা অযথা সময় নষ্ট?' গম্ভীর হলো কবীর চৌধুরী. তারপর আবার

বলল, 'আমি তো মনে করি, এটা মস্ত একটা সওয়াবের কাজ। সুস্থ, বিবেকবান মানুষের উচিত আমাকে সমর্থন ও সাহায্য করা। অবশ্য, সে-সব মানুষের মধ্যে বিদ্রোহ থাকতে হবে, থাকতে হবে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা।'

কথা শেষ করে সাগরের দিকে ফিরল কবির চৌধুরী। আবার এক সার বুদ্বুদ দেখা গেল পানির ওপর, তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। ঝুঁকে পড়ে রশিটা তুলে নিল সে, তারপর পানিতে নেমে প্রায় গজ দশেক এগিয়ে গেল। রশি টানতে শুরু করল সে, খাঁচায় ফিরে আসা ডলফিন ধীরে ধীরে মাথা তুলল পানির ওপর। 'ওয়েল ডান, মাই ডার্লিং!' পরম আনন্দে ডলফিনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সে, নাক থেকে দ্রুত খুলে নিল রিঙসহ হীরের ব্যাগটা। 'আর হয়তো তোমার সাথে আমার দেখা হবে না, কিন্তু তোমার কাছে আমি ঋণী হয়ে থাকলাম।'

হীরের ব্যাগ হাতে নিয়ে তীরে ফিরে এল কবির চৌধুরী। ল্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাগের মুখ খুলল সে। নুড়ি পাথর নয়, ভেতরে সত্যি সত্যি হীরে রয়েছে দেখে উদ্বেগের ভাবটা কেটে গিয়ে খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা।

'ধন্যবাদ, সোহানা,' মৃদু হেসে বলল সে। 'তুমি বুদ্ধিমতী, বুঝতে পেরেছিলে, আমাকে চিট করার চেষ্টা করলে জিম্মিরা কেউ বাঁচবে না। অনেক খোশ-গল্প হলো, এবার তাহলে আসি। তবে, বিদায়ের আগে একটা শেষ কথা। মনে রেখো, ডিটোনেটরটা এখনও আমার কাছে রয়েছে। আমার পালাবার পথে কেউ যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বোমা ফাটিয়ে জিম্মিদের সবাইকে পরপারে পাঠিয়ে দেব আমি। বুঝতে পেরেছ?'

বোটে উঠে পড়ল কবির চৌধুরী। এঞ্জিন স্টার্ট দিল সে। এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার ভারী কণ্ঠস্বর, 'এদিকটা জায়গা ভাল নয়, বাঘ-টাঘ থাকতে পারে। একা দাঁড়িয়ে না থেকে রানার কাছে ফিরে যাবার চেষ্টা করো। এবার তার হার হয়েছে, মন মেজাজ ভাল নেই, তোমার উচিত তাকে সান্ত্বনা দেয়া। তোমার পেছনের সেই মেয়েটা কিন্তু অনেকক্ষণ হলো চলে গেছে। তুমি মুক্ত।'

পিছন দিকে তাকাল সোহানা। কেউ নেই। নির্জন সৈকতে একা অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল সে, ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে বোটটা।

উপকূল রেখা পেরিয়ে সাগরের ওপর চলে এল কামোভ হেলিকপ্টার। জানালা দিয়ে মুখ বের করে নিচে অনেকগুলো খুদে দ্বীপ দেখতে পেল রানা। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকাল ও, তিনটে বোট গভীর সাগরের দিকে ছুটে চলেছে। গুহার সামনে চাতাল থেকে রকেটটাকে আকাশে দেখেছিল ও, আন্দাজ করল, সেই রকেটের সন্ধানেই যাচ্ছে বোটগুলো। বোকামি আর কাকে বলে! ভাবল ও।—এখনও কি আর আছে সেটা?

খানিক পর আরেকটা বোট চোখে পড়ল। বোটের নাকের কাছে দাঁড়িয়ে

রয়েছে ইউনাকোর সাবরিনা, তার সাথে লম্বা চওড়া সুদর্শন এক ভদ্রলোক. মনে হলো কি নিয়ে যেন তর্ক করছে ওরা। ওদের বোটের কাছে আরও একটা দ্বীপ দেখা গেল, পাথরের একটা ছোট প্ল্যাটফর্মের মত। তাহলে কি কবির চৌধুরী এরই মধ্যে পালিয়েছে?—ভাবল ও।

গডলিম্যান আর রোজির নেতৃত্বে জিম্মিদেরকে ডেলটা এয়ারস্ট্রিপে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। যুগোশ্লাভ এয়ারফোর্সের সাহায্যে ওটার অস্তিত্ব এবং অবস্থান আবিষ্কার করা হয়। রানা পরামর্শ দিয়েছে, এয়ারফোর্স ওয়ানের ক্রুরা তাদের বোয়িং উদ্ধার করে টেক-অফের প্রস্তুতি নেবে। সব যদি ভালয় ভালয় ঘটে, এবং কবির চৌধুরী যদি ধরা পড়ে বা তার হাত থেকে যদি হীরের ব্যাগটা বাঁচানো সম্ভব হয় তাহলে ইউনাকোর দলটা ওদের সাথে যোগ দেবে জেনেভায় ফিরে যাবার জন্যে। গডলিম্যানকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে ও, 'সময় আর সুযোগ ঘটলেই যোগাযোগ করব তোমার সাথে।'

সসার দ্বীপে নামবে কিনা ভাবল রানা। চিন্তাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিল। প্রথম কাজ সোহানাকে খুঁজে বের করা। কবির চৌধুরীর পালাবার পথ বন্ধ করার জন্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছে সে।

আবার উপকূল রেখার কাছে ফিরে এল কামোভ। প্রতিটি ইনলেট, খুদে উপসাগর আর সরু সৈকতের ওপর দিয়ে উড়ে গেল রানা। কোথায় কবির চৌধুরী?

তারপর হঠাৎ করেই আগুন চোখে পড়ল। দ্রুত 'কপ্টার ঘুরিয়ে নিয়ে একটা ইনলেটের ওপর চলে এল সে। আরও খানিক নিচে নেমে আসতেই দেখা পাওয়া গেল সোহানার। গাছের ভাঙা ডালপালা দিয়ে একটা আগুন তৈরি করেছে সে, পাশে পড়ে রয়েছে একটা গ্যাসোলিনের ক্যান। খানিকটা দূরে শক্ত বালি পাওয়া গেল, সেখানে ল্যান্ড করল কামোভ। রানাকে নামতে হলো না, সোহানাই ছুটে এল কামোভের দিকে। দরজা খুলে একটা হাত বাড়িয়ে দিল রানা, সেটা ধরে পাইলটের পাশের সীটে উঠে বসল সে।

হাত তুলে সাগরের একটা দিক দেখাল সোহানা। বলল, 'ওই দিকে গেছে।'

আবার এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা, যান্ত্রিক আওয়াজটাকে ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর, 'জিম্মিরা সবাই নিরাপদে রওনা হয়ে গেছে, আমরা যদি খুব বেশি দেরি না করি, ডেলটা এয়ারস্ট্রিপে ফিরে গিয়ে এয়ারফোর্স ওয়ানকে পাব।'

বিশ মাইল এগোতেই বোটটাকে দেখা গেল। প্যাগ দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে আঁকাবাঁকা একটা সাগর পথ ধরে এগোচ্ছে কবির চৌধুরী। ভেলবিটিস্কি-ক্যানালে ঢুকতে যাচ্ছে সে। বিপজ্জনক একটা সাগর-পথ এটা, পানির নিচে আধ-ডোবা অবস্থায় অসংখ্য পাথর আর ডুবো-পাহাড় ছাড়াও অনভিজ্ঞ নাবিকের জন্যে আরও অনেক ফাঁদ আছে এখানে।

সোহানার হাতে একটা মেশিন-পিস্তল ধরিয়ে দিল রানা। 'আমরা ওকে

তীরের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। গুলি করবে পায়ে। আর দুর্ঘটনায় যদি মরে যায়, যাক। হীরের ব্যাপারে পরে মাথা ঘামাব আমরা।'

তীর থেকে পাঁচশো গজ দূরে রয়েছে কবির চৌধুরী। একহাতে শক্ত করে ধরে আছে বোটের হুইল, আরেকটা হাত হালকাভাবে ফেলে রেখেছে হীরের ব্যাগের ওপর। হাসছে না, কিন্তু চেহারায় হাসি হাসি ভাব লেগে আছে। হুইলের ওপর একটু ঝুঁকে আছে শরীর, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল কালো পতাকার মত পিছন দিকে উড়ছে।

মেশিন-পিস্তল চেক করে নিল সোহানা। বোটের পিছনে, আউটবোর্ড মোটরের ওপর লক্ষ্য স্থির করল সে। তারপর গুলি করল এক পশলা।

লক্ষ্য ব্যর্থ হলো সোহানার, কারণ হঠাৎ করে সামনে পাথরের ছোট একটা উত্থান দেখে স্পীড কমিয়ে আনল কবির চৌধুরী। বোটের ডান পাশের পানিতে পড়ল বুলেটগুলো। সাথে সাথে কবির চৌধুরীর চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল হাসি হাসি ভাবটা, কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে কামোভকে দেখতে পেল। প্রথমে তার ধারণা হলো, গুলির ব্যাপারটা নিছক তার কল্পনা, নিশ্চয়ই হেলিকপ্টার নিয়ে চলে এসেছে মেনিলখিন। কিন্তু সেই মুহূর্তে আবার গুলি করল সোহানা, এবার ককপিটের আলোয় তাকে পরিষ্কার দেখতে পেল সে।

হঠাৎ করে বোটের আরও কাছে নেমে এল কামোভ, স্পীড কমিয়ে ফেলল রানা। কবির চৌধুরীর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বোটের সামনে চলে এল ওরা। এবারও ব্যর্থ হলো সোহানা।

থ্রটল খুলে দিয়ে দিক বদলেছে কবির চৌধুরী। দ্রুত একটা বৃত্ত রচনা করে আবার বোটের দিকে ফিরে এল কামোভ। এবার আরও অনেক নিচ দিয়ে বোটের ওপর দিয়ে উড়ে গেল ওরা। রোটর ব্লেডের তীব্র বাতাসে বোটের চারদিকে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হলো, কোটের আস্তিন দিয়ে চশমা ঢাকল কবির চৌধুরী। তার অসহায় অবস্থা দেখে বিড়বিড় করে বলল সোহানা, 'কেমন মজা! এবার?'

টিকতে না পেরে স্টারবোর্ড অর্থাৎ তীরের দিকে বোট ঘুরিয়ে নিল কবির চৌধুরী।

'ওকে আহত করতে না পারলে অসুবিধে হতে পারে,' বোটের পিছু নিয়ে বলল রানা।

এঞ্জিনের আওয়াজে চিৎকার পরিষ্কার না শুনলেও, রানার ইচ্ছেটা কি বুঝতে পারল সোহানা। কবির চৌধুরীর হাঁটুর নিচদিকে লক্ষ্য স্থির করল সে। কিন্তু কিভাবে যেন আগেই টের পেয়ে গেল কবির চৌধুরী, বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে দিক বদলাল সে। বোটের ওপর লেগে পিছলে গেল বুলেটগুলো, কবির চৌধুরীর গায়ে আঁচড়টিও লাগল না। উপকূল রেখার সাথে সমান্তরাল ভাবে ছুটছে এখন বোট।

ঝুঁকি নিয়ে আবার বোটের ওপর চলে এল কামোভ। বোটের ঠিক নাকের

ওপর কয়েক সেকেন্ড থাকল ওরা, কামোভ আর বোটের স্পীড সমান। উথলে উঠল সাগর, জলোচ্ছ্বাসে ঢাকা পড়ে গেল কবির চৌধুরী, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, বোট চালাচ্ছে অন্ধের মত, কিন্তু হুইল ছাড়েনি, স্পীডও কমাল না। খানিক পর তার অবস্থা ভাল করে দেখার জন্যে স্পীড বাড়িয়ে বোটের আরও সামনে চলে এল রানা, এই সুযোগে আরেক পশলা গুলি ছুঁড়ল সোহানা।

বোটের নিচে গা ঢাকা দিল কবির চৌধুরী, শুধু একটা হাত দেখা গেল তার, হুইল ধরে আছে। সোহানা থামতেই আবার সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, কোমরের কাছ থেকে সাব-মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

কামোভের আন্ডারক্যারেজে লাগল দু'একটা বুলেট, সবগুলো পিছলে বেরিয়ে গেল। দ্রুত কাত হয়ে পড়ল কামোভ, নিরাপদ দূরত্বে সরে এল ওরা। আধ পাক ঘুরে আবার বোটের কাছাকাছি এল রানা, আবার গুলি ছুঁড়ল কবির চৌধুরী। আপনমনে হাসল রানা; ওর গুলি শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

কবির চৌধুরী গুলি শুরু করলেই দূরে পালিয়ে আসে কামোভ, তারপর আবার কাছে এগোয়। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর কবির চৌধুরীর গুলি শেষ হয়ে গেল। আবার বোটের ওপর চলে এল হেলিকপ্টার। সেই একই বিপদে পড়ল কবির চৌধুরী। চোখে হাত চাপা দিয়ে হুইল ধরে থাকল, তীরের দিকে ছুটে চলল বোট। বোটের চারদিকে টগবগ করে ফুটছে সাগর।

সামনে তাকাল রানা, কাছে চলে এসেছে তীর, আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কামোভকে বোটের বাঁ দিকে রাখল ও, ঝর্ণার মাথায় একটা খড়ের মত নাচছে যেন হেলিকপ্টার। একেবারে শেষ মুহূর্তে দিক বদলে সরে গেল কামোভ, সেই সাথে সামনের বিপদটা দেখতে পেল কবির চৌধুরী। পাথরের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে প্রাণপণে হুইল ঘোরাতে শুরু করল সে, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। পানিতে মাথা তুলে থাকা পাথরটাকে এড়াতে পারলেও, মস্ত একটা গাছের গুঁড়িকে এড়ানো সম্ভব হলো না। তীর বেগে ছুটছিল বোট, গুঁড়িতে বাধা পেয়ে ব্যাঙের মত লাফ দিল সেটা, আছড়ে পড়ল পাথুরে তীরের ওপর। উইন্ডস্ক্রীনের ওপর দিয়ে ছিটকে পড়ল কবির চৌধুরী, শক্ত পাথরে ঠুকে গেল তার মাথা। চোখের সামনে রঙ-বেরঙের আলো দেখতে পেল সে। তারপর জ্ঞান হারাল।

ইঙ্গিতে নিচের পাথুরে সৈকত দেখিয়ে সোহানার মুখের সামনে হাত নাড়ল রানা। সঙ্কেতটা বুঝতে পারল সোহানা, হেলিকপ্টার ল্যান্ড করাবার মত সমতল কোন জায়গা নেই নিচে। কবির চৌধুরীর অচেতন শরীরের দিকে আঙুল দিয়ে বারবার খোঁচা মারার ভঙ্গি করল সোহানা। তার কথা বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। হেলিকপ্টার আরও নামিয়ে আনল ও।

মেশিন-পিস্তল চেক করল সোহানা, ফুল ক্লিপ রয়েছে। সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে নিজের দিকের দরজা খুলে পা দুটো নামিয়ে দিল ল্যান্ডিং স্কিডে। তারপর হালকাভাবে নামল মাটিতে। খানিকটা হেঁটে এসে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, রানাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল। সমতল এক টুকরো মাটির খোঁজে ওপরে

উঠে আরেক দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল কামোভ।

কবির চৌধূরীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সোহানা। একটু একটু নড়াচড়া করছে কবির চৌধুরী, জ্ঞান ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। হীরের ব্যাগটা তুলে নিয়ে কবির চৌধুরীর ফুলে ওঠা মাথার নিচে রাখল সে। তারপর বোটটা চেক করল, উদ্ধার করল কবির চৌধুরীর সাব-মেশিনগান। বোটে একটা ল্যাম্প পাওয়া গেল, জ্বালল সেটা।

চোখ মেলে সোহানাকে দেখতে পেল কবির চৌধুরী। চার ফিট দূরে বসে রয়েছে, হাতে মেশিন-পিস্তল। ধীরে ধীরে উঠে বসল।

'আপনি হেরে গেছেন,' বলল সোহানা।

সোহানার দিকে ফিরেও তাকাল না কবির চৌধুরী, যেন এটা তার কাছে কোন খবরই নয়। তীক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক তাকাল সে, হীরের ব্যাগটা খুঁজছে। 'ব্যাগ কই? আমার হীরে কোথায়?' ব্যস্ত সুরে জানতে চাইল সে। 'রানা নিয়ে গেছে?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'অসম্ভব! বোঝাই যাচ্ছে, এখানে ল্যান্ড করতে পারেনি সে!' সোহানার দিকে একটা হাত বাড়াল। 'হীরে আমার! কোথায় রেখেছ বের করে দাও!'

হেসে উঠল সোহানা। 'নিজের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করুন, মি. চৌধুরী। চাঁদের আলো দেখে মনে করবেন না, এসব স্বপ্নে ঘটছে। ধমকধামকে কাজ হবে না আব।'

'ঠিক আছে, কেউ জানবে না…' ফিসফিস করে শুরু করল কবির চৌধুরী, তারপর তার প্রস্তাবের অবাস্তবতা নিজেই বুঝতে পেরে চুপ মেরে গেল। রোজি হলে কথা ছিল, তাকে হয়তো প্রস্তাবটা দিতে পারত সে, কিন্তু লোভের টোপ ফেলে আর যাকে হোক সোহানাকে ফাঁদে ফেলা সম্ভব নয়।

মৃদু শব্দে আবার হেসে উঠল সোহানা। 'থামলেন কেন? না হয় শুনিই না প্রস্তাবটা কি ছিল আপনার।'

'ফিফটি ফিফটি?' ফিসফিস করে জানতে চাইল কবির চৌধুরী।

'আমি যেখানে পুরোটাই মেরে দিতে পারি,' বলল সোহানা, 'সেখানে আপনার প্রস্তাবে রাজি হতে যাব কোন দুঃখে?'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল কবির চৌধুরীর, বুঝল, তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে সোহানা। 'জানি, তুমি যেখানে জড়িত সেখানে এ-ধরনের প্রস্তাবের কথা চিন্তা করাই উচিত হয়নি আমার। ঠিক আছে, আমি মেনে নিলাম, এবার অন্তত হেরে গেছি। কিন্তু ব্যাগটা কোথায় রেখেছ সেটা অন্তত বলো।'

হাত তুলে কবির চৌধুরীর পিছনটা দেখাল সোহানা। এতক্ষণ আপনি ওটাকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে পিঠের পিছনে তাকাল কবির চৌধুরী, হীরের ব্যাগ দেখেই হাত বাড়াল সে।

'না!' নিষেধ করল সোহানা। 'ফেরত আনুন হাত।'

ঝট করে ফিরল কবির চৌধুরী, দেখল, মেশিন-পিস্তলের ট্রিগারে সোহানার

আঙুল চেপে বসছে। কাঁধ ঝাঁকাল সে, বলল, 'তুমি থাকতে ওটা নিয়ে আমি পালাব কিভাবে? এমনি ছুঁয়ে দেখতে চাইছিলাম আর কি!'

এঞ্জিনের অস্পষ্ট আওয়াজ পেল সোহানা। 'ওই, রানা বোধহয় ফিরে আসছে।'

কান পাতল কবির চৌধুরী, সে-ও শুনতে পেল আওয়াজটা। কিন্তু মনে হলো, অস্পষ্ট শব্দটা আবার যেন মিলিয়ে গেল বা থেমে গেল। মুচকি হাসল সে, বলল, 'তোমার হীরো বোধহয় পথ হারিয়ে ফেলেছে

সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল সোহানা। কবির চৌধুরীর দিকে চোখ রেখে উঠে দাঁড়াল সে। মেশিন-পিস্তল তার বুকের দিকে তাক করে ধরে আছে। বলল, 'এতই যখন ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে, দেখুন।'

শরীরটা বাঁকা করে ব্যাগটা তুলে নিল কবির চৌধুরী, কোলের ওপর নিয়ে এল সেটাকে। 'খুলি?'

'না,' কঠোর সুরে বলল সোহানা। 'এদিকে ছুঁড়ে দিন!'

ইতস্তত করতে লাগল কবির চৌধুরী। 'দিন!'

উপায় নেই দেখে ব্যাগটা সোহানার দিকে ছুঁড়ে দিল কবির চৌধুরী। এই সময় ওরা দু'জনেই আবার শুনতে পেল সেই অস্পষ্ট এঞ্জিনের আওয়াজ। ঝুঁকে পড়ে ব্যাগটা তুলে নিল সোহানা, পিছিয়ে এল একটা পাথরের পাশে, দরকার হলে এই পাথরটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে সে।

সাগরে কালো, লম্বা একটা আকৃতি দেখা গেল। একটা বোট। হুইল ধরা একজন মাত্র লোককে দেখল সোহানা। তীরে এসে ভিড়ল বোট, লাফ দিয়ে নেমে পড়ল লোকটা। চাঁদের আলোয় কবির চৌধুরী আর সোহানাকে অস্পষ্টভাবে হলেও দেখতে পেল সে, সাথে সাথে হাত তুলল মাথার ওপর। তারপর খুব সাবধানে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

'মি. কবির চৌধুরী?' জিজ্ঞেস করল আগন্তুক, কবির চৌধুরীর কাছ থেকে ছয় হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে।

'কে?' ভারী গলায় জানতে চাইল কবির চৌধুরী।

'কে.জি.বি,' বলল আগন্তুক। 'আপনি উঠুন, প্লীজ। খোলা সাগরে আমাদের ডেস্ট্রয়ার অপেক্ষা করছে, আমার ওপর হুকুম হয়েছে, তাতে আপনাকে তুলে দিতে হবে।'

'কিন্তু...' সোহানার দিকে ফিরল কবির চৌধুরী।

এটা একটা ফাঁদ, পরিষ্কার বুঝল সোহানা, কিন্তু বিপদটা কোন দিক থেকে আসবে বুঝতে পারল না ও।

'মিস সোহানা,' বিপদ এল পিছন থেকে, মার্জিত উচ্চারণে বলল একটা লোক, 'আপনার পিছনে আমরা বারোজন রয়েছি। হাতের মেশিন-পিস্তল ফেলে দিন, প্লীজ!'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল সোহানা, হতাশায় ম্লান হয়ে গেল চেহারা। সত্যি তাই, ওর পিছনে এক লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বারোটা কালো ছায়ামূর্তি।

হাতের মেশিন-পিস্তল ফেলে দিল ও. একজন লোক এগিয়ে এসে সেটা কুড়িয়ে নিল ওর পায়ের কাছ থেকে।

'এবার ব্যাগটা,' পিছন থেকে বলল সেই মার্জিত কণ্ঠ। 'ওটাও ছেড়ে দিন।'

প্রতিবাদ করে লাভ নেই, কাজেই বিনাবাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করল সোহানা। সেটাও তার পায়ের সামনে থেকে তুলে নেয়া হলো। সামনে তাকিয়ে দেখল, ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে কবির চৌধুরী, বোটের দিকে হাঁটছে সে, তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বোটম্যান।

সোহানার পিছন থেকে এগিয়ে এল বারোজনের দলটা। নিঃশব্দে সোহানাকে পাশ কাটাল তারা। এগোল বোটের দিকে সোহানাকে ছাড়িয়ে হাত দশেক এগিয়েছে, এই সময় কাঁধে মৃদু ছোঁয়া অনুভব করল সে। ঝট করে তাকাল। দেখল, পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ওকেও সরে আসার জন্য ইঙ্গিত করছে। সরে পাথরের আড়ালে চলে এল সোহানাও।

'হল্ট!' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল রানা।

পাথর হয়ে গেল বারোজন।

'জেনারেল কিচিওমোপভ?' ডাকল রানা।

'ইয়েস, মিস্টার রানা!' বারোজনের দল থেকে জবাব দিল সেই মার্জিত কণ্ঠস্বর

'আমরা আড়ালে রয়েছি, আপনারা খোলা জায়গায়,' বলল রানা। 'গোলাগুলি শুরু হলে কি হবে, আন্দাজ করে নিন।'

'আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না, প্লীজ,' বলল জেনারেল কিচিওমোপভ ওরফে কামচিন আমরা যে খুন-জখম পছন্দ করি না, তার প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন। কবির চৌধুরী জিম্মিদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল, মিস সোহানার কাছ থেকে সেই প্ল্যানের কথা জানতে পেরে দ্রুত ব্যবস্থা নিই আমরা, এবং শেষ মুহূর্তে তার প্ল্যান বানচাল করে দিই! এরপরও কি আপনারা আমাদের বন্ধুত্বের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবেন?'

'কিন্তু এখনকার আচরণ সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা তৈরি করবেন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'সবার যাতে ভাল হয়, সেজন্যেই কবির চৌধুরীকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা, বলল কামচিন।

'মিথ্যে কথা,' বলল রানা 'কবির চৌধুরী ইউনাকোর হাতে ধরা পড়লে এয়ারফোর্স ওয়ান হাইজ্যাকে আপনাদের ভূমিকা ফাঁস হয়ে যাবে তাই ওকে নিয়ে যেতে চাইছেন আপনারা।'

'এই প্রসঙ্গটা আমরা আলোচনা থেকে বাদ দিই না কেন?' প্রশ্ন করল কামচিন। 'ঝগড়া-ঝাঁটি না করে, আসুন না, একটা আপস করি?'

'আপস?'

'হ্যাঁ,' বল কামচিন। 'আমরা খোলা জায়গায় রয়েছি একথা সত্যি। কিন্তু

সংখ্যায় আমরা বারোজন, কবির চৌধুরী আর বোটম্যানকে নিয়ে চোদ্দজন। আপনারা গুলি করতে শুরু করলেই আমরা সবাই মারা যাব না। বরং আপনাদের বুলেটই আগে শেষ হবে। তখন?' এক সেকেন্ড বিরতি নিল সে, তারপর আবার শুরু করল, 'আগেই বলেছি, খুন-খারাবি আমরা পছন্দ করি না। তারচেয়ে, আসুন, আমরা একটা আপস রফা করি।'

এদিক থেকে রানা বা সোহানা কোন সাড়া দিল না। নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় আলোচনা করল ওরা।

আবার বলল কামচিন, 'কি, আপনারা রাজি আছেন?'

'ফর্মুলাটা শুনি তো আগে,' বলল রানা।

'আমার প্রস্তাব হলো,' উৎসাহের সাথে শুরু করল কামচিন, 'যুদ্ধে আপনারা অর্ধেক জিতুন, আমরা অর্ধেক জিতি। কবির চৌধুরীকে নিয়ে যাই আমরা, আর আপনারা নিয়ে যান হীরে। রাজি?'

নিজেদের মধ্যে আবার আলোচনা করল সোহানা আর রানা। গোলাগুলি শুরু হলে আসলে কি ঘটবে ভাল করেই জানে রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে হীরে নিয়ে কেটে পড়াই এখন উচিত। ওদের আরেক দল যদি পৌঁছে যায়, তাহলেই বিপদ। ওর মনের কথা যেন পড়তে পারল কামচিন, বলল, 'আমাদের ডেস্ট্রয়ার থেকে দুটো হেলিকপ্টার রওনা হওয়ার কথা—যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যেতে পারে ওগুলো।'

'কবির চৌধুরী এবং হীরে, দুটোই আমি হারাতে চাই না, রানা,' ফিসফিস করে বলল সোহানা। 'তারচেয়ে…'

'কি হলো, মি. রানা?' তাগাদা দিল কামচিন।

'দুটো শর্তে রাজি আছি,' বলল রানা। এক, হীরের ব্যাগ আর আপনাদের সবার অস্ত্র ওখানে ফেলে তারপর বোটে উঠতে পারবেন। দুই, মার্কিন এনার্জি সেক্রেটারিকে খুন করার জন্যে কবির চৌধুরীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আপনারা তাকে বাধ্য করবেন। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

রাশিয়ানদের মধ্যে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠল। তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল তারা। অবশেষে কামচিন জানাল, 'আপনাদের একটা শর্তও আমাদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় বোটের দিকে এগোব, এই সময় আপনারা যদি গুলি করেন?'

'করতে পারি, কিন্তু করব না,' বলল রানা। 'ভদ্রলোকের এক কথা।'

'ভদ্রলোকেরাও কথার বরখেলাপ করে,' পাল্টা জবাব দিল কামচিন।

'সেক্ষেত্রে আমি শুধু বলতে পারি, আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। এছাড়া আপনাদের কোন উপায় নেই।'

'ঠিক আছে,' খানিক পর রাজি হয়ে গিয়ে বলল কামচিন। 'না হয় বিশ্বাস করলাম। কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটা পূরণ করবে কে? মি. চৌধুরী পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার পাবেন কোথায়?'

'কোথায় পাবেন তার আমরা কি জানি?' বলল রানা। 'তার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, তাকে অনেক কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে তারা, তাদের কাছ থেকে ধার করতে বলুন।'

রাশিয়ানরা চুপ করে থাকল।

এদিক থেকে পরামর্শ দিল রানা। 'বোটে কাউকে পাঠিয়ে কবির চৌধুরীর বক্তব্য কি জেনে নিতে পারেন।'

'কোন লাভ হবে না,' গম্ভীর সুরে বলল কামচিন। 'কোন পরিস্থিতিতেই ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হবেন না তিনি।'

'তবে, আমার বিশ্বাস, টাকাটা আপনারা যদি তাকে ধার দেন, তাতে তেমন কোন ঝুঁকি নেই।'

'মানে?'

রানা বলল, 'কবিব চৌধুরী আপনাদের হাতে রয়েছে, চাপ দিয়ে টাকা আদায় করা কোন সমস্যা হবে না।'

'কিন্তু অত টাকা সে পাবে কোথায়?'

'কেন, আপনাদের কাজ করে দিয়ে!' অবাক সুরে বলল রানা।

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল রাশিয়ানদের মধ্যে। তারপর জানতে চাইল কামচিন, 'ঠিক আছে, না হয় আমরাই ধার হিসেবে কবির চৌধুরীকে টাকাটা দিলাম। কিন্তু আপনাদের হাতে সেটা পৌঁছুবে কিভাবে? কখন?'

'চব্বিশ ঘণ্টা সময় পাবেন আপনারা,' বলল রানা। 'এর মধ্যে সুইটজারল্যান্ডের সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জ ব্যাংকে পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইউনাকোর অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।'

'তার মানে, আপনারা আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন?'

'না,' বলল রানা। 'আমরা ভরসা রাখছি আমাদের হাতের এই টেপ-রেকর্ডার আর পোলারয়েড ক্যামেরার ওপর আমি আসার পর থেকে কথাবার্তা যা হয়েছে সব, এবং আপনাদের ছবি, বন্দী করা হয়েছে এ-দুটোয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইউনাকোর অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা না পড়লে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ছবি আর টেপের নমুনা পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

আবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল রাশিয়ানরা। তারপর কামচিন বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু ওই ছবি আর টেপের কি হবে? পরে আবার যদি আপনারা ব্ল্যাকমেইল করেন?'

'করতে পারি,' বলল রানা, 'কিন্তু করব না। এ-ব্যাপারেও, আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।'

অত দূর থেকেও কামচিনের দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ পেল ওরা। কয়েক সেকেন্ড পর বলল সে, 'বেশ, সেই কথাই রইল তাহলে।'

হীরের ব্যাগ আর যে-যার অস্ত্র ফেলে বোটের দিকে রওনা হলো বারোজনের দলটা। রানা আর সোহানার ওপর বিশ্বাস আছে ওদের, ঘাড় ফিরিয়ে একবারও পিছন ফিরে তাকাল না কেউ।

সোহানার দিকে তাকাল রানা। জানতে চাইল, 'কে জিতল?'

'আগ্নেয়াস্ত্র, ক্যামেরা আর টেপ,' বলল সোহানা, 'এগুলোর একটাও যদি থাকত তোমার কাছে!' হঠাৎ জ্বলে উঠল সে, 'এত মিথ্যে কথা বলো না! এইজন্যেই দুচোখে দেখতে পারি না আমি তোমাকে!'

হাসল রানা। হঠাৎ সোহানার পিছনে মাটির দিকে চেয়ে চমকে উঠল সে, 'সাপ' শব্দটা সম্পূর্ণ উচ্চারণ করবার আগেই বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহানা ওর বুকের ওপর। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানা, কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে দুজন এক সাথে পড়ল বালির ওপর।

বোটের শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। সাগরে ঝিলমিল করছে চাঁদের আলো। চারপাশে মাতাল হাওয়া।

● ● ●